দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্রাজেডি

সাহাদত হোসেন খান

converted to *pdf* By-

Tanvir Ahmad

(RoNy)

2K4, *Dept. of Mechanical Engeneering*.

KUET

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার কথা

সকল যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মূলে রয়েছে বিবদমান জাতি বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও অধিকার লাভের উন্মত্ত আকাংখা। মানব ইতিহাসে যুদ্ধ চিরকালই অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত। আমরা যে সভ্যতার গর্ব করি এ সভ্যতাই এ অভিশাপের জন্মদাতা। মানব সভ্যতা যতই উন্নততর স্তরে পৌছেছে যুদ্ধবিগ্রহই ততই বর্বর ও অমানুষিক স্তরে গিয়ে পৌছেছে। আদিম অসভ্য মানুষেরাও যুদ্ধ করতো। তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল নিজ নিজ দলগত সুখ সুবিধা লাভ করা। তারপর সভ্যতার প্রাথমিক যুগ থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত যেসব বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে মোটামুটিভাবে সেগুলোর লক্ষ্য ছিল পররাজ্য ও পররাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করা। তারপর আসে ধনতান্ত্রিক যুগ। এই ধনতান্ত্রিক যুগের সমাজপতি ধনবাদীরা তাদের নিজ নিজ দেশের হর্তা-কর্তা বিধাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধন ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রথমে তারা সঙ্ঘবদ্ধ দলে পরিণত হয় এবং দেশের ধন-সম্পত্তি ও লোকবলকে নিজেদের করায়ত্ত করে। তারপর দেশের শাসনভার হস্তগত করে। অর্থ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে তারা রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে থাকে। তাদের অর্থ ও ক্ষমতার লোভ নিজেদের দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। দুর্দান্ত লোভের বশবর্তী হয়ে তারা পর দেশের স্বাধীনতা ও ধন দৌলত কেড়ে নেয়। এভাবে ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের আগে বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী ধনতান্ত্রিকগণ দুনিয়ার সকল সম্পদ ভাগ-বাঁটোয়ার করে লন। তারপর ধনতান্ত্রিক জাতিগুলোর মধ্যে দেখা দেয় প্রবল বিরোধ। এই বিরোধ বাধে বিশ্বব্যাপী একচ্ছত্র ক্ষমতা ও প্রভুত্ব নিয়ে। ধনতান্ত্রিক জার্মানীর মুখপাত্র হিসেবে সেদিন কাইজার তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর উপর চড়াও হয়ে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু জার্মান জাতির জন্য তার ফল ভালো হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধকে প্রজাতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্রর বিরোধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। কিন্তু সে বিরোধ ছিল ধনতন্ত্রের উচ্চতর বিকাশ সাম্রাজ্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার লড়াই।

'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি গ্রহণ করায় ধনতান্ত্রিক জার্মানী পরাজিত হয়। জার্মানী কেবল তার উপনিবেশই নয়, নিজের ভূখণ্ডও হারায়। দেশটি পরাজিত হলেও যুদ্ধের মনোবৃত্তি তাদের দূর হয়নি। নতুন উদ্যমে সে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। স্বৈরতান্ত্রিক কাইজারীয় শাসনকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে জার্মানী সমাজতন্ত্রের চটকদার লেবাস পরে। সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, রুমানিয়া ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোতেও জাতীয় সমাজতন্ত্র কায়েমের হিড়িক পড়ে যায়। ইতালী লোক দেখানো ডেমোক্র্যাসির ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্বরূপে আবির্ভূত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে জড়িয়ে

পড়ায় দেশটি ফতুর হয়ে যায়। এরপর ১৯২২ সালে বেনিতো মুসোলিনীর অভ্যুদয়। তিনি তার ফ্যাসিস্ট দলের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনায় তিনি দেশের সকল লোককে সুশিক্ষিত সৈনিকে পরিণত করেন। এক বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়ে ফ্যাসিস্টরা ইতালীয়দের হৃদয় ও বিবেককে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এদিকে, জার্মানী কিছুতেই পরাজয়ের টাল সামলাতে পারছিল না। বিজয়ী পক্ষের রাইনল্যান্ড দখল, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অসম্ভব অর্থের দাবি এবং দেশে দুর্ভিক্ষ ও হাজার হাজার বেকার সৈনিকের ভারে জার্মানী মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যোগদান করে এবং লুকোর্নো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েও জার্মানী রক্ষা পায়নি। এ সময়ে এডলফ হিটলারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তার আগে তিনি একজন বাকবাগীশ আন্দোলনকারী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। আত্মপ্রকাশের ১০ বছরের মধ্যেই তিনি জার্মান ধনতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। ধনতান্ত্রিক জার্মানী হিটলারের মধ্যে আবার তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন পূরণের প্রতিফলন দেখতে পেলো। গণতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করে জার্মানী নাৎসীবাদের পথ ধরে।

হিটলার নিজেও ছিলেন একজন যুদ্ধ ফেরত সৈনিক। তাকে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে। কাজের প্রোগ্রাম তৈরি এবং দল গঠন করতে হয়েছে। সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে হয়েছে। মাসের পর মাস কারাগারে থাকতে হয়েছে। কারাগারে থাকাকালে তিনি তার আত্মচরিতের প্রথম খণ্ড লিখেছিলেন। হিটলারের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত জার্মান জাতি আবার জেগে উঠতে থাকে। ১৯২৪ সালে হিটলারের দল জার্মান রাইখস্টাগে ৩২ টি আসন দখলে সক্ষম হয়। তার কয়েক বছর পরেই তার দল ১ কোটি ৩০ লাখ ভোটারের সমর্থনে ২৩০ টি আসন লাভ করে। ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারী হিটলার জার্মান রাইখস্টাগের চ্যান্সেলর পদে অভিষিক্ত হন। হিটলারের নেতৃত্বে পরাজিত জার্মানী আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। তারা ভার্সাই চুক্তি অমান্য করতে থাকে। জার্মান সৈন্যরা প্রথমে সার অঞ্চল এবং পরে রাইনল্যান্ড দখল করে নেয়। এ সময় জার্মান সমরাস্ত্র কারখানায় প্রকাশ্যে জঙ্গীবিমান ও ট্যাংক নির্মিত হতে থাকে। বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জার্মানী একটি যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়। তারপর ১৯৩৮ সালে রাইখের বাইরে অবস্থানরত জার্মানদের রাইখের অন্তর্ভুক্ত করার আওয়াজ উঠে। একই বছরের মার্চে জার্মান সৈন্যরা অস্ট্রিয়া দখল করে। তারপর চেকোশ্লাভাকিয়ার প্রতি হিটলারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বিনা রক্তপাতে সুদেতানল্যান্ড দখল করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারপর তিনি মনোযোগ দেন পোল্যান্ডের দিকে। এ সময় ফ্রান্স ও বৃটেন হিটলারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় শংকিত হয়ে উঠে। এ দু'টি দেশ বুঝতে পারে যে, হিটলারের মূল আক্রোশ তাদের প্রতি। কেননা তদানীন্তন বিশ্বের ১২আনাই ছিল তখন তাদের দখলে। তাই তারা তাদের উপনিবেশ রক্ষার তাগিদে ঐক্যবদ্ধ হয়। নিজেদের গরজে তারা বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য অগ্রসর হয়। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তারা দেখতে পায় যে, তারা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নাৎসী জার্মানীর মধ্যে কোনো চুক্তি হতে পারে- একথা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন কোনো মতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বৃটিশ সরকার জানতো, জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কেউ কখনো কারো বন্ধু হতে পারে না। কিন্তু তাদের সে ভুল ভাঙ্গতে দেরি হয়নি। ধনবাদী রাষ্ট্রগুলো যাতে পরস্পর মারামারি করে ধ্বংসে হয় এবং বিশ্বে সাম্যবাদী এক রাষ্ট্র গঠন করা যায় সে লক্ষ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শগত শত্রু জার্মানীর প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, আজন্ম শত্রু রাশিয়া যাতে সূচনাতেই জার্মানীর অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে না পারে সে জন্য চতুর হিটলার মস্কোর সঙ্গে রাখি বন্ধনে আবদ্ধ হন।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইন্সটন চার্চিলের সঙ্গে কথা বলছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইসেনহাওয়ার

১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট রাতে কট্টর কমিউনিজম বিরোধী জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেন। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি তদানীন্তন বিশ্ব রাজনীতির গতি পরিবর্তন করে দেয়। নাৎসী পররাষ্ট্রনীতি নতুন পথে যাত্রা করে। অথচ মাত্র ক'বছর আগে জার্মানী জাপানের সঙ্গে কমিউনিস্ট বিরোধী একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিল।

১৯৩৬ সালের ২৫ নভেম্বর বার্লিনে জার্মানী ও জাপানের মধ্যে কমিউনিজম বিরোধী একটি চুক্তি হয়। তখন বৃটেনে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত ভন রিবেনট্রপ ও জার্মানীতে নিযুক্ত জাপানী রাষ্ট্রদূত কাউন্ট মুশকোজি এ চুক্তিতে সই করেন। উভয় দেশ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার গতিরোধে একমত হয়। ভন রিবেনট্রপ জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, 'জাপান পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিজমের সম্প্রসারণ বরদাস্ত করবে

না। জার্মানী মধ্য ইউরোপে এই মহাসমরের বিরুদ্ধে একটি সুদৃঢ় দুর্গ হিসেবে দণ্ডায়মান। আর দক্ষিণে ইতালী বলশেভিক বিরোধী পতাকা বহন করে অগ্রসর হবে।'

১৯৩৭ সালের ২৮ মে চেম্বারলিন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে ডিক্টেটর-শাসিত দেশগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনার নীতি গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালের ৬ নভেম্বর রোমে কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কাউন্ট সিয়ানো, হের ভন রিবেনট্রপ ও জাপানী দূত মিঃ হোতা নয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পর বার্লিনে এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'বিশ্ববাসী আজ সুনির্দিষ্টভাবে জেনে রাখুক যে, ২০ কোটি মানুষের আশ্রয়স্থল পৃথিবীর তিনটি প্রথম শ্রেণীর শক্তি কমিউনিজমের সঙ্গে কোনোরূপ আপোষ মীমাংসা বা চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে তারা কখনো বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরত হবে না।'

ত্রিদেশীয় চুক্তিকে ব্যঙ্গ করে রাশিয়ার দৈনিক ইজভেস্তিয়ায় এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়, 'ফ্যাসিজম সকল জাতির কাছেই বিভীষিকাময়। যুদ্ধ আমাদের অভিপ্রেত নয়। তাই বলে সংগ্রামে আমরা ভীত নই। আমরা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন রোম-বার্লিন অক্ষশক্তির সঙ্গে আপোষ মীমাংসা সাধনে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৯৩৭ সালের ৯ নভেম্বর গিল্ড হলে লর্ড মেয়রের ভোজ সভায় বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'রোম-বার্লিন অক্ষশক্তি হিসেবে মিলিত শক্তিদ্বয়ের সঙ্গে বৃটেনের মনোভাব সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, মহামান্য রাজার সরকার তাদের সঙ্গে পারস্পরিক মৈত্রী ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী।' এদিকে, রোম-বার্লিন চুক্তির প্রতিবাদে এছনী ইডেন ১৯৩৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন।

১৯৩৮ সালের ১ মার্চ থেকে ১৪ মার্চের মধ্যে হিটলারের অস্ট্রিয়া দখল সম্পন্ন হয়। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি অস্ট্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুষনিগ বার্চটেসগাডেনে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। অন্যথায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হবে বলে হুমকি দেন। শুষনিগ রাজধানী ভিয়েনায় ফিরে এসে ৯ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। অস্ট্রিয়ার নাৎসী দল বলপ্রয়োগে গণভোট পণ্ড করে দেয়। ১১ মার্চ জার্মান বাহিনী ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করে। ১৩ মার্চ অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাইখের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরদিন হিটলার বিজয়ী বেশে ভিয়েনায় প্রবেশ করেন। অস্ট্রিয়ার দুর্ভাগ্যে চেকোশ্লাভাকিয়া আতংকিত হয়ে পড়ে। ১৯৩৮ সালের ১৪ মার্চ ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এ দেশকে অভয় দান করে। অল্পদিনের মধ্যে সুদেতানল্যান্ডে সংখ্যালঘু জার্মানদের উপর কথিত অত্যাচারের উপাখ্যানে জার্মানীর পত্র-পত্রিকাগুলোর পাতা পূর্ণ হয়ে উঠে। ১৯৩৮ সালের ১৭ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এম. লিটভিনভ ফ্রান্স, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আক্রমণকারী দেশ হিসেবে জাপান, জার্মানী ও ইতালীকে প্রস্তাবিত সম্মেলন থেকে বাদ দেয়া হয়। এক সপ্তাহ পর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

কমন্স সভায় তিনি ঘোষণা করেন, 'সোভিয়েত প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে কতগুলো জাতির সমন্বয়ে একটি আলাদা জোট গঠিত হবে। ফলে ইউরোপীয় শক্তি বিপন্ন হবে।' ১৯৩৮ সালের ১৬ এপ্রিল ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মে মাসে জার্মানীতে চেকোশ্লাভাকিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণা শুরু হয়। ১৬ জুলাই প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন মিঃ র‍্যাসিম্যানকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে চেকোশ্লাভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে পাঠান। নাৎসীদের প্ররোচণায় সেপ্টেম্বরে সুদেতানল্যান্ডে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। চেক সরকার সামরিক আইন জারি করলে জার্মান সৈন্যরা চেক সীমান্তের দিকে যাত্রা করে। ১৪ সেপ্টেম্বর গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন বার্চটেসগাডেনে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য বিমান যোগে যাত্রা করেন। ১৬ সেপ্টেম্বর তিনি লন্ডনে ফিরে আসেন। এরপর বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে গোপন কূটনীতি শুরু হয়। এ দুটি দেশ ১৮ সেপ্টেম্বর চেকোশ্লাভাকিয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করে। পরিকল্পনায় ৫০ শতাংশের অধিক জার্মান অধ্যুষিত চেক ভূখণ্ড জার্মানীর কাছে হস্তান্তর এবং ফরাসী ও চেক এবং চেক-সোভিয়েত চুক্তি বাতিল করার প্রস্তাব দেয়া হয়। এ প্রস্তাব মেনে নিতে চেকোশ্লাভাকিয়ার উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন ঘোষণা করলেন যে, ইঙ্গ-ফরাসীর চাপে চেকোশ্লাভাকিয়ার ভাগ-বাটোয়ারায় নাৎসী পশুবলের কাছে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের পরাজয় সূচিত হচ্ছে।

ইঙ্গ-ফরাসী পরিকল্পনায় চেকোশ্লাভাকিয়াকে যে সব শর্ত দেয়া হয় তাতে হিটলার সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ২২ সেপ্টেম্বর চেম্বারলিন আবার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য রওনা হন। তার সঙ্গে বৈঠকে হিটলার ইঙ্গ-ফরাসী পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে সমগ্র সুদেতানল্যান্ড দাবি করে বসেন। মনঃক্ষুণ্ন হয়ে চেম্বারলিন বৃটেনে ফিরে আসেন। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধের আয়োজন শুরু হয়। এ সময় তারবার্তা পেয়ে চেম্বারলিন আবার জার্মানী যাত্রা করেন। ২৯ অক্টোবর তিনি মিউনিখে হিটলার, মুসোলিনী ও এম. দালাদিয়েরের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। ৩০ সেপ্টেম্বর বেলা দেড়টায় চতুঃশক্তির মধ্যে মিউনিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেদিনই অপরাহ্নে চেক পক্ষ সম্মতি প্রকাশ করে। ১ অক্টোবর সুদেতানল্যান্ড জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

মিউনিখ চুক্তি শান্তির পরিবর্তে অশান্তিই ডেকে আনে। ১৯৩৯ সালে মার্চের প্রথমভাগে জার্মানীর প্ররোচণায় স্লোভাকিয়া জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৫ মার্চ জার্মানী বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া দখল করে নেয়। ১৮ মার্চ জার্মানী রুমানিয়ার কাছে চরমপত্রের আকারে কয়েকটি অর্থনৈতিক দাবি উত্থাপন করে। বৃটেন এ ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ার অভিমত জানতে চায়। তখন ক্রেমলিন বৃটেন, ফ্রান্স, রুমানিয়া, তুরস্ক, পোল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেয়। ১৯৩৯ সালের ২৩ মার্চ রুমানিয়া জার্মানীর সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে আপাততঃ নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করে। হিটলার বাল্টিক রাষ্ট্র লিথুয়ানিয়ার কাছে মেমেল দাবি করেন। লিথুয়ানিয়া এ দাবি মেনে নিতে সম্মত হয়। ১৯৩৯ সালের ২৬ মার্চ হিটলার বিজয়ী বেশে মেমেলে প্রবেশ করেন।

Dimension of Vector Space

৩১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন ঘোষণা করেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স পোল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ৭ এপ্রিল জেনারেল ফ্রাঙ্কো শাসিত স্পেন কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তিতে যোগদান করে। ফলে জার্মানী, ইতালী, জাপান, মাঞ্চুকুয়ো (জাপান অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া), হাঙ্গেরী ও স্পেন কমিউনিস্ট বিরোধী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ৭ ও ৮ এপ্রিল ইতালীয় সৈন্যরা আলবেনিয়া দখল করে। ইতালীয় সৈন্যদের অগ্রযাত্রার মুখে রাজা জগু দেশ থেকে পলায়ন করেন। আলবেনিয়া ইতালীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৩ এপ্রিল বৃটেন ও ফ্রান্স পূর্ব ইউরোপের দেশ গ্রীস ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। ২ এপ্রিল হিটলার পোল-বৃটিশ চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি এবং বৃটেনের সঙ্গে নৌ-চুক্তির অবসান ঘোষণা করেন।

১৯৩৯ সালের ৩ মে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনভ পদত্যাগ করেন এবং মলোটভ তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৫ এপ্রিল থেকে ইঙ্গ-রুশ আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৫ মে পোলিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্নেল বেক ডানজিগ ও করিডোরের উপর হিটলারের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। ৬ মে লন্ডনে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি প্রস্তাব পাঠায় এবং এ প্রস্তাব নিয়ে সেদিনই বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। পরদিন রোম-বার্লিন অক্ষ সামরিক মৈত্রী গঠন করা হয়।

১৯৩৯ সালের ৮ মে মস্কোতে বৃটেন পাল্টা প্রস্তাব পাঠায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বৃটিশ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। বৃটিশ প্রস্তাবে বৃটেন ও ফ্রান্স আক্রান্ত হলে বাধ্যতামূলকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাহায্য করবে—একথা বলা থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে বৃটেন ও ফ্রান্স বাধ্যতামূলকভাবে সহায়তা করবে কিনা তার উল্লেখ না থাকায় প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। অন্যদিকে, পোল্যান্ড ও বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সামরিক সহায়তা প্রদানে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এসব দেশ সেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণে অসম্মত হয়।

এদিকে, ১৯৩৯ সালের ১২ মার্চ ইঙ্গ-তুর্কী পারস্পরিক সহায়তা চুক্তি এবং ২৩ জুন ফরাসী-তুর্কী পারস্পরিক সহায়তা দান সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন হয়। ১৯৩৯ সালে জুনের শেষভাগে ডানজিগ নিয়ে পোল্যান্ড ও জার্মানীর মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন পোল্যান্ডকে সর্বতোভাবে সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ৩০ জুন মার্কিন প্রতিনিধি সভায় অস্ত্র রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। জুলাইয়ের শেষদিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা বাতিলের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। ১৯৩৯ সালের ২১ জুলাই জার্মানী আবার ডানজিগ অধিকারের সংকল্প ঘোষণা করে। ৩১ জুলাই মস্কোয় জার্মান সামরিক প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ১১ আগস্ট সামরিক মিশন মস্কোয় উপস্থিত হয়। কিন্তু পোলিশ প্রতিনিধি দল যোগদান না করায় আলোচনা স্থগিত থাকে। পোল্যান্ড নিজের এলাকার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশের অনুমতি দানে অসম্মত হওয়ায় সকল আয়োজন পণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়।

জার্মানরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি। তারা পর্দার অন্তরালে তৎপর হয়ে উঠে। তার ফলে ১৯ আগস্ট রুশ-জার্মান বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শিগগির দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের আভাস ফুটে উঠে। ২১ আগস্ট নাৎসী পক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরে প্রস্তুত বলে ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণায় গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ২৩ আগস্ট জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ বিমান যোগে মস্কো গিয়ে সে রাতেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ২৪ আগস্ট চুক্তির প্রকাশ্য শর্তগুলো প্রকাশ করা হয়। শর্তগুলো ছিল (১) এক পক্ষ একা বা তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্য পক্ষকে আক্রমণ করবে না। (২) তৃতীয় কোনো পক্ষ এক পক্ষের উপর হামলা চালালে অন্য পক্ষ তৃতীয় পক্ষকে কোনোরূপ সহায়তা করবে না। (৩) পরস্পরের স্বার্থ সম্পর্কে উভয় পক্ষই একে অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করবে। (৪) এক পক্ষের প্রতি বৈরি কোনো জোটে অন্য পক্ষ যোগদান করবে না। (৫) স্বার্থের সংঘাত দেখা দিলে উভয় পক্ষ মৈত্রীপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করবে। (৬) ১০ বছরের জন্য চুক্তি বলবৎ থাকবে।

কিন্তু রুশ-জার্মান চুক্তি অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। উভয় পক্ষ চুক্তি লংঘন করে একে অন্যের উপর হামলা চালায়। জার্মানীই প্রথম চুক্তি লংঘন করে লেনিনগ্রাদ ও স্টালিনগ্রাদ অবরোধ করে। একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নও অনাক্রমণ চুক্তি খেলাফ করে বার্লিনে চূড়ান্ত সামরিক অভিযান চালায়।

হিটলারের বিস্ময়কর উত্থান

এডলফ হিটলারকে নিয়ে পৃথিবীতে যত আলোচনা সমালোচনা হয়েছে তত আলোচনা অন্য কাউকে নিয়ে হয়েছে কিনা সন্দেহ। 'হিটলার' নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখনো শরীরে শিহরণ জাগে। হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। মনের আয়নায় একটি ইস্পাত কঠিন পুরুষের ছবি ভেসে উঠে। প্রত্যেকেই তার সম্পর্কে জানতে চায়। কে তার পিতা, কোথায় তার জন্ম, কিভাবে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন, কেন তিনি সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, কেন-ই বা তিনি পরাজিত ও আত্মহত্যা করেছেন ইত্যাদি।

হিটলারের কালে পৃথিবীতে অনেকেই জন্ম নিয়েছিলেন। ইতিহাস তাদের ক'জনের কথা মনে রেখেছে? মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত হলেও তার সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল কখনো কম ছিল না। তিনি এক কালজয়ী মানুষ। পরাজিতের কথা কেউ মনে রাখে না। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন। মাইকেল হার্টস তার 'দি হান্ড্রেড' নামে পুস্তকে তাকে বিশ্বের একশো মানুষের মধ্যে ৫২ নম্বরে স্থান দিয়েছেন। ১৯৩৮ সালে আন্তর্জাতিক টাইম ম্যাগাজিন তাকে বছরের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত করে।

হিটলার ছিলেন গরীবের সন্তান। অতি সাধারণ পরিবারে তার জন্ম। জার্মানীর জন্য জীবন উৎসর্গ করলেও তিনি জন্মগতভাবে জার্মান ছিলেন না। তার জন্ম অস্ট্রিয়ায়। ১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় জার্মানীর ব্যাভেরিয়া সীমান্তের ওপারে ব্রাউনাউ এ্যাম নামে একটি ছোট্ট অস্ট্রীয় গ্রামে তার জন্ম। তার পিতার নাম এ্যালোয়িস ও মায়ের নাম ক্লারা পোলজ। এডমান্ড নামে এক ভাই ও পলা নামে তার এক সহোদর বোন ছিল। হিটলারের ডাক নাম ছিল এডি। শৈশবে তাকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা দান করা হয়। ১৮৯৫ সালে ৬ বছর বয়সে হিটলার অস্ট্রিয়ার লীঞ্চের কাছে ফিশহ্যাম নামে একটি গ্রামের পাবলিক স্কুলে প্রথম গ্রেডে ভর্তি হন। ১৪ বছর বয়সে তার পরিবার অস্ট্রিয়ার ল্যাম্বাস শহরে স্থানান্তরিত হয়। শহরে ক্যাথলিক গীর্জার একটি স্কুল ছিল। হিটলারকে এ স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। প্রতিদিন তিনি গীর্জার স্কুলে যেতেন। কাষ্ঠনির্মিত এ গীর্জায় সংরক্ষিত কয়েকটি স্বস্তিকা চিহ্নের প্রতি তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন এবং আবেগের সঙ্গে স্বস্তিকার জার্মান শব্দ 'হাকেনক্রুজ' উচ্চারণ করতেন।

জার্মান সভ্যতায় স্বস্তিকা চিহ্ন হচ্ছে সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রতীক। 'স্বস্তিকা' শব্দটিকে দু'টি শব্দে বিভক্ত করলে প্রথম শব্দটি দাঁড়ায় 'সু' যার বাংলা অর্থ হলো কল্যাণ এবং 'আস্তির' অর্থ সমৃদ্ধি। স্বস্তিকার 'সু' শব্দটি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে ব্যাপকভাবে

ব্যবহৃত হয়। নাৎসী দলের প্রতীক ছিল স্বস্তিকা চিহ্ন। ১৯৩৩ সালের ১২ মার্চ জার্মানীর প্রচলিত জাতীয় পতাকা পরিবর্তন করে জার্মান পার্লামেন্টের শীর্ষে স্বস্তিকা উত্তোলন করা হয়। স্বস্তিকার পটভূমিতে ছিল লাল ও সাদা রং। হিটলার স্বস্তিকার লাল রংকে দেখতেন জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং সাদা অংশকে দেখতেন আর্য জাতির বিজয় বা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে।

হিটলারের কণ্ঠ ছিল সুরেলা। তিনি প্রায়ই স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাইতেন। গীর্জায়ও তার ডাক পড়তো। ফিশহ্যাম গীর্জার পুরোহিতদের দেখে তিনি মুগ্ধ হতেন। তার মধ্যে পুরোহিত হওয়ার স্বপ্ন জাগে। দু'বছর তিনি পুরোহিত হওয়ার অক্লান্ত চেষ্টা করেন। কখনো কখনো তিনি পুরোহিত সেজে অভিনয় করতেন। তাদের মতো ধর্মোপদেশ দিতেন। ৯ বছর বয়সে সিগারেট খেতে গিয়ে তিনি এক পুরোহিতের হাতে ধরা পড়ে যান। অবশ্য পুরোহিত তাকে সামান্য বকুনি দিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে লান্স কর্পোরাল হিটলার (বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় জন)

হিটলারের ১১ বছর বয়সে আফ্রিকায় বোয়ার যুদ্ধ বেধে যায়। এ যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বোয়ারকে সমর্থন করতেন। হামে আক্রান্ত হয়ে হিটলারের কনিষ্ঠ ভাই এডমান্ড মারা গেলে তিনি ভীষণ কষ্ট পান। এডমান্ডকে কবর দেয়া হয় বাড়ির পাশে একটি গোরস্তানে। হিটলারের শোবার ঘর থেকে ওই গোরস্তান দেখা যেতো। হিটলার গোরস্তানের দেয়ালে বসে ভাইয়ের কবরের দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। প্রাইমারী স্কুলের পাঠ শেষে হিটলারের পিতা তাকে লীঞ্চ শহরের একটি টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। গ্রামের ছেলে হিটলার শহরে এসে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। কেউ তার সঙ্গে মেশে না। গ্রামের ছেলে বলে সবাই তাকে অবজ্ঞা

করে। এড়িয়ে যায়। এতে হিটলার নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকেন। এজন্য প্রথম বছরের পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হন। তিনি তার পিতাকে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, তিনি অংক ও বিজ্ঞানে কাঁচা। তাই তাকে শিল্পী হতে দেয়া উচিত। কিন্তু পিতা নাছোড়বান্দা। তাকে এই স্কুলেই পড়তে হবে। অগত্যা একই শ্রেণীতে হিটলারকে থেকে যেতে হয়। ক্লাশে তখন তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বয়স্ক। অন্যদের তুলনায় বয়স্ক হওয়ায় তিনিই হয়ে উঠেন সবার অভিভাবক। এভাবে এখান থেকেই তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয় বছরে সব বিষয়ে ভালো নম্বর পেলেও তিনি অংকে ফেল করেন।

হিটলারের শৈশবকাল কাটে জার্মান সীমান্তের কাছে অস্ট্রীয় ভূখণ্ডে। এখানকার লোকজন নিজেদেরকে অস্ট্রীয়-জার্মান বলে ভাবতো। তারা অস্ট্রিয়ার হ্যাম্পসবার্গের প্রজা হওয়া সত্ত্বেও তারা জার্মান হোহেনজোর্লান ইম্পেরিয়াল হাউস এবং জার্মান কাইজারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতো। হিটলার ও তার তরুণ বন্ধুরা অস্ট্রীয় রাজতন্ত্রকে অভিবাদন না করে 'হেইল' বলে জার্মানীকে অভিবাদন জানাতো। তারা জার্মান জাতীয় সঙ্গীত 'উবার আলিস' গাইতো। স্কুলে ইতিহাসের একজন শিক্ষক ছিলেন। এই শিক্ষক ড. লিউপোল্ড পোৎস বিসমার্ক ও ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের মতো জার্মান বীরদের প্রশস্তি কীর্তন করতেন। এতে হিটলারের মনে আবেগের জোয়ার বয়ে যেতো। তার কিশোর মনে জার্মান জাতীয়তাবাদের বীজ উপ্ত হয়।

হিটলার স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া বাইরের বই-পুস্তকও পড়তেন। সময় পেলেই লাইব্রেরীতে যেতেন। পিতার ব্যক্তিগত সংগৃহীত বই-পুস্তক খুলে খুলে দেখতেন। একদিন পিতার বই-পুস্তক ঘাটতে ঘাটতে একটি বইয়ে জার্মান ও ফরাসীদের মধ্যকার একটি যুদ্ধের ছবির উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বইটির নাম ছিল 'ওয়ার অব এইটিন্থ হান্ড্রেড সেভেনটি টু সেভেনটি ওয়ান।' এ বই খুলে যুদ্ধের ছবি দেখা তার নেশায় পরিণত হয়। তিনি বার বার বইটি পাঠ করতেন। যতই পাঠ করতেন ততই মুগ্ধ হতেন। জার্মান লেখক কার্ল মে ছিলেন তার প্রিয় লেখক। লেখক কার্ল মে দক্ষিণ আমেরিকার একজন বীর যোদ্ধাকে নিয়ে প্রচুর বই লিখেছিলেন। এ বীর যোদ্ধার নাম ছিল ওল্ড শ্যাটারহ্যান্ড। বীর শ্যাটারহ্যান্ড স্বদেশী রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। সাহস ও ইচ্ছাশক্তি ছিল শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভে শ্যাটারহ্যান্ডের বিজয়ের চাবিকাঠি। তরুণ হিটলার ওল্ড শ্যাটারম্যান সিরিজের ৭০টি বই পড়ে ফেলেন। তিনি এ বইকে এত প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন যে, রাশিয়া অভিযানকালে তিনি তার কমান্ডারদের এ বইগুলো সঙ্গে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৮৯৮ সালে হিটলারদের পরিবার লীঞ্জের কাছে লিয়নডিং নামে একটি গ্রামে বসতি শুরু করে। লিয়নডিং স্কুলে তিনি ভালো গ্রেড লাভ করেন। এ সময় চিত্রাংকনের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক তৈরি হয়। তিনি আশপাশের ভবনগুলোর দিকে তাকিয়ে ডিজাইন লক্ষ্য করতেন। পরে এসব ডিজাইন হুবহু খাতায় এঁকে ফেলতেন। তিনি চিত্রকর হওয়ার জন্য পিতার কাছে বায়না ধরেন। ক্লাসিক্যাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে বললেন। পিতা এ্যালোয়িস ছিলেন একরোখা মানুষ। তিনি চাইতেন ছেলে হিটলার তার মতো সরকারী চাকুরে হোক। এ নিয়ে পিতা-পুত্রে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। শেষে পিতার

ইচ্ছাই জয়যুক্ত হয়। কিন্তু ১৯০৩ সালে ১৩ বছর বয়সে হিটলার আকস্মিকভাবে তার পিতাকে হারান। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব এসে তার কাঁধে চাপে।

অস্ট্রিয়ায় চিত্রকর হওয়ার স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় হিটলার একদিন জার্মানীর মিউনিখে এসে উপস্থিত হন। খালি পা। পোশাক জরাজীর্ণ। তবে অচিরেই তার রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। বিজ্ঞাপনের জন্য ছবি এঁকে বিক্রি করতেন। এতে তার হাতে প্রচুর পয়সা আসতে থাকে। কাফে ও রেস্তোঁয়ায় তিনি আড্ডা দিতেন। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন। জাতীয় রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো নিয়ে তুখোড় আলোচনায় লিপ্ত হতেন। আলোচনায় তিনি হতেন প্রধান বক্তা। লোকজন তার কথা মনযোগ দিয়ে শুনতো। কেউ দ্বিমত পোষণ করলে তিনি রেগে যেতেন।

কথা ছিল যে, হিটলার ১৯১০ সাল নাগাদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হবেন। কিন্তু মিউনিখে এসে তিনি অস্ট্রিয়ায় ফিরে না যাওয়ায় পুলিশ তাকে খোঁজাখুজি শুরু করে। ১৯১৩ সালে তাকে মিউনিখে খোঁজে বের করা হয় এবং বলা হয় যে, হয় তাকে স্বেচ্ছায় অস্ট্রিয়ার বোর্ড অব ইন্সপেকশনের সামনে হাজির হতে হবে নয়তো তাকে বহিষ্কার কিংবা গ্রেফতার করা হবে। এ হুমকিতে তিনি অস্ট্রিয়া ফিরে যান। এ সময় প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সামরিক বাহিনীতে তার চাকুরি করার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অস্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া এবং অস্ট্রিয়ার জন্য লড়াই করার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। তারপরেও তিনি একবার সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা চালান। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকায় বাদ পড়েন। পরে আবার ব্যাভেরীয় রেজিমেন্টে ভর্তি হওয়ার জন্য বিশেষ অনুমতি চান। জার্মান হওয়ার জন্য এটাই ছিল তার সামনে একমাত্র বিকল্প। তাকে অনুমতি দেয়া হয়। অনুমতি পত্র পেয়ে হিটলার এত খুশী হন যে, জীবনে তিনি আর কখনো এত খুশী হননি। অনুমতি পত্রের খাম খোলার সময় আনন্দে তার হাত কাঁপছিল। ভর্তি হয়ে যান ষোড়শ ব্যাভেরীয় রিজার্ভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের প্রথম কোম্পানীতে। তার রেজিমেন্টের নাম ছিল 'লিস্ট' রেজিমেন্ট। এ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল ভন লিস্টের নামানুসারে এ রেজিমেন্টের নাম হয়ে যায় 'লিস্ট রেজিমেন্ট।' ১৯১৪ সালের ৮ অক্টোবর তিনি ব্যাভেরীয় রাজা তৃতীয় লুডউইগের নামে শপথ নেন। তিনি মনে মনে জানতেন যে, আসলে তিনি জার্মানীর পক্ষে লড়াই করার জন্য শপথ নিচ্ছেন। রাতারাতি হিটলার একজন প্রাদেশিক অস্ট্রীয় থেকে জার্মান সৈন্যে পরিণত হন। ২১ অক্টোবর লিস্ট রেজিমেন্টকে প্রশিক্ষণের জন্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে পাঠানো হয়। দু'মাস পথ চলার পর লিস্ট রেজিমেন্ট লিলেতে পৌছে। এ রেজিমেন্টকে ষষ্ঠ ব্যাভেরীয় ডিভিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২৯ অক্টোবর লিস্ট রেজিমেন্টের ৩ টি ব্যাটালিয়নকে রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। হিটলার ছিলেন তার একটি ব্যাটালিয়নে। ঘিলুভেল্টে তখন বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে জার্মান সৈন্যদের তুমুল লড়াই চলছিল। লড়াইয়ে জার্মান পক্ষে ব্যাপক হতাহত হয়। হিটলার শত্রুর বেপরোয়া গোলাবর্ষণের মুখে ছিলেন নির্ভয়। লড়াইয়ে তিনি কমান্ডারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তিনি কখনো কোনো প্রশ্ন করতেন না। একজন উচুঁ মানের সৈনিকের সকল গুণাবলী তার ছিল। জার্মান পক্ষে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি

পেতে থাকায় এবং তাদের মনোবলে ধস নামা সত্ত্বেও হিটলার ছিলেন কর্তব্য পালনে অবিচল। রণাঙ্গনে কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য তার প্রমোশন হয়। ল্যান্স কর্পোরাল পদে তিনি উন্নীত হন। পরে ওয়াইপ্রেস নামে একটি জায়গার ঠিক দক্ষিণে ফরাসীদের বিরুদ্ধে লিস্ট রেজিমেন্টের লড়াই শুরু হয়। ফরাসীদের প্রচণ্ড গোলাগুলী উপেক্ষা করে হিটলার একজন আহত অফিসারকে কাঁধে বহন করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন। এ বীরত্ব প্রদর্শন করায় ১৯১৪ সালে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহসিকতা পদক আয়রন ক্রস প্রদান করা হয়। লড়াইয়ে সাড়ে ৩ হাজার জার্মান সৈন্যের মধ্যে মাত্র ৬ শ' সৈন্য রক্ষা পায়। নিহতদের মধ্যে রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল লিস্টও ছিলেন। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় সহযোদ্ধারা ধারণা করতো যে, অলৌকিক ক্ষমতার জোরে হিটলার রক্ষা পাচ্ছেন। ওয়াইপ্রেসে লড়াইকালে হিটলার ছিলেন একটি বাংকারে। হঠাৎ একটি ভৌতিক কণ্ঠ তিনি শুনতে পান। বাতাসে ভেসে আসা ওই কণ্ঠ তাকে বাংকার ত্যাগের নির্দেশ দেয়। তিনি কালবিলম্ব না করে বাংকার থেকে উঠে আসেন। তিনি বাইরে আসা মাত্রই ফরাসীদের কামানের গোলায় বাংকারটি উড়ে যায়। সেখানে যেসব জার্মান সৈন্য ছিল তাদের সবাই নিহত হয়। বেঁচে যান কেবল হিটলার। আরেকবার হেনরি ট্যান্ডি নামে সর্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত একজন বৃটিশ সৈন্য হিটলারকে গুলী করার নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। হিটলার পিছু হটছিলেন। এ সময় তিনি হেনরির নজরে পড়েন। হেনরি গুলী করার জন্য রাইফেল তাক করেন। কিন্তু কেন যেন তিনি গুলী ছুঁড়তে পারেননি। হেনরি রাইফেল নামিয়ে নেন। হেনরিকে রাইফেল নামাতে দেখে হিটলার বুঝতে পারেন যে, যুদ্ধের দেবতা তাকে রক্ষা করছে। তিনি এ ঘটনা জীবনেও ভুলতে পারেননি। একসময় তিনি হেনরির সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ পান। জার্মানীর চ্যান্সেলর হওয়ার পরও তিনি এ ছবি বার্চটেসগাডেনের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখতেন। ১৯১৬ সালের ৭ অক্টোবার বাপাউমিতে লড়াইয়ে হিটলারের পায়ে গুলী লাগে। চিকিৎসার জন্য তাকে বার্লিনের কাছে বীলিজে পাঠানো হয়। কিছুটা সুস্থ হলে তাকে মিউনিখের পেছনে লিস্ট রেজিমেন্টের রিজার্ভ ব্যাটালিয়নে বদলি করা হয়। এ সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জার্মানদের দুর্দশার চিত্র দেখতে পান। এতে তার হৃদয় ব্যথিত হয়। এ দৃশ্য তিনি সইতে পারতেন না। মানুষের দুর্দশা যাতে দেখতে না হয় সে জন্য তিনি চাইছিলেন তাকে অগ্রবর্তী অবস্থানে পাঠানো হোক। তার আশা পূর্ণ হয়। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাকে অগ্রবর্তী অবস্থানে পাঠানো হয়। সহযোদ্ধারা তাকে জীবিত দেখতে পেয়ে অবাক হয়। অগ্রবর্তী ফ্রন্টে আরাস ও থার্ড ওয়াইপ্রেসে বৃটিশদের সঙ্গে জার্মানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। হিটলার এ দু'টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। শত্রুর বিরুদ্ধে অসম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য তাকে তরবারীসহ তৃতীয় শ্রেণীর মিলিটারি ক্রস পদক দেয়া হয়। ১৯১৮ সালের ৪ আগস্ট ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে চূড়ান্ত লড়াইয়ে বীরত্বের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় তাকে অসংখ্য সম্মাননাসহ প্রথম শ্রেণীর আয়রন ক্রস পদকে ভূষিত করা হয়। রণাঙ্গনে তিনি একটি বাংকারে অবস্থান গ্রহণকারী একদল ফরাসী সৈন্যকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। হিটলার ছিলেন একা। তিনি হামাগুড়ি দিয়ে কাছাকাছি গিয়ে বাংকারে অবস্থানকারী

ফরাসী সৈন্যদের লক্ষ্য করে বলেন, চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। আত্মসমর্পণ না করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। হিটলারের চাল বুঝতে না পেরে ফরাসী সৈন্যরা মাথার উপরে হাত তুলে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

হিটলার যে সম্মান ও স্বীকৃতি চেয়েছিলেন প্রথম শ্রেণীর আয়রন ক্রস পদকে ভূষিত হওয়ায় তার সে সুযোগ এসে যায়। প্রথম শ্রেণীর আয়রন ক্রস পদক এত মর্যাদাপূর্ণ ছিল যে, নন- কমিশন্ড অফিসার তো দূরের কথা, কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের দু'একজন মাত্র এ পদক পেতেন। হিটলার সারা জীবন এ পদক বহন করতেন। এমনকি চ্যান্সেলর হওয়ার পরও।

১৯১৮ সালের ১৩/১৪ অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে ওয়াইপ্রেসের দক্ষিণে ওয়ারউইকে লিস্ট রেজিমেন্টের উপর বৃটিশরা বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপ করে। হিটলার বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হন। তিনি নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলেন না। পরদিন তিনি দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাকে পাসওয়াক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়া নাগাদ তিনি সেখানেই ছিলেন। ১৯১৮ সালের ১০ নভেম্বর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের সংবাদ শুনতে পান। এ দুঃসংবাদে তার অন্তর চুরমার হয়ে যায়। পাসওয়াক হাসপাতালের এক বৃদ্ধ পুরোহিত বাইরে থেকে ছুটে এসে কান্নাজড়িত কণ্ঠে শয্যাশায়ী আহত যোদ্ধাদের জার্মানীর পরাজয়ের সংবাদ দেন। পুরোহিত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, পরদিন যুদ্ধবিরতি হবে। কাইজারকে সিংহাসন ছাড়তে হবে এবং জার্মানী এখন থেকে প্রজাতন্ত্র। এ কথা শুনে হিটলার চোখের পানি সংবরণ করতে পারেননি। আর্য জাতি জার্মানদের যেখানে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব শাসন করার কথা সেখানে তারা কিনা করছে আত্মসমর্পণ! হিটলার তার আত্মজীবনী 'মেইন ক্যাম্ফ-এ প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর আত্মসমর্পণের সংবাদ শুনে কতটুকু কষ্ট পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে বলেন, 'গভীর হতাশার সঙ্গে এ সংবাদ শুনে আমি আমার ওয়ার্ডে ফিরে আসি এবং কম্বল ও বালিশের নীচে আমার ব্যথা চাপা দেই।'

সেনাবাহিনীর চাকুরিতে ইস্তফা দেন হিটলার। দেশব্যাপী অশান্তি, বিশৃঙ্খলা। বিশ্বব্যাপী ১ কোটি ৯০ লাখ সৈন্যসহ ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। জার্মানীর অর্থনীতি বিধ্বস্ত। চারদিকে বেকারত্ব। ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে ১৮ হাজার মার্কের বিনিময় মূল্য দাঁড়ায় এক ডলার, জুলাইয়ে ৩ লাখ ৫০ হাজার এবং সেপ্টেম্বরে ১০ লাখ। যুদ্ধের পর জার্মানীকে ওয়েমার রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রাজতন্ত্র বিদায় নেয়। গণতান্ত্রিক শাসন দেশটির অগণিত সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। রক্ষণশীল সামরিক নেতা ফিল্ড মার্শাল ভন হিন্ডেনবার্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় তিনি দক্ষিণ ও বাম উভয় ঘরানার লোকজনের সমন্বয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তার ফলাফল দাঁড়ায় শূন্য। জাতির এ দুর্ভাগ্য হিটলারকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানদের পরাজয়ের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। দিন রাত চিন্তার পর তার কাছে স্পষ্ট

হয়ে উঠে যে, পরাজয়ের জন্য বিশ্বাসঘাতক ইহুদী, কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরাই দায়ী। তিন বলতেন, পঞ্চম বাহিনী তার দেশকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করেছে।

জার্মানীতে তখন কয়েক ডজন রাজনৈতিক দল ছিল। নাৎসী দল ছিল তাদের একটি। তবে এ নামে নয়। অ্যান্টন ড্রেক্সলার নামে রেলওয়ের ৩৫ বছরের এক কর্মচারী জার্মান ওয়ার্কাস পার্টি গঠন করেন। প্রথমে এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০। দলটির সদস্য সংখ্যা বেশী– সাধারণ মানুষকে এ ধারণা দেয়ার জন্য ৫শ' থেকে সদস্যদের ক্রমিক তালিকা সংরক্ষণ করা হতো। নাৎসী দলে হিটলারের ক্রমিক নম্বর ছিল ৫৫৫। ১৯১৯ সালে মিউনিখে এক জনসভায় তিনি নাৎসী দলের সদস্য হন। বাগ্মী ও সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি এ দলের সর্বময় নেতা হয়ে যান। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি এ দলের নামকরণ করেন ন্যাশনালিস্ট সোসালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি বা সংক্ষেপে নাৎসী। 'নাৎসী' বা 'নাজী' শব্দটির মূল জার্মান শব্দ হচ্ছে National Sozialstische Deutsche Arbeiter Partie বা NSDAP. National-এর Na এবং SoZIalstische-এর Zi-মিলে সংক্ষিপ্তাকারে Nazi শব্দটি গঠিত হয়েছে। ১৯২০ সালে এ দলের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ হাজার এবং ১৯৩৩ সালে ৮ লাখ ৪৯ হাজার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এ সংখ্যা ৫০ লাখ ছাড়িয়ে যায়।

অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী হিটলার দলকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। কর্মীরা তার কাছে আমৃত্য ত্যাগ স্বীকার করার শপথ গ্রহণ করে। এসএ বা স্ট্রংট্রুপার ছিল দলটির একটি আধাসামরিক শাখা। ১৯২০ সালের শেষদিকে হিটলার মিউনিখে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে Sturm Abteilung বা এসএ গঠন করেন। নাৎসী দলের সমাবেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দেহরক্ষী হিসেবে তারা কাজ করতো। পরে এটিকে 'স্পোর্টাবটেইলং'-এ রূপান্তরিত করা হয়। স্পোর্টাবটেলং-কে স্পোর্টস সেকশন বলেও আখ্যায়িত করা হতো। ১৯২১ সালের শেষদিকে এটি স্ট্রর্মাবটেইলং বা এসএ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে। কয়েক বছরের মধ্যেই এসএ'র সংখ্যা ৪ লাখে উন্নীত হয়। ১৯২৫ সালে এসএ'র অভ্যন্তরে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে এসএস নামে আরেকটি সশস্ত্র গ্রুপও গঠন করা হয়। ব্রাউন বা তামাটে ইউনিফর্ম পরিধান করতো বলে তাদেরকে ব্রাউনশার্ট-ও বলা হতো। তদ্রূপ কালো ইউনিফর্ম গায়ে থাকতো বলে এসএস-কে ব্ল্যাকশার্ট বা কালো কোর্তা বলা হতো। ১৯২৫ সালে হিটলার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিলে তিনি তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী জুলিয়াস স্ক্রীককে এসএস গঠনের নির্দেশ দেন। এসএস'র মূল জার্মান শব্দ হচ্ছে (Schutzstaffel বা Protection Squad)। হিটলার ইতালীর একনায়ক বেনিতো মুসোলিনীর মতো সশস্ত্র কায়দায় কুচকাওয়াজ করে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেন। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি ১৯২৩ সালের ৮ নভেম্বর ২ হাজার সশস্ত্র অনুসারী নিয়ে মিউনিখে প্রবেশ করেন। শহরে প্রবেশ করে তিনি সামরিক কায়দায় মার্চ শুরু করেন। এ সময় পুলিশের সঙ্গে গুলীবিনিময়ে ১৪ জন নাৎসী কর্মী নিহত হয়। পরে হিটলার মিউনিখের বীয়ার হলে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটান। সেদিন এ হলে ব্যাভেরীয় প্রাদেশিক সরকারের তিনজন নেতা

একটি সমাবেশে ভাষণ দিতে হাজির হন। সমাবেশে প্রায় ৩ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। ভন কার বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়াতেই ভারি মেশিনগান সজ্জিত স্ট্রমট্রুপাররা হলে প্রবেশ করে। এরপরই একটি পিস্তল উঁচিয়ে হিটলার প্রবেশ করেন। তিনি সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠে একটি চেয়ার তুলে নেন। হলের সিলিং লক্ষ্য করে একটি গুলী ছুঁড়েন। এ সময় পুলিশের একজন মেজর পকেটে হাত ঢুকিয়ে অস্ত্র বের করার চেষ্টা করলে তিনি তাকে পকেট থেকে হাত বের করার নির্দেশ দেন। মেজর তার নির্দেশ পালন করে। মঞ্চে উঠে হিটলার ঘোষণা করলেন, জাতীয় বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশের স্থানীয় সদর দপ্তর দখল করা হয়েছে। একথা বলে তিনি মঞ্চে উপস্থিত তিন জন ব্যাভেরীয় প্রাদেশিক কর্মকর্তাকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দেন। আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে তিনি বললেন, তার নির্দেশ অমান্য করলে তার

পিস্তলের ৪ টি গুলীর তিনটি তাদের জন্য এবং বাকি একটি তার নিজের। এ সময় প্রথম মহাযুদ্ধে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে জার্মান বাহিনীর অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল লুডেনডর্ফ বীয়ার হলে প্রবেশ করেন এবং হিটলারের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেন। তিনি ব্যাভেরীয় প্রাদেশিক সরকারের তিন কর্মকর্তা কার, লসো ও সীসারকেও হিটলারের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দিতে রাজি করান। পরে এ তিনজনকে টেনে হিঁচড়ে পেছনের একটি কক্ষে আটক করা হয়। মার্শাল লুডেনডর্ফের অনুরোধে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি পেয়ে বাইরে গিয়েই তারা বেঁকে বসেন। হিটলারের অভ্যুত্থানকে নস্যাত করে দিতে স্থানীয় জার্মান আর্মি গ্যারিসনকে নির্দেশ দেয়া হয়। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে ১০ নভেম্বর হিটলার গ্রেফতার হন। একই সময়ে নাৎসী দলকে নিষিদ্ধ এবং হিটলারকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ২৪ দিন পর্যন্ত শুনানি চলে। শুনানিকালে হিটলার দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলেন। বিচারক পর্যন্ত তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। তাকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। তবে ৮ মাস পর তিনি ল্যান্ডসবার্গ কারাগার থেকে মুক্তি পান। কারাগারে বসেই তিনি তার আত্মজীবনীমূলক বই লিখেন। তার এ বইটি ছিল নাৎসী দলের রাজনৈতিক দর্শন।

হিটলার বইটির নাম দিয়েছিলেন, 'মিথ্যাচার, ভ্রষ্টতা ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে আমার ৪ বছরের সংগ্রাম।' খুব লম্বা মনে হওয়ায় প্রকাশক সংক্ষিপ্তাকারে বইটির নাম দেন 'মেইন ক্যাম্ফ' বা আমার সংগ্রাম। ১৯২৫ সালে বইটি প্রকাশিত হলে তার কাটতি ছিল খুবই সামান্য। হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলর হলে এ বইটির লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। মেইন ক্যাম্ফে হিটলার মানব জাতিকে শারীরিক ও বাহ্যিক গঠনের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন এবং গায়ের ফর্সা রং, কোঁকড়ানো চুল এবং নীল চোখের বিবেচনায় তিনি জার্মানদের শীর্ষ ভাগে স্থান দেন। জার্মানদের তিনি আর্য জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করে দাবি করেন যে, তারাই মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম অংশ। তিনি ইহুদী, স্লাভ, রুশ ও চেকদের মানব জাতির নীচু স্তরে স্থান দেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নীতি অনুযায়ী সবলের কাছে তিনি দুর্বলের আনুগত্য কামনা করেন। তিনি দাবি করেন, 'আমাদের সামনে আমরা যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দেখছি সেগুলো আর্য জাতির অবদান। আর্য অঞ্চলেই প্রথম সভ্য সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।' তিনি বলেন, 'নিকৃষ্ট লোকদের সঙ্গে

আর্যদের সংঘাত ঘটে। ফলে এসব জনগোষ্ঠী আর্যদের পদানত হয়ে উপকৃত হয়। বশ্যতা প্রাপ্তির এ ধারা যতদিন অব্যাহত থাকবে, যতদিন আর্যরা প্রভু থাকবে এবং একে অপরের সঙ্গে আন্তঃবিয়েতে একাকার হয়ে না যাবে ততদিন উপকৃত হওয়ার এ ধারা অব্যাহত থাকবে।' তিনি বলেন, 'ইহুদীরাই হচ্ছে সেই চক্রান্তকারী যারা শ্রেষ্ঠ জাতি আর্যদেরকে বিশ্ব শাসনে তাদের ন্যায়সঙ্গত স্থান থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে।' তিনি বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, ধনিক গণতন্ত্র ও মার্ক্সসবাদ লালন-পালনের জন্য ইহুদীদের অভিযুক্ত করে বলেন, এ অভিশপ্ত জাতি বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত।

হিটলার একসময় বুঝতে পারেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়। তাই তিনি প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক পথে এগুতে থাকেন। ১৯২৮ সালের মে'তে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নাৎসী দল ২ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট পায়। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে তারা ১৮ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট পেয়ে রাইখস্টাগে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হিটলারের জনপ্রিয়তায় ক্ষমতাসীনরা ভীত হয়ে পড়ে। তাই ১৯৩২ সালের ১৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৪ বছরের বৃদ্ধ ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল পল ভন হিন্ডেলবার্গ প্রার্থী হন। তিনি জানতেন যে, তিনি প্রার্থী না হলে হিটলার অনায়সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হবেন। এ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেলবার্গ ছাড়া অন্য যে তিনজন প্রার্থী ছিলেন তারা হলেন এডলফ হিটলার, আর্নেস্ট থিয়েলম্যান ও থিওডোর ডুয়েসটারবার্গ। প্রেসিডেন্ট হিন্ডেলবার্গ পান ৪৯ দশমিক ৬ এবং হিটলার ৩০ দশমিক ১ শতাংশ ভোট। কোনো প্রার্থী নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত তিন জন প্রার্থীর মধ্যে ১৯ এপ্রিল তৃতীয় দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে হিন্ডেলবার্গ পান ৫৩ দশমিক শূন্য এবং হিটলার ৩৬ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে হিন্ডেলবার্গ পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ফ্রাঞ্জ ভন পাপেনকে চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত করেন। পাপেন অবিলম্বে রাইখস্টাগ ভেঙ্গে দেন এবং পরবর্তী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ৫ মাসের মধ্যে এটি ছিল তৃতীয় নির্বাচন। হিটলার ও তার অনুসারীরা নির্বাচন পণ্ড করার চেষ্টা করায় বার্লিনে সামরিক আইন জারি করা হয়। পার্লামেন্ট নির্বাচনে হিটলারের নাৎসী দলের প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধি পায়। ২৭ জুলাই হিটলার ব্রান্ডেনবার্গে ৬০ হাজার লোকের সমাবেশে ভাষণ দেন। একইদিন বার্লিনের গ্রিউনওয়াল্ড স্টেডিয়ামে তার জনসমাবেশে ১ লাখ ২০ হাজার লোক সমবেত হয়। বাইরে আরো লক্ষাধিক লোক তার ভাষণ শুনতে পায়। ১৯৩২ সালের ৩১ জুলাই নাৎসী দল ২৩০টি আসনে বিজয়ী হয়ে বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে ৬০৮ আসনের পার্লামেন্টে তখনো তাদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। হিটলার তাকে চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট হিন্ডেলবার্গের উপর চাপ প্রয়োগ করেন। হিন্ডেলবার্গ অস্বীকৃতি জানান। ফলে আবার নির্বাচন হয়। ১৯৩২ সালের ৬ নভেম্বর নাৎসী দল ২০ লাখ ভোট কম পায় এবং ৩৪ টি আসন হারায়। বিশৃংখলা এড়াতে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেলবার্গ পাপেনকে বরখাস্ত করেন এবং সেনাবাহিনীর জেনারেল কুর্ট ভন সীশারকে চ্যান্সেলর নিযুক্ত করেন। রাইখস্টাগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে সীশার

প্রেসিডেন্ট হিন্ডেলবার্গের কাছে তার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সীশারের পদত্যাগের ৫৭ দিন পর প্রেসিডেন্ট হিন্ডেলবার্গ এডলফ হিটলারকে জার্মানীর চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন। মাত্র ১৪ বছরের সাধনায় অখ্যাত অপরিচিত ল্যান্স কর্পোরাল হিটলার দেশের প্রধান নির্বাহী চ্যান্সেলর পদে আসীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হিটলার তার শাসন কালের স্থায়িত্ব নিয়ে গর্ব করতেন। বলতেন, থার্ড রাইখ হাজার বছর টিকে থাকবে। কিন্তু তার সে আশা পূরণ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে থার্ড রাইখ টিকে ছিল মাত্র ১২ বছর।

প্রথম রাইখ (সাম্রাজ্য) ছিল জার্মান জাতির পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য যার সূচনা হয়েছিল ৯৬২ সালে মহান অটোর রোমের সিংহাসনে আরোহনের মধ্য দিয়ে এবং স্থায়ী হয়েছিল আনুমানিক এক হাজার বছর। ১৮৭১ সালে অটো ভন বিসমার্ক দ্বিতীয় রাইখ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ সালে সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ামের সিংহাসন ত্যাগের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় রাইখের অবসান ঘটে। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ছিল ওয়েমার রিপাবলিকের আমল। ওয়েমার রিপাবলিকের স্থলে থার্ড রাইখ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯২০-এর দশকের গোড়ার দিকে জার্মান লেখক আর্থার মুলার ভন দার ব্রাক তার একটি বইয়ের শিরোনাম দিয়েছিলেন 'থার্ড রাইখ।' হিটলার এ বইয়ের শিরোনাম গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৪৫ সালের মে পর্যন্ত নাৎসী সরকারের আমল সরকারীভাবে থার্ড রাইখ হিসেবে পরিচিত ছিল।

হিটলার ক্ষমতায় এসেই পার্শ্ববর্তী ইতালীর একনায়ক মুসোলিনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব জোরদার করেন। জার্মানী ও ইতালী জোটবদ্ধ হয়। এ জোটের নাম ছিল অক্ষজোট বা 'এক্সিস'। ১৯২৩ সালে বেনিতো মুসোলিনী প্রথম জার্মানী ও ইতালীর জোটকে 'এক্সিস' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সে সময় তিনি এক নিবন্ধে লিখেছিলেন, The axis of European history runs through Berlin. অর্থাৎ ইউরোপীয় অক্ষের ইতিহাস বার্লিনের মধ্য দিয়ে প্রসারিত। ১৯৩৬ সালের অক্টোবরে বার্লিনে হিটলারের সঙ্গে বৈঠকের পর মিলানে এক জনসভায় তিনি আবার বলেছিলেন, The vertical line between Rome and Berlin is not a partition but rather an axis round which all European states animated by the will to collaboration and peace can also collaborate. রোম ও বার্লিনের মধ্যকার শীর্ষবিন্দুর সীমান্ত রেখা কোন বিভাজন নয়, বরং এটি একটি অক্ষ যাকে কেন্দ্র করে সহযোগিতার ইচ্ছায় উজ্জীবিত সকল ইউরোপীয় দেশ আবর্তিত হচ্ছে এবং এ অক্ষ বা মেরুকে কেন্দ্র করে শান্তিও সহায়ক হতে পারে। মুসোলিনীর ভাষায় এ এক্সিস বা অক্ষশক্তিই গোটা বিশ্বের বিরুদ্ধে ৬ বছর সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়েছে। হিটলার ছিলেন এ মহাযুদ্ধের মহানায়ক।

জার্মান সশস্ত্র বাহিনী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমার্ধে রণাঙ্গনে জার্মান সেনাবাহিনী ছিল অজেয়। কয়েক বছরের মধ্যে তারা ব্লিৎসক্রীগ গতিতে অভিযান চালিয়ে দু'চারটি নিরপেক্ষ দেশ বাদে গোটা ইউরোপ দখলে সক্ষম হয়। সামরিক ইতিহাসে সাফল্যের রেকর্ডে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছাড়া আর কেউ হিটলারের সমকক্ষ নন। তিনি কিভাবে একটি মৃতপ্রায় জাতিকে মাত্র ৬ বছরের মধ্যে ধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে এনে গোটা পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করার পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন তা শুধু বিস্ময়কর নয়, মানুষের প্রচলিত জ্ঞানেরও অতীত। হিটলারের নেতিবাচক দিকগুলোই শুধু আমরা জানি। জানি না কেবল তার অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলী ও অতুলনীয় দেশপ্রেম।

ক্ষমতায় এসেই হিটলার তার জাতিকে ভার্সাই চুক্তির অভিশাপ থেকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেন। তিনি যে এ চুক্তি লংঘন করে জার্মানীকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করবেন তা অনুমান করা মোটেও কষ্টকর ছিল না। হিটলার তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ মেইন ক্যাম্ফ-এ বার বার ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে খেদ প্রকাশ করেন। তিনি তার প্রতিটি ভাষণে এ চুক্তির বিরোধিতা করেছেন। হিটলার তার ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতিতে অঙ্গীকার করেন যে, তিনি জার্মানীর উপর চাপিয়ে দেয়া ভার্সাই চুক্তির শর্ত অমান্য করবেন। এ চুক্তি বলবৎ থাকায় জার্মান সেনাবাহিনীর আয়তন ১ লাখের বেশী বাড়ানো সম্ভব ছিল না। তাই হিটলার কৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি নাৎসী দলের কট্টর সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠন করেন স্টর্ম এ্যাবটেইলাং (Sturm Abteilung) বা এসএ। ১৯৩৪ সালের মধ্যে এ মিলিশিয়াদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫ লাখে। এসএ'র গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ন্যাশনাল সোসালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি বা নাৎসী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ভীত হয়ে পড়েন। জার্মান সেনাবাহিনীর অফিসারগণও শংকিত হয়ে পড়েন। জার্মান সেনা অফিসারগণ ভাবছিলেন, আর্নেস্ট রোহম ও এসএ অতি সত্বর সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। কিন্তু হিটলার তাদের আশংকা অমূলক বলে প্রমাণ করেন। এক রাতে তার নির্দেশে এসএ'র ৪ শ' কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়। সে রাতকে বলা হয় 'নাইট অব দ্য নাইভস।' এসএ'কে নেতৃত্বহীন করে হিটলার জার্মান সেনাবাহিনীকে দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠার সুযোগ করে দেন।

ভার্সাই চুক্তিতে দুর্বলতাও ছিল। এ চুক্তিতে জার্মান নৌ-বাহিনীতে সাবমেরিন নিষিদ্ধ করা হলেও একথা উল্লেখ করা হয়নি যে, জার্মানী বিদেশে সাবমেরিন ক্রুদের প্রশিক্ষণ দিতে কিংবা নিষিদ্ধ জার্মান লুফটওয়াফে বা বিমান বাহিনীর পাইলটরা বেসামরিক পাইলটদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবে না। ভার্সাই চুক্তির এসব অস্পষ্টতার

সুযোগে হিটলার জার্মান সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনে বদ্ধপরিকর হন। ১৯৩৩ সালে তিনি জার্মান সেনাবাহিনীর আয়তন তিন গুণ বৃদ্ধি করে ৩ লাখে উন্নীত করার নির্দেশ দেন। তাছাড়া তিনি জার্মান বিমান মন্ত্রণালয়কে ১ হাজার যুদ্ধবিমান তৈরির নির্দেশও দেন। প্রথম দু'বছর অত্যন্ত গোপনে জার্মানীর সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠনের কাজ চলতে থাকে। ১৯৩৫ সালে ইউরোপ জানতে পারলো যে, নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধ বিমানের সংখ্যা আড়াই হাজার এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৩ লাখে পৌঁছেছে। সমরাস্ত্র ও সৈন্য সংখ্যায় ফ্রান্স ছিল জার্মানীর তুলনায় কয়েক গুণ এগিয়ে। তাই হিটলার ভারসাম্য রক্ষায় ফ্রান্সের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রস্তাব দেন যে, সামরিক শক্তিতে হয়তো ফ্রান্সকে জার্মানীর সমপর্যায়ে নেমে আসতে হবে। নয়তো জার্মানীকে ফ্রান্সের সমপর্যায়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ দিতে হবে। ফ্রান্স জার্মানীর এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে হিটলার জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসেন। ১৯৩৫ সালে তিনি সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের নির্দেশ দেন। সে বছর থেকে জার্মান সেনাবাহিনীতে বছরে ৩ লাখ লোককে রিক্রুট করা শুরু হয়। ১৯৩৮ সাল নাগাদ জার্মান সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৬ লাখে উন্নীত হয়। ডিভিশনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮টি।

জার্মান বিমানবাহিনী প্রধান ও হিটলারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ফিল্ড মার্শাল হ্যারমেন গোয়েরিং

বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার বিরুদ্ধে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। তাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণও ছিল। সে সময় বৃটেন মহামন্দায় বিধ্বস্ত তার অর্থনীতি পুনর্গঠনে ব্যস্ত ছিল। তার পক্ষে আরেকটি যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, ফরাসীরা সম্ভাব্য জার্মান হামলার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার উপর জোর দেয়। দেশটি দু'দেশের সীমান্তের মাঝখানে ম্যাজিনো লাইন নির্মাণে তার

সময় ও অর্থ ব্যয় করে নিশ্চিন্ত বোধ করছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল ভার্সাই চুক্তির শর্ত লংঘনে জার্মানীর কার্যকলাপে বৃটেনের মৌন সম্মতি ছিল। ভার্সাই চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, জার্মান নৌ-বাহিনীতে কোনো সাবমেরিন থাকবে না এবং তাদের নৌ-বহরে যুদ্ধজাহাজ থাকবে মাত্র ৬টি। তবে যুদ্ধজাহাজগুলোর কোনোটির ওজন ১০ হাজার টনের বেশী হবে না।

১৯৩৫ সালের জুনে এ্যাংলো-জার্মান নৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি জার্মানীকে বৃটিশ নৌ-বহরের এক-তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ নৌ-শক্তি গড়ে তোলার সুযোগ দেয়। তাছাড়া, জার্মানী বৃটেনের সমান সাবমেরিন তৈরির সুযোগও পেয়ে যায়। জার্মানীর সঙ্গে নৌ-চুক্তি স্বাক্ষরে বৃটেনের কয়েকটি যুক্তি ছিল। তখন মনে হচ্ছিল, যে কোনো মূল্যে জার্মানী তার নৌ-বহরকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবে। তাই বৃটেন মনে করছিল, দু'টি দেশের মধ্যে নৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে। অন্যদিকে, বৃটেনের কোনো কোনো মহলে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, জার্মানীর উপর চাপিয়ে দেয়া ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলো খুব কঠিন এবং এসব শর্ত শিথিল করা প্রয়োজন। বৃটেন বিশ্বাস করতো, ইউরোপে মিলেমিশে বসবাস করতে হলে জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা প্রয়োজন। এটাও মনে করা হতো, চুক্তি হলে হিটলার সন্তুষ্ট হবেন এবং তিনি সন্তুষ্ট হলে ইউরোপ উপকৃত হবে। বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে জার্মানী ইউরোপে নিজেকে কোণঠাসা ভাববে না। ইউরোপ স্থিতিশীল হবে এবং জার্মানীর ক্ষোভ দূর হবে। তাছাড়া, জার্মানী চুক্তি মেনে চললে দেশটির নৌ-বাহিনীর আকার ও আয়তন সম্পর্কে বৃটেনের একটি স্পষ্ট ধারণা থাকবে।

১৯৩৯ সালে পোল্যান্ড আক্রমণকালে জার্মান সেনাবাহিনীতে ডিভিশন ছিল ৯৮টি। এসব ডিভিশনের কয়েকটির অস্ত্রশস্ত্রের মান তত উন্নত ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবীণ সৈনিকরাও নতুন করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন। এসব ঘাটতি সত্ত্বেও তখন জার্মান সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ করার মতো ১৫ লাখ সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল। পাঞ্জার বাহিনী ছিল জার্মান বাহিনীর মূল স্তম্ভ। জার্মান ভাষায় সাঁজোয়া বাহিনীকে বলা হতো 'পাঞ্জার' বাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সেনাবাহিনীতে সাঁজোয়া বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না। জার্মানরাই সেনাবাহিনীতে প্রথম পাঞ্জার বাহিনী সংযোজন করে। ট্যাংক ছিল পাঞ্জার বাহিনীর মূল অস্ত্র। হাজার হাজার ট্যাংকের সাহায্যে পাঞ্জার ডিভিশন গঠন করা হয়। জার্মান সেনাবাহিনীতে তখন কি পরিমাণ ট্যাংক ছিল তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে একটি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, শুধুমাত্র ১৯৪৩ সালেই জার্মানীতে ১৩ হাজার ট্যাংক তৈরি হয়।

নাৎসী জার্মানীতে সশস্ত্র বাহিনীকে বলা হতো ওয়ারম্যাট। তাছাড়া ওয়াফেন-এসএস-ও ছিল সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ১৯৩৯ সাল নাগাদ জার্মান সেনাবাহিনীতে ৯টি পাঞ্জার ডিভিশন গড়ে উঠে। এসব পাঞ্জার ডিভিশনের প্রতিটিতে ট্যাংকের সংখ্যা ছিল ৩২৮টি, সহায়ক ব্যাটালিয়ন ছিল ৮ টি এবং আরো ছিল ৬ টি আর্টিলারি ব্যাটারি।

১৯৪০ সালে জার্মান সেনাবাহিনী যখন পশ্চিম রণাঙ্গনে লড়াইয়ে জড়িত হয়ে পড়ে তখন তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২৫ লাখ এবং ট্যাংক ছিল আড়াই হাজার। অন্যদিকে, ফরাসী সেনাবাহিনী তখন রণাঙ্গনে ৫০ লাখ লোক নিয়োজিত করার সামর্থ্য রাখতো। বিমান বাহিনী ও যান্ত্রিক সহায়তাপুষ্ট ২৫ ডিভিশন সৈন্যের ফরাসী বাহিনী অনায়াসে বিজয়ী হতে পারতো। কিন্তু জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনের অবিশ্বাস্য দ্রুতগতির কাছে তারা হার মানতে বাধ্য হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে অভিযানকালে জার্মান সেনাবাহিনী আরো শক্তিশালী হয়। রুমানিয়া ও হাঙ্গেরীর ২ লাখ সৈন্যসহ ৪০ লাখ জার্মান সৈন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অপারেশন বারবারোসায় অংশ নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জার্মান পদাতিক ডিভিশনের সংখ্যা ছিল ১৪২টি, পাঞ্জার ডিভিশন ছিল ১৭ টি এবং ট্যাংক ছিল ৪ হাজার। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপারেশন বারবারোসা এবং ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সের নরমান্ডিতে মিত্রবাহিনীর অবতরণকালে বিপুল প্রাণহানি সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী নাগাদ জার্মান সেনাবাহিনীতে ১৬৮ ডিভিশন পদাতিক সৈন্য ও ২৫ ডিভিশন পাঞ্জার ছিল। ওয়াফেন-এসএস'র ছিল ৭ টি সাঁজোয়া ডিভিশনসহ ২৩টি ডিভিশন।

হিটলার শূন্য হাতে দেশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে জার্মান সেনাবাহিনীতে কোনো পাঞ্জার ডিভিশন ছিল না। সে সময় পদাতিক ডিভিশন ছিল ৭ টি, ১ লাখ ১৭ হাজার ৩৫০ টন পরিবহন ক্ষমতার মধ্যে যুদ্ধজাহাজ সীমিত ছিল। নৌ-বাহিনীতে কোনো সাবমেরিন ছিল না। বিমান বাহিনীতে কোনো যুদ্ধবিমানও ছিল না। নৌ-সৈন্য ছিল ১৫ হাজার। ১৯৪১ সালের এপ্রিলে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীতে পাঞ্জার ডিভিশনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টি, পদাতিক ডিভিশনের সংখ্যা ২১৪, নৌ-বাহিনীর জাহাজগুলোর সম্মিলিত পরিবহন ক্ষমতা দাঁড়ায় ৩ লাখ ৬৩ হাজার ১৭১ মেট্রিক টন, সাবমেরিন ১৮৯ টি এবং যুদ্ধবিমান ৪০ হাজার।

১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মান বিমান বাহিনীতে যেসব যুদ্ধবিমান তৈরি হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল (১) এ্যারাডো এ আর (১৭ প্রকার), (২) ব্লোহম ইউন্ড ভস বিভি (৭ প্রকার), (৩) ব্যাচেম বা ন্যাটার, (৪) ডোর্নিয়ার, (৫) ফিসেলার, (৬) ফকে, (৭) হেইঙ্কেল (৮) হেইনশেল (৪ প্রকার) (৯) জাংকার্স (১৪ প্রকার) ও (১০) মেসার্সমিট (১৮ প্রকার)।

শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠনে ভার্সাই চুক্তি একটি অনতিক্রম্য বাধা বলে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও নাৎসী জার্মানী সাবমেরিন বহর গঠন করে। জার্মান সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজকে সংক্ষেপে বলা হতো ইউ-বোট। জার্মান ভাষায় ইউ-বোট বা Undersee Boat ছিল শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজের জন্য একটি ভয়ংকর অস্ত্র। আটলান্টিক মহাসাগর ও উত্তর সাগরে ১৯৪১ সালের ৯ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪ দিনের যুদ্ধে একটি জার্মান সাবমেরিনের বিপরীতে ১৬ টি বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ নিমজ্জিত হয়। ভাসমান অবস্থায় ইউ-বোট আক্রান্ত হওয়ার যোগ্য হলেও এটি পানির নীচে ডুব দিলে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতো। ১৯৩৫-৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মানী ২৬ প্রকার ইউ-বোট তৈরি

করে। ভার্সাই চুক্তি বলবৎ থাকায় ১৯৩৯ সালে মাত্র ৫৭ টি উপকূলীয় ও সমুদ্রগামী ইউ-বোট নিয়ে জার্মানীকে যুদ্ধে যোগদান করতে হয়। যুদ্ধের শেষ বছরে জার্মান ইউ-বোট উৎপাদন চূড়ান্ত ধাপে পৌছে।

কমিউনিস্ট রেড আর্মির হামলা থেকে জার্মান শহরগুলো রক্ষায় হিটলার সেনাবাহিনীকে সমর্থনদানে গণমিলিশিয়াও গঠন করেছিলেন। নিয়মিত সার্ভিসের জন্য প্রবীণ ও তরুণদের নিয়ে এ গণমিলিশিয়া গঠন করা হয়। অর্থনীতিতে বিপুল চাপ পড়ায় এবং সশস্ত্র বাহিনীর চাহিদা পূরণে হিমশিম অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এ গণবাহিনী ছিল অর্ধসজ্জিত।

বিশাল জার্মান বাহিনীতে ছিলেন ১৭ জন ফিল্ড মার্শাল। যুদ্ধকালে তাদের মধ্যে ১০ জনকে কমান্ড থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ১৯৪৪ সালের জুলাইয়ে হিটলারকে হত্যার চক্রান্তে জড়িত থাকার দায়ে ৩ জন ফিল্ড মার্শালের মৃত্যুদণ্ড হয়। অভিযানকালে নিহত হন ২জন ফিল্ড মার্শাল। একজন মিত্রবাহিনীর কাছে বন্দী হন এবং আরেকজন গোটা যুদ্ধের সময় নির্বিবাদে দায়িত্ব পালন করেন। ৩৬ জন ছিলেন পূর্ণাঙ্গ জেনারেল। তাদের মধ্যে ২৬ জনকে পদ থেকে অপসারণ করা হয়। ৩ জন জেনারেলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ২ জনকে অসম্মানজনকভাবে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। ৭ জন যুদ্ধে নিহত হন। তবে শৃঙ্খলাবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া ছাড়া সসম্মানে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন মাত্র ৩ জন জেনারেল।

জার্মান সেনাবাহিনীর আয়তন ছিল বিশাল। এতে ছিল ২৯টি আর্মি গ্রুপ (হেরসগ্রুপেন), আর্মি ছিল ৩৩ টি (আর্মি ওভারকমান্ডো), সাঁজোয়া গ্রুপ ৯ টি (পাঞ্জার গ্রুপ), কোর ৮৬ টি। প্রতিটি কোরে ছিল অন্তত ৮টি ডিভিশন। প্রতিটি ডিভিশনে সৈন্য ছিল প্রায় ১৬ হাজার। শৃংখলা ছিল কিংবদন্তীতুল্য।

১৯৩৫ সালে ওয়ারম্যাট রাইখওয়ারের স্থলাভিষিক্ত হয়। ১৯২৩ সালে রাইখওয়ার গঠন করা হয়েছিল। আক্ষরিকভাবে জার্মান শব্দ 'ওয়ারম্যাট' বলতে বুঝায় কোনো একটি দেশের পুরো সশস্ত্র বাহিনী। ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল পল ভন হিন্ডেনবার্গের মৃত্যু হলে সকল সৈন্যকে হিটলারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে নির্দেশ দেয়া হয়। ঐতিহাসিক রুডিগার ওভারম্যান্সের মতে, ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মান ওয়ারম্যাটে সক্রিয় সৈন্য সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮২ লাখ। তার মধ্যে ৫৩ লাখ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় এবং আনুমানিক ১ কোটি ১০ লাখ সৈন্য শত্রুর হাতে আটক হয়। তবে আটক সৈন্যদের মধ্যে কতজন মারা যায় তার সংখ্যা জানা যায়নি।

আইনগতভাবে জার্মান চ্যান্সেলার ছিলেন ওয়ারম্যাটের সর্বাধিনায়ক। সশস্ত্র বাহিনীর প্রশাসন ও সামরিক কর্তৃত্ব ছিল ওয়ার মিনিস্ট্রির আওতায়। ওয়ার্নার ভন ব্লমবার্গ ছিলেন এ মিনিস্ট্রির প্রধান। ১৯৩৮ সালে তিনি পদত্যাগ করলে ওয়ার মিনিস্ট্রি বিলুপ্ত করে দিয়ে উইলহেম কিটেলের অধীনে সশস্ত্র বাহিনী হাই কমান্ড গঠন করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর হাই কমান্ডকে বলা হতো 'ওভারকমান্ডো দার ওয়ারম্যাট' বা সংক্ষেপে ওকেডব্লিউ। ওকেডব্লিউ সকল সামরিক তৎপরতায় সমন্বয় সাধন করতো। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর ছিল নিজস্ব হাই কমান্ড। সেনাবাহিনীর হাই কমান্ডকে বলা হতো

'ওভারকমান্ডো দার হেরস' (ওকেএইচ), নৌ-বাহিনীর হাই কমান্ডকে 'ওভারকমান্ডো দার মেরিন' (ওকেএম) এবং বিমান বাহিনীর হাই কমান্ডকে বলা হতো 'ওভারকমান্ডো দার লুফটওয়াফে' (ওকেএল)। প্রতিটি হাই কমান্ডের ছিল নিজস্ব জেনারেল স্টাফ। নাৎসী আমলে জার্মান সেনাবাহিনী হের, বিমান বাহিনী লুফটওয়াফে এবং নৌ-বাহিনী ক্রিগসমেরিন হিসেবে পরিচিত ছিল। এডলফ হিটলার একসময় সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত থাকায় এবং পরে সেনাবাহিনী প্রধান পদ অলংকৃত করায় তাকে হের হিসেবে সম্বোধন করা হতো।

ওকেডব্লিউ (সশস্ত্র বাহিনী হাই কমান্ড) ঃ
সুপ্রীম কমান্ডের প্রধান—ফিল্ড মার্শাল উইলহেম কিটেল
অপারেশন স্টাফ প্রধান—কর্নেল জেনারেল আলফ্রেড জোডল।

ওকেএইচ (আর্মি হাই কমান্ড)
কমান্ডার-ইন-চীফ
কর্নেল জেনারেল ওয়ার্নার ভন ফ্রিটস (১৯৩৫-১৯৪১)
ফিল্ড মার্শাল ওয়ালথার ভন ব্রাউশিটস (১৯৩৮-১৯৪১)
ফুয়েরার ও রাইখ চ্যান্সেলার এডলফ হিটলার (১৯৪১-১৯৪৫)
ফিল্ড মার্শাল ফার্ডিনান্ড শোরনার (১৯৪৫)

ওকেএম (নৌ-হাই কমান্ড)
নেভি কমান্ডার্স- ইন-চীফ
গ্র্যান্ড এডমিরাল এরিখ রীডার (১৯২৮-১৯৪৩)
গ্রান্ড এডমিরাল কার্ল ডোয়েনিটস (১৯৪৩-১৯৪৫)
জেনারেল এডমিরাল হ্যান্স জর্জ ভন ফ্রিডবার্গ (১৯৪৫)

ওকেএল (এয়ার ফোর্স হাই কমান্ড)
কমান্ডার-ইন-চীফ
রাইখ মার্শাল হেরম্যান গোয়েরিং (---১৯৪৫)
ফিল্ড মার্শাল রবার্ট রিটার ভন গ্রেইম (১৯৪৫)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু জার্মানীর ভৌগলিক সীমানায় বসবাসকারী জার্মানরাই নয়, অন্যান্য দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু জার্মানরাও ওয়ারম্যাটে সার্ভিসে ছিল। তাছাড়া ওলন্দাজ, রুমানীয়, হাঙ্গেরীয় ও স্ক্যান্ডেনেভীয়দের কোনো কোনো গ্রুপ বা গোষ্ঠীও জার্মান সেনাবাহিনীতে কাজ করেছে। রাশিয়া অভিযানকালে জার্মানদের সঙ্গে ভিন্নমতাবলম্বী রুশরা যোগ দেয়। এসব রুশকে নিয়ে গঠন করা হয় 'রুশ লিবারেশন আর্মি।' অরুশদের একটি অংশও জার্মানদের সঙ্গে যোগ দেয়। এসব অরুশরা 'অসটেলেজিয়ন' গঠন করে। জেনারেল আর্নেস্ট আগস্ট কস্ট্রিং এসব ইউনিটের নেতৃত্বে ছিলেন। জার্মান সেনাবাহিনীতে অনুগত বিদেশীদের সংখ্যা ছিল ৫ শতাংশ।

জার্মান সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিদেশী সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতামত। সোভিয়েত রেড আর্মির লেঃ জেনারেল খোজিন তার '১৯৪৩ সালে সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধের কৌশল ও ট্যাকটিকস' নামে গ্রন্থে বলেছেন, 'ব্যাপকভাবে দাবি করা হয়, জার্মান সেনাবাহিনী অজেয়। কিন্তু এ দাবি সত্যি নয়। ১৯৩৯-৪০ সালে জার্মান সেনাবাহিনী যেসব দেশ দখল করেছে সেসব দেশ দখলে তারা চক্রান্ত ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়, বিজিত ফরাসী সরকারের বেশ কিছু সদস্যের সঙ্গে জার্মান এজেন্টদের সম্পর্ক ছিল। জার্মানরা যেখানেই প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে সেখানে তারা তাদের সংখ্যাধিক্য ও সমরাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের জোরে তা গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৩৯ সালে নাৎসীরা ৪৫টি ডিভিশন নিয়ে পোল্যান্ডে হামলা চালায়। প্রতিটি জার্মান পদাতিক ডিভিশনে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। অন্যদিকে, পোল্যান্ডের ছিল ৪০ ডিভিশন সৈন্য। তাদের প্রতিটি ডিভিশনে সৈন্য ছিল সাড়ে ১০ হাজার। জার্মানদের ভারি কামানের সংখ্যা ছিল পোলিশদের তুলনায় দ্বিগুণ। পোল্যান্ডের ৬শ' কামানের বিপরীতে জার্মান কামানের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪শ'। পোল্যান্ডের ২ হাজার ৪ শ' হাল্কা কামানের বিপরীতে জার্মানদের ছিল ৩ হাজার ১ শ'। পোল্যান্ডের ট্যাংকবিধ্বংসী কামান ছিল ৬ শ'। পক্ষান্তরে, জার্মানদের ছিল ৪ হজার ৭৯০টি। পোল্যান্ডের ৯১০টি ট্যাংকের বিপরীতে জার্মানদের ছিল ৩ হাজার ৩৫০টি এবং ১ হাজার ২ শ' বিমানের বিপরীতে আড়াই হাজার বিমান। সমরাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্ত্বেও জার্মানীর রাইনহার্ড ট্যাংক ডিভিশন ওয়ারশতে বিধ্বস্ত হয়।'

জেনারেল খোজিন আরো লিখেছেন, ' ১৯৪০ সালের ১০ মে হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গে মিত্রবাহিনীর মূল হামলার বিরুদ্ধে জার্মানরা ১০৭ টি পদাতিক ও ১০টি ট্যাংক ডিভিশন ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে, মিত্রবাহিনী ব্যবহার করেছিল ৬৩ টি পদাতিক ডিভিশন, ৪ টি হাল্কা যান্ত্রিক ও ৬ টি ক্যাভালরি ডিভিশন। বৃটিশ, বেলজীয়, ফরাসী ও ওলন্দাজ আর্মি নিয়ে মিত্রবাহিনী গঠিত হয়। এ বাহিনী কোনো একক কমান্ডে ছিল না। অপারেশন ও যুদ্ধের কৌশল নিয়ে ছিল আবার তাদের মধ্যে গভীর রাজনৈতিক ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং পরস্পরবিরোধী মতামত। বস্তুতপক্ষে, আধুনিক সুরক্ষিত অবস্থানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার মতো কোনো অভিজ্ঞতা জার্মান সেনাবাহিনীর ছিল না। পোল্যান্ডের পশ্চিম ফ্রন্ট ছিল পুরোপুরি অরক্ষিত এবং ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যূহ ছিল অতিমাত্রায় দুর্বল। জার্মান সেনাবাহিনী ফ্রান্সের চমৎকার রাস্তাগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে ম্যাজিনো লাইন অতিক্রমে সক্ষম হয়।'

জার্মানীর আণবিক বোমা তৈরির প্রচেষ্টা

নাৎসী জার্মানী যুদ্ধকালে আণবিক বোমা তৈরির জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। তবে তারা তাদের প্রচেষ্টায় কতটুকু সফল হয়েছিল তা কারো পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হচ্ছে না। আত্মসমর্পণের পূর্বাহ্নে জার্মানরা তাদের আণবিক বোমা সংক্রান্ত দলিলপত্র ও প্যাটেন্ট ধ্বংস করে ফেলে। তা সত্ত্বেও মিত্রবাহিনী কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহে সক্ষম হয়। তাতে দেখা গেছে যে, জার্মানী আণবিক বোমা তৈরির প্রচেষ্টায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল পিছিয়ে। আলোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ১৯৪৩ সাল থেকে যুদ্ধের গতি জার্মানীর বিপক্ষে চলে না গেলে তারাই হতো পৃথিবীর প্রথম আণবিক শক্তি। এটা স্বীকৃত যে, জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান ও ফ্রিটস স্ট্রাসম্যানের গবেষণার মধ্য দিয়ে আণবিক যুগের সূচনা হয়। বিজ্ঞানী অটো হান ছিলেন নিউক্লিয়ার ফিশনের সহযোগী আবিষ্কারক।

যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিশ্বের প্রথম আণবিক শক্তির অধিকারী দেশ বলে দাবি করে থাকে। আমাদের অনেকেই তা বিশ্বাস করেন। কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা গেছে, শত্রু জার্মানী থেকে পাচারকৃত আণবিক কাঁচামাল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আণবিক শক্তি অর্জন করা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। যে ম্যানহাটন প্রকল্প থেকে আমেরিকার আণবিক বোমা তৈরি হয়েছে সে প্রকল্পে আণবিক অস্ত্র তৈরির মৌলিক উপাদান সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম এসেছিল জার্মানী থেকেই। ২০০৪ সালের ৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় ক্রিটিকাল মাস গ্রন্থের লেখক কার্টার হাইড্রিক লস আলামোসের ব্রাডবেরী বিজ্ঞান জাদুঘরে তার পুস্তকের প্রকাশনা উৎসবে দাবি করেছেন, নাৎসী জার্মানীর আত্মসমর্পণের ১১ দিন পর মার্কিন মেরিনদের প্রহরায় ৫৬০ কেজি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম এবং আণবিক বোমা তৈরির অন্যান্য সরঞ্জাম বোঝাই ইউ-২৩৪ নম্বরের একটি জার্মান সাবমেরিন নিউ হ্যাম্পশায়ারে নৌ-বাহিনীর একটি পোতাশ্রয়ে এসে পৌঁছে। এসব সামগ্রী পরে ম্যানহাটন প্রকল্পে নিয়ে যাওয়া হয়। জার্মানী থেকে আনীত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে মার্কিন বিজ্ঞানীরা আণবিক বোমা তৈরি করতে সক্ষম হন। এ আণবিক বোমাই পরে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষেপ করা হয়।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবি করছেন, নাৎসী জার্মানীই প্রথম আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ২০০৫ সালে বার্লিনের ঐতিহাসিক রেইনার কার্লসাচ জার্মান ভাষায় প্রকাশিত তার 'হিটলার্স বোম্বি' নামে পুস্তকে দাবি করেছেন, নাৎসী জার্মানী থুরিঙ্গিয়ায়

পৌঁছে। তখনকার দিনে এটি ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী মেশিনগান। স্নায়ুযুদ্ধকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ে মেশিনগানের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করে। জার্মান বুন্ডেসউইহার এমজি-৩ সহ অন্যান্য মেশিনগান এখনো সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত হয়। এ প্রজন্মের মেশিনগান ব্যবহারের ধারাবাহিকতা থেকে জন্ম নিয়েছে জি-৩। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যবহৃত এম-৬০ মেশিনগান তৈরিতে মার্কিন সামরিক বাহিনী জার্মানীর তৈরি এফজি-৪২-এর অপারেটিং সিস্টেম নকল করেছিল।

যুদ্ধকালে জার্মানদের আগ্নেয়াস্ত্র প্রযুক্তি ছিল অন্য যে কোনো জাতির চেয়ে বহু গুণ উন্নত। তাদের অগ্রগতির ছাপ আজকের বিশ্বের সর্বত্র অস্ত্রের নকশা তৈরি এবং নির্মাণে পরিদৃষ্ট হয়। বহু অস্ত্র নির্মাতা জার্মানদের পরাজয়ের ছাই ভস্ম থেকে উন্নতির শীর্ষে আরোহন করে। হেকলার এন্ড কোচ, এসআইজি, ফেব্রিক ন্যাশনাল প্রভৃতি অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আগ্নেয়াস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। এ বিষয়ে যারা আগ্রহী ছিলেন না তারাও তাদের স্বীকৃতি দেয়। শুধু আগ্নেয়াস্ত্র নয়, জেট প্রযুক্তি ও মহাকাশ প্রতিযোগিতায়ও জার্মানীর প্রযুক্তিগত প্রতিভার ছাপ পড়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইলেক্ট্রনিক্সের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। যুদ্ধের আগে স্বল্পসংখ্যক ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হতো। যুদ্ধের মাঝামাঝিতে উদ্ভাবিত রাডার ও এএসডিআইসি'র মতো যন্ত্রপাতিগুলো নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। নিজেদের প্রয়োজনে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং শত্রু পক্ষের যোগাযোগের বার্তা ধরার জন্য সাজসরঞ্জাম তৈরির প্রচণ্ড তাগিদ দেখা দেয়। যুদ্ধ সংক্রান্ত গবেষণায় ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স বিরাট অবদান রাখে। আধা গোপনীয় এনিয়াক এবং অতি গোপনীয় কলোসাস প্রমাণ করে যে, হাজার হাজার ভাল্‌ভ ব্যবহারকারী ডিভাইস প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। এ প্রযুক্তি যুদ্ধোত্তরকালে কম্পিউটার প্রোগ্রাম সংরক্ষণ করে রাখার পথ খুলে দেয়।

নতুন নতুন সাজসরঞ্জামের দ্রুত উন্নয়নের পাশাপাশি এসব সাজসরঞ্জাম তৈরি এবং সেনাবাহিনীকে এসব সরঞ্জামে সজ্জিত করে তোলা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যেসব দেশ তাদের শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল এবং যথাসময়ে তাদের সৈন্যদের সমরাস্ত্রে সজ্জিত করতে পেরেছিল তারাই অধিক সফল হয়। সিনথেটিক রাবার উৎপাদনের সামর্থ্য ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এতে প্রাকৃতিক রাবারের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায় এবং সমরাস্ত্র উৎপাদনে সহায়ক হয়। সিনথেটিক উৎপাদনের সাফল্য যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

মানব ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো বিধ্বংসী যুদ্ধ আর কোনোটাই নয়। এমন কোনো দেশ নেই যে দেশ এ যুদ্ধে কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এ যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল জার্মানী, জাপান ও ইতালী। তাদেরকে বলা হতো অক্ষশক্তি। অন্যদিকে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, জাতীয়তাবাদী চীন, কানাডা প্রভৃতি দেশকে নিয়ে গঠিত সামরিক জোট মিত্রপক্ষ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মোট ৫ কোটি লোক নিহত হয়। তাদের মধ্যে ১ কোটি ৯০ লাখ ছিল সৈন্য। উত্তর আমেরিকা থেকে ইউরোপ এবং ইউরোপ থেকে এশিয়া গোটা পৃথিবীটাই ছিল একটা যুদ্ধক্ষেত্র। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯৪৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। জার্মানীর পোল্যান্ড দখলের ঘটনা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়। জার্মানীর একনায়ক এডলফ হিটলারকে এ যুদ্ধের জন্য দায়ী করা হয়। কিন্তু এ দু'টি দাবির কোনোটাই সত্যি নয়।

১৯৩০'র দশকে জার্মানীর অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লাভাকিয়া, জাপানের মাঞ্চুরিয়া এবং ইতালীর আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) দখল ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ। তবে দীর্ঘস্থায়ী কারণগুলোর মধ্যে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তি ছিল মূল। ভার্সাই চুক্তির একটি অনুচ্ছেদের আওতায় গঠিত তৎকালীন জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা এবং জার্মানীর উপর প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের অশুভ আকাঙ্ক্ষাও ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য হিটলারকে দায়ী করার আগে দায়ী করতে হবে জার্মানীর তৎকালীন পরিস্থিতিকে। এ পরিস্থিতিতে হিটলার ছাড়া অন্য কারো উত্থান ঘটতে পারতো। সেক্ষেত্রে ফলাফল দাঁড়াতো একই।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিজয়ী শক্তিগুলো ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের অদূরে ভার্সাই নামে একটি বিশাল প্রাসাদে জার্মানীকে ভাগাভাগি করে নেয়ার একটি চুক্তি করে। পরাজিত জার্মানীকে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর দানে বাধ্য করা হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লিমেন্সু ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রু উইলসন। এ তিন বিশ্ব নেতা জার্মানীকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে রাখার স্বার্থে ভির্সাই চুক্তিতে কতগুলো হীন শর্ত জুড়ে দেন। ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানীর বিরুদ্ধে যেসব অবমাননাকর শর্ত জুড়ে দেয়া হয়

সেগুলো হচ্ছে (১) জার্মানীর সৈন্য সংখ্যা ১ লাখের বেশী হবে না এবং (২) বিমান, সামমেরিন ও ট্যাংক থাকবে না। (৩) ৬টি থাকবে ক্রুজার এবং ১২টি থাকবে ডেস্ট্রয়ার। তবে যুদ্ধজাহাজের ওজন ১০ হাজার টনের বেশী হবে না। (৪) কোনো জেনারেল স্টাফ থাকবে না এবং নতুন করে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করা যাবে না। ভার্সাই চুক্তিতে আরো বলা হয় (ক) জার্মানীর আলসেস লোরেণের নিয়ন্ত্রণ থাকবে ফ্রান্সের হাতে (খ) ইউপেন ও মালমেডি নিয়ন্ত্রণ করবে বেলজিয়াম (গ) উত্তর সুইজউইগ নিয়ন্ত্রণ করবে ডেনমার্ক (ঘ) হাল্টসিন ও সুদেতানল্যান্ড থাকবে চেকোশ্লাভাকিয়ার হাতে (ঙ) পশ্চিম প্রুশিয়া, পোজেন ও আপার সাইলেশিয়া থাকবে পোল্যান্ডের হাতে।

সার, মামেল ও ডানজিগকে তৎকালীন জাতিপুঞ্জের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। জার্মানীর বিদেশী উপনিবেশগুলোর নিয়ন্ত্রণও জাতিপুঞ্জের কাছে অর্পণ করা হয়। ব্রেস্ট-লিটোভস্ক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রাশিয়া যে ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়েছিল তাও তাকে পুনরায় ফেরত দিতে বলা হয়। ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানীর কাছ থেকে মোট ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ ভূমি কেড়ে নেয়া হয়। এ ভূমির পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার বর্গমাইল।

জার্মানী ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষর দানে অনেক আপত্তি করেছিল। কিন্তু তার আপত্তি অগ্রাহ্য করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের দায় দায়িত্ব দেশটির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। ৩২ কোটি মার্ক ক্ষতিপূরণ প্রদানে দেশটিকে বাধ্য করা হয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে জার্মানী দেউলিয়া হয়ে যায়। ১৯২১ সালে ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি ২৫ কোটি ডলার পরিশোধ করায় জার্মান অর্থনীতিতে ধস নামে। ফলে জার্মান সরকার পরবর্তী কিস্তি পরিশোধে অক্ষমতা প্রকাশ করে। জার্মানীর এ অক্ষমতার প্রতিশোধ গ্রহণে সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স দেশটির অসামরিক অঞ্চল সার দখল করে নেয় এবং সেখানে সামরিক আইন জারি করে। প্রথম মহাযুদ্ধের শাস্তি ভোগ করতে গিয়ে প্রতি তিনজন জার্মানের একজন বেকার হয়ে পড়ে। চারদিকে ক্ষোভ, হতাশা। ভার্সাই চুক্তি ছিল জার্মানদের কাছে অসহ্য। ওয়েমার সরকারের প্রতি জনগণের ক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। দ্রুত এ সরকারের পতন ঘটে। হিটলার তার জাতির অন্তরের বেদনা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাদেরকে ভার্সাই চুক্তির অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়ার আশার বাণী শোনান। জার্মানরা তাকে আস্থায় নেয়। ১৯৩৩ সালে তিনি ক্ষমতায় আসেন। ১৯৩৬ সালে প্রথমেই তিনি ফ্রান্সের কবল থেকে উর্বরা সার অঞ্চল পুনর্দখল করেন। পরে ১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়ার অংশবিশেষ এবং চেকোশ্লাভাকিয়া কেড়ে নেন।

১৯১৪ সালের ২৮ জুন সারায়েভোতে অস্ট্রীয় যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ আততায়ী গাভরিলো প্রিন্সিপের গুলীতে নিহত হলে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হয়। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ হত্যাকাণ্ড ছিল প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের বারুদ ঘরে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। এ যুদ্ধের দাবানলে গোটা ইউরোপ তছনছ হয়ে যায়। শিল্প-কারখানা ধ্বংস হয়। ইউরোপ ঋণী হয়ে পড়ে। আমেরিকা ছাড়া কারো পক্ষে ঋণ দেয়া সম্ভব ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলোকে প্রদত্ত মার্কিন ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ বিলিয়ন ডলার। অথচ যুদ্ধের আগে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ৪ বিলিয়ন।

প্রথম মহাযুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই দেখা দেয় মহামন্দা। ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর নিউইয়র্ক স্টক মার্কেটে ধস নামা থেকে মহামন্দা শুরু হয়। আমেরিকার ৫ হাজার ও অন্যান্য দেশের আরো বহু ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়। জাপান প্রচুর রেশম উৎপাদন করতো। এ রেশমের ৯০ শতাংশ রপ্তানি করা হতো যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু মহামন্দা দেখা দেয়ায় রেশমের এ বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন একটি নয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে। দেশে দেশে যুদ্ধ ও সংঘাত বেধে যাওয়ায় অস্ত্র শিল্পের প্রসার ঘটে। মুনাফালোভীরা সামরিক শিল্পে ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ করে। সমরাস্ত্র ক্রয় ও উৎপাদন সহজলভ্য হওয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়। অস্ত্র উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও জার্মানী নিশ্চেষ্ট ছিল না। গোপনে গোপনে চলতে থাকে সমরাস্ত্র উৎপাদন। অস্ত্র তৈরিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েই দেশটি তার অধিকার ফিরে পাওয়ার প্রতি মনযোগী হয়। প্রথমেই সে দৃষ্টিপাত করে ডানজিগের প্রতি।

ডিনজিগ ছিল একটি ঐতিহাসিক নগরী। ভিশ্চুলা নদীর মোহনায় অবস্থিত এ নগরীর অর্থনৈতিক মূল্য ছিল প্রচুর। ইউরোপে এ শহরের খ্যাতি ছিল প্রায় হাজার বছর। ১৩০৮ সাল থেকে এ শহর টিউটনিক যোদ্ধাদের উপনিবেশে পরিণত হয়। টিউটনিক যোদ্ধাদের পতনের পর এ শহর পোল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখনো ডানজিগের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় ছিল। ১৭৭২ সালে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া পোল্যান্ডকে ভাগাভাগি করে নেয়ার সময়ও স্বাধীন নগরী হিসেবে ডানজিগের মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল। ১৭৯৩ সালে দ্বিতীয় বার পোল্যান্ড ভাগাভাগি করার সময় ডানজিগ প্রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৯ সালে এ শহর পশ্চিম প্রুশিয়ার রাজধানী হিসেবে গণ্য হয়।

ভিশ্চুলা নদী নবগঠিত পোলিশ রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ হওয়ায় তার মোহনা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয় এবং ডানজিগকে আবার স্বাধীন নগরী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯২০ সালের শেষভাগ থেকে ডানজিগ নতুন জীবন পেতে শুরু করে। রাজনৈতিক দিক থেকে ডানজিগ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ডানজিগ ও পোল্যান্ডের ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত করা হয়। ডানজিগ ও পোল্যান্ড একই শুল্ক ব্যবস্থার অধীনস্থ হয়। ডানজিগ বন্দরে পোল্যান্ডের বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হয় এবং স্থির হয় যে, এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পোল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করবে। ডানজিগ নগর রাষ্ট্রের কাছে ছিল পোমেজে প্রদেশ বা পোলিশ করিডোর। অতীতেও এ অঞ্চলে পোলিশদের বসবাস ছিল। ১৪০ বছর জার্মানদের দমন নীতির আওতায় বসবাস করেও পোলগণ তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব ভাষা পরিত্যাগ করেনি।

১৯২০ সালে প্রথম ডানজিগে হাইকমিশনার আগমন করেন এবং পোল্যান্ড ও পোলিশ করিডোরের শাসনভার গ্রহণ করেন। ডানজিগে জার্মানদের সংখ্যা ছিল বেশী। তাই এ বন্দর নিরাপদ মনে না করে পোল্যান্ড করিডোরের শেষ মাথায় ডিনিয়া নামে একটি বন্দর স্থাপন করে। অল্পদিনের মধ্যেই বন্দরটি ইউরোপের অন্যতম প্রধান বন্দরে পরিণত হয়। এ কারণে বন্দরটি জার্মানীর চক্ষুশূলে পরিণত হয়। ডিনিয়া

স্থাপিত হওয়ায় ডানজিগ বন্দরের গুরুত্ব ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছিল। ডানজিগ ও করিডোরের ক্ষতি জার্মানীকে ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছিল। জার্মান জনগণ ও সরকার ভার্সাই চুক্তির এ অবমাননার বিরুদ্ধে অনবরত প্রতিবাদ করে যাচ্ছিল। ১৯৩৩ সালে হিটলার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর পোল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ১৯৩৪ সালের ২৬ জানুয়ারী তিনি পোল্যান্ডের সঙ্গে ১০ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি করেন। অন্যদিকে, ডানজিগবাসী জার্মানীর সঙ্গে একীভূত হতে জোর আন্দোলন চালাতে থাকে। একটি নাৎসীদল গঠিত হয়। এ দল সরকার গঠন করে একনায়কতন্ত্র কায়েম করে।

হিটলার পোল্যান্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হলেও করিডোর ও ডিনজিগ-বাসীরা জার্মানীর প্রতি দুর্বলতা ত্যাগ করতে পারেনি। আলবার্ট ফরস্টারের নেতৃত্বে ডানজিগের নাৎসী দল হাইকমিশনারকে অতিষ্ঠ করে তোলে। ডায়েটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হওয়ায় নাৎসীরা অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগ করতে থাকে। জার্মানীর তৃতীয় রাইখের সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্য জোর আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ পর্যায়ে গণতন্ত্রের সমর্থকদের যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। অনেককে গুলী করে হত্যা এবং বন্দী শিবিরে আটক করা হয়। ইহুদী বণিক ও ব্যাংকারদের সর্বস্বান্ত করে বিতাড়িত করা হয়।

১৯৩৭ সালে ডানজিগ স্বাধীন নগর রাষ্ট্রে পুরোপুরি নাৎসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮ সালের শুরুতেই ফস্টার ঘোষণা করেন যে, বার্লিন ডানজিগের বৈদেশিক নীতির ভার গ্রহণ করেছে। নাৎসী নেতা গলিটার আলবার্ট ফরস্টার ডানজিগের শান্তিপ্রিয় জার্মানদের হৃদয়েও পোলবিরোধী মনোভাব জাগ্রত করতে সক্ষম হন। পোলিশ কমিশনার ও কূটি রাজনীতিক এম চোডাকির চেষ্টায় বেশ কয়েক বার পোলবিরোধী আইন-কানুন প্রত্যাহার করা হয়। ডানজিগ সিনেটের প্রেসিডেন্ট হের গ্লীসারও কম যাননি। ১৯৩৬ সালে তিনি জেনেভায় জাতিপুঞ্জের বৈঠকে জোর গলায় বক্তৃতা দিয়ে ডানজিগে জাতিপুঞ্জের শাসনের অবসান কামনা করেন।

নাৎসীদের নৈরাজ্যের মুখে পোল্যান্ড অসহায় পড়ে। ১৯৩৮ সালে কয়েকটি আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে পোল্যান্ড ডানজিগে রাজনৈতিক অধিকার ত্যাগে সম্মত হয়। কিন্তু হেমন্তকালে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফরস্টার ঘোষণা করেন যে, অস্ট্রিয়া ও সুদেতানল্যান্ডের মতো ডানজিগের জার্মানগণও রাইখের সঙ্গে মিলিত হবে।

১৯৩৯ সালের শেষভাগে ঘোষণা করা হয়, পোলিশ বাহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষায় ডানজিগের পুলিশ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১,৫০০ থেকে ৪ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। জাহাজঘাট থেকে পোল শ্রমিকদের বিতাড়ন, শুল্ক বিভাগীয় পোল কর্মচারীদের উপর অত্যাচার এবং নাৎসী ঝটিকা সৈন্যদের গুলিতে একজন পোল কর্মচারী নিহত হলে পোল্যান্ডের সঙ্গে ডানজিগের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। যতই দিন যাচ্ছিল ততই ডানজিগের সঙ্গে পোল্যান্ডের মতবিরোধ তীব্র হচ্ছিল। পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, জার্মানগণ যদি ডানজিগকে রাইখের

সঙ্গে একীভূত করতে জিদ বজায় রাখে তাহলে পোল্যান্ড অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হবে এবং এ যুদ্ধ পোল্যান্ডের কাছে স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবেই বিবেচিত হবে।

জুলাই গত হয়ে আগস্ট এলো। কিন্তু কোনোরূপ শান্তি বা মীমাংসার চিহ্ন দেখা যায়নি। অতীতে হিটলার তার প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন আবার তিনি একই কৌশল অবলম্বন করতে উদ্যত হন। ফলে ইউরোপে সমরানল প্রজ্জলিত হওয়ার উপক্রম হয়। এ যুদ্ধ যাতে বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত না হয় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। হিটলার তথা নাৎসী জার্মানীর সাম্রাজ্য ক্ষুধা ইউরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলারের সৈন্যদল করিডোরে প্রবেশ করে এবং ঐদিন সকালেই নাৎসী নেতা ফরস্টার ডানজিগবাসীদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন, '২০ বছর ধরে তোমরা যে সুদিনের অপেক্ষায় ছিলে আজ সেদিন উপস্থিত হয়েছে। আজ থেকে ডানজিগ জার্মান রাইখে প্রত্যাবর্তন করলো।' এভাবে ডানজিগ জার্মানীর সঙ্গে একীভূত হয়।

১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউরোপে মহাসংকট দেখা দেয়। জার্মানী সদম্ভে ঘোষণা করে, 'রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় পোল্যান্ড বিনা বাধায় জার্মানীর দাবি পূরণে বাধ্য হবে। জার্মানী বিনা যুদ্ধেই ডানজিগ ও করিডোর ফিরে পাবে। পোল্যান্ড আক্রান্ত হলে বৃটেন ও ফ্রান্স কখনো জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার সাহস পাবে না।'

জার্মানীর এ আত্মবিশ্বাস ছিল ভুল। রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের দিনই বৃটেন তার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জার্মানীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জার্মানীতে নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার নেভিল হেন্ডার্সন বার্লিন থেকে বিমান যোগে বার্চটেসগাডেনে উপস্থিত হয়ে হিটলারকে বৃটিশ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। হিটলার স্যার নেভিলের হাতে জার্মানীর জবাব হস্তান্তর করেন। হিটলার স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দেন যে, বৃটিশ প্রতিশ্রুতির জন্য জার্মানীর পক্ষে তার গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেয়া সম্ভব নয়। এ সময় বৃটিশ লর্ড হ্যালিফ্যাক্স বেতার যোগে পৃথিবীর ইংরেজী ভাষাভাষী দেশগুলোর অবগতির জন্য প্রচার করেন যে, 'প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বৃটেনের স্বভাব বিরুদ্ধ।' লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের ঘোষণার পর বিশ্ববাসী বুঝতে পারলো, যুদ্ধ তাদের দ্বারপ্রান্তে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, মহামান্য পোপ ও বেলজিয়ামের রাজা শান্তির জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তাদের আবেদন উপেক্ষিত হয়। সমরায়োজন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জার্মান পত্র-পত্রিকাগুলো পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিষোদগারে মুখর হয়ে উঠে। বৃটেন তবুও আশা করতে লাগলো যে, প্রজ্ঞা ও যুক্তির জয় হবে। ১৯৩৯ সালের ২৪ আগস্ট কমন্স সভায় মিঃ চেম্বারলিন ঘোষণা করলেন, জার্মানীর কার্যকলাপে বৃটেনের স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে উঠছে। বৃটেন এখনো শান্তির আশা করছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব পালনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এদিকে, হিটলার ত্বরিত গতিতে বার্লিন ফিরে এসে ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ ও নাৎসী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ডানজিগের শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করে নাৎসী নেতা ফরস্টারকে ডানজিগ রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জার্মানীতে যেসব বৃটিশ প্রজা ছিল তাদেরকে ফিরে

আসার নির্দেশ দেয়া হয়। ফ্রান্স, পোল্যান্ড ও তুরস্কের রিজার্ভ সৈন্যদের যুদ্ধে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইতালীর একনায়ক মুসোলিনীর কাছে বার্তা প্রেরণ করে শান্তি স্থাপনের অনুরোধ জানান। ১৯৩৯ সালের ২৫ আগস্ট হিটলার বৃটেনের কাছে গোপন বার্তা পাঠান। বৃটেন হিটলারের বার্তা উপেক্ষা করে সমরায়োজন অব্যাহত রাখে। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এম দালাদিয়ের বেতার যোগে ইঙ্গ-ফরাসী ঐক্যের বাণী প্রচার করেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জার্মানী ও পোল্যান্ডের প্রতি অনুরোধ জানান। ইতিমধ্যে ডানজিগে জার্মান সৈন্য অবতরণ করে। জাপান ইউরোপীয় সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ১৯৩৯ সালের ২৬ আগস্ট বৃটিশ মন্ত্রিসভা হিটলারের বার্তা নিয়ে আলোচনা শুরু করে। জার্মানী নুরেমবার্গে নাৎসী দলের শান্তি কংগ্রেস বন্ধ করে দেয়। ডানজিগ বন্দরে জার্মানীর গ্লেসউইস নামে ক্রুজার এসে পৌছায়। পোল্যান্ড প্রত্যেক শহরে বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পরিখা খননের নির্দেশ দেয়। পোল্যান্ডের স্থানীয় সংগ্রামের পরিবর্তে জার্মানী যে ব্যাপক ইউরোপীয় সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে জার্মান জনগণ তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। পোল্যান্ড সীমান্তে অবিরাম সংঘর্ষ চলতে থাকে। ১৯৩৯ সালের ২৭ আগস্ট হিটলার ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়েরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাকে জানিয়ে দেন, 'ডানজিগ ও করিডোরের দাবি প্রত্যাহার করা অসম্ভব। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি ২০ লাখ লোকের মায়া ত্যাগ করতে পারে না।'

অন্যদিকে, বৃটিশ নৌ-বিভাগ বাণিজ্য জাহাজ নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করে। অনেক জাহাজ গতি পরিবর্তন করে ফিরে আসে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আবার শান্তির প্রস্তাব পাঠান। হিটলার তার শান্তি প্রস্তাবের কোনো জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তবে পোল্যান্ড আপোষের মনোভাব প্রকাশ করে। ইংল্যান্ডের গীর্জায় গীর্জায় শান্তির জন্য প্রার্থনা শুরু হয়। রাজা স্বয়ং ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবেতে প্রার্থনায় যোগদান করেন। ইউরোপে ১ কোটি সৈন্য যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়। ১৯৩৯ সালের ২৮ আগস্ট রাত ১০টা ২০ মিনিটে স্যার নেভিল হেন্ডার্সন বৃটিশ জবাবসহ বার্লিন চ্যান্সেলারিতে উপস্থিত হন। হিটলার মৌখিক জবাব দেন এবং সে রাতেই তা লন্ডন পাঠানো হয়।

বৃটিশ নৌ-বিভাগ ভূমধ্যসাগর ও বাল্টিক সাগরে বৃটিশ জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয়। একই সময়ে ফ্রান্স জার্মান সীমান্ত বন্ধ ঘোষণা করে। পোল্যান্ড সীমান্তের জেলাগুলো থেকে লোকজনকে স্থানান্তরিত করে। একইদিন রাতে জার্মান সৈন্যরা স্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করতে থাকে। স্লোভাক সরকার জার্মান সৈন্য প্রবেশে বাধা দানে অক্ষমতা প্রকাশ করে। ১৯৩৯ সালের ২৯ আগস্ট সন্ধ্যা সোয়া ৭ টায় বার্লিনে স্যার নেভিল হেন্ডার্সনের কাছে জার্মানীর জবাব হস্তান্তর করা হয়। জার্মানী বার্তায় পরদিন রাত ১২ টার আগে আলোচনা চালানোর পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে একজন পোল দূতকে বার্লিন পাঠানোর দাবি জানায়। এই উত্তর তার যোগে লন্ডনে পাঠানো হয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও লর্ড হ্যালিফ্যাক্স দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। জার্মানীকে জবাব দানের জন্য একটি খসড়া চিঠি তৈরি করা হয়। একইদিন মস্কো থেকে খবর আসে যে, সুপ্রীম সোভিয়েতে (পার্লামেন্ট) জার্মানীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুমোদিত হয়নি। সুপ্রীম সোভিয়েতের

অধিবেশন দু'দিনের জন্য মুলতবি করা হয়েছে। এদিনে জার্মানী সমগ্র স্লোভাকিয়া দখল করে নেয়।

১৯৩৯ সালের ৩০ আগস্ট রাত ২টায় বৃটিশ মন্ত্রিসভা এক তার বার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে দেয় যে, 'আজ আমাদের পক্ষে বার্লিনে প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।' উভয়পক্ষই যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জার্মানী পোল-স্লোভাক সীমান্তে ৪ লাখ সৈন্য মোতায়েন করে। পরে জার্মান সৈন্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। পোল্যান্ড শেষ রিজার্ভ সৈন্যসহ মোট ২৮ লাখ সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। মধ্য রাতে বৃটিশ দূত বৃটিশ জবাব নিয়ে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে হাজির হন। বৃটিশ জবাব পাঠ করে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেন্ট্রপ রাগে কাঁপতে লাগলেন। এসময় তিনি বৃটিশ দূতকে একটি দলিল পড়ে শোনান। দলিল পাঠ করে তিনি বললেন, এখন আর আলোচনা করার সময় নেই। পোল দূতের আসার সময় পেরিয়ে গেছে। পোলরা কিন্তু জার্মানদের দাবি-দাওয়া কিছুই জানতে পারেনি।

১৯৩৯ সালের ৩১ আগস্ট বৃহস্পতিবার মস্কোতে সুপ্রীম সোভিয়েত রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি অনুমোদন করে। ঐ দিনই বেতার যোগে জার্মানী পোল্যান্ডের কাছে ১৬ দফা দাবি উত্থাপন করে। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ডানজিগ ফেরত দান এবং গণভোটের মাধ্যমে সেখানে নাৎসীবাদ কায়েম।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানী প্রথম পোল্যান্ডের কাটোবিস, ক্রাকাউ ও টেস্কেন শহরের উপর তীব্র আগুনে বোমা নিক্ষেপ করে। পোল্যান্ডে জার্মানী বোমাবর্ষণ করায় লন্ডন শহরে শিশুদের অপসারণ শুরু হয়। বেলা ৭ টা ৩৫ মিনিটে ফরস্টার ডানজিগ রাইখের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেন। বেলা ৮ টায় পোল্যান্ডে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হয়। করিডোরের উভয় দিক এবং পূর্ব প্রুশিয়া থেকে আক্রমণ চলতে থাকে। জার্মান বোমারু বিমানগুলো ডিনিয়া বন্দরের উপরও বোমাবর্ষণ করে।

বেলা ৯ টায় লন্ডনে যুদ্ধের সংবাদ প্রচারিত হয়। সন্ধ্যা ৬ টায় কমন্স সভার অধিবেশন ডাকা হয়। প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন শেষবারের মতো জার্মানীকে সতর্ক করে দেন। হিটলারকে লক্ষ্য করে বলা হয়, অবিলম্বে পোল্যান্ড থেকে জার্মান সৈন্য প্রত্যাহার করা না হলে বৃটেন পোল্যান্ডকে দেয়া তার প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য হবে। ২ সেপ্টেম্বর বৃটেনের অধিবাসীগণ ঘুম থেকে জেগেই শুনতে পায় যে, হিটলার কোনো জবাব দেননি। তাদের ধারণা ছিল হিটলারকে জবাব দানের জন্য কোনো সময় বেঁধে দেয়া হয়নি বলে তিনি বিলম্ব করছেন।

পোল্যান্ডে ভীষণ লড়াই শুরু হয়। অনেক উন্মুক্ত শহরেও বোমা পড়তে লাগলো। সন্ধ্যায় কমন্স সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। আর্থার গ্রীনউড সরকারের দীর্ঘসূত্রতার কঠোর নিন্দা করে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। ৩ সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার জার্মানীর কাছে চরমপত্র প্রেরণ করে জানিয়ে দেয় যে, বেলা ১১টার মধ্যে উত্তর না এলে বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। জার্মানী বৃটেনের এ চরমপত্রের কোনো জবাব দেয়নি। বেলা ১১টা ১০মিনিটে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন বেতার যোগে ঘোষণা করেন যে,

জার্মানীর সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং যুদ্ধে পশু শক্তির বিরুদ্ধে ন্যায়নীতি জয়লাভ করবে। বিকেল ৬ টায় মহামান্য রাজা সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের কাছে যুদ্ধের সংবাদ প্রেরণ করেন। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ৯ জন সচিবকে নিয়ে একটি সমর পরিষদ গঠন করা হয়। মিঃ চার্চিল নৌ সচিব হিসেবে সমর পরিষদে যোগদান করেন। মিঃ এন্থনি ইডেন ডোমিনিয়ন সচিব নিযুক্ত হন। জার্মানীর বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ ঘোষণা করা হয়। বৃটিশ জাহাজে নিষিদ্ধ পণ্য বহন করা হচ্ছে কিনা তা তল্লাশি করে দেখার নির্দেশ দেয়া হয়। বিকেল ৫ টায় ফ্রান্সের দেয়া চরমপত্রের মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়ে যায় এবং ফ্রান্সও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধ পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করার জন্য হিটলার পূর্ব সীমান্তে যান। লন্ডন শহরের সকল সিনেমা ও থিয়েটার বন্ধ করে দেয়া হয়। স্থায়ীভাবে নিস্প্রদীপ মহড়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের যে আগুন নিভে গিয়েছিল আবার সে আগুন জ্বলে উঠে। শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

রুশ-জার্মান গোপন চুক্তি

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি নিয়ে আলোচনা করার আগে মিউনিখ সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা, এ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তির জবাবে রুশ-জার্মান সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মিউনিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। দূরদর্শী স্টালিন বুঝতে পারেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলারকে লেলিয়ে দেয়াই এ চুক্তির উদ্দেশ্য। তাই তিনি একই তাস নিয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানীর মিউনিখ শহরে সোভিয়েত কমিউনিজমের ভীতি মোকাবিলার উপায় নিয়ে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালী একটি সম্মেলনে মিলিত হয়। এ সম্মেলনে জার্মানীর দাবির কাছে এসব দেশ নতি স্বীকার করে। জার্মানী, ইতালী, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স মিউনিখ প্যাক্টে সই করে। মিউনিখ প্যাক্ট ছিল একটি সোভিয়েত বিরোধী আঁতাত। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার নেভিল চেম্বারলিন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়েরকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও স্টালিনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

মিউনিখ চুক্তির উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিতে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শগত শত্রু জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। নাৎসী-সোভিয়েত গোপন চুক্তি পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করে। তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এ চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট দু'টি দেশের স্বার্থের ভিত্তিতে ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড ও রুমানিয়াকে বিভক্ত করার একটি গোপন প্রটোকল অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৪টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এ প্রটোকলের শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, উভয় পক্ষ এ প্রটোকলকে অত্যন্ত গোপনীয় দলিল হিসেবে বিবেচনা করবে। ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট মস্কোয় সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাচেস্লাভ মলোটভ ও জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোয়াসিম ভন রিবেন্ট্রপ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্বয়ং স্টালিনও উপস্থিত ছিলেন। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিকে মলোটভ-রিবেন্ট্রপ চুক্তি হিসেবেও আখ্যায়িত করা হতো। ১৯৪১ সালের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়নে জার্মান হামলা নাগাদ এ চুক্তি বলবৎ ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে অনাক্রমণ চুক্তি বলে পরিচিত এটি একটি আগ্রাসী সামরিক চুক্তিতে পরিণত হয়। চুক্তিতে যেসব দেশের নাম উল্লেখ করা হয় সেসব দেশে হয়তো উভয়েই আগ্রাসন চালিয়েছে নয়তো এককভাবে রাশিয়া কিংবা জার্মানী। এক্ষেত্রে ফিনল্যান্ড ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে

সোভিয়েত ইউনিয়ন দু'বার ফিনল্যান্ডে হামলা চালায়। কিন্তু দেশটি সাফল্যের সঙ্গে সোভিয়েত হামলা মোকাবিলা করে। তবে তাকে কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হয়।

১৯১৮ সালে ব্রেস্ট-লিটোভস্ক (১৯১৮ সালের ৩ মার্চ ব্রেস্ট-লিটোভস্ক নামে একটি স্থানে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি) চুক্তির আওতায় নয়া বলশেভিক দুর্বল রাশিয়াকে সেন্টাল পাওয়ার্সের (প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইকারী জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, অটোমান সাম্রাজ্য ও বুলগেরিয়া। এসব দেশ পূর্বদিকে রাশিয়া এবং পশ্চিমে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী ছিল এদেরকে সেন্ট্রাল পাওয়ার্স বলা হতো) কাছে নতি স্বীকারে ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড, বাইলোরাশিয়া ও ইউক্রেনের (আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ার অংশবিশেষসহ) উপর প্রভাব বিস্তার ও সার্বভৌমত্বের দাবি পরিত্যাগ করতে হয়। মিটেলিউরোপা নীতি (জার্মান শব্দ। প্রথম মহাযুদ্ধে সেন্ট্রাল পাওয়ার্সের অনুসৃত নীতি) অনুসারে এসব দেশ জার্মান সাম্রাজ্যের স্যাটেলাইট বা অধীনস্ত রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত হয়। এসব স্যাটেলাইট রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে জার্মান কাইজারের অধীনে ডিউক অথবা রাজা হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পটভূমিতে এসব দেশের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। তবে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবে দেশগুলো বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রক্সি হিসেবে কাজ করে। বাইলোরাশিয়া ও ইউক্রেন ছাড়া বাদবাকি দেশ পুরোপুরি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২০-এর দশকে রাশিয়া ও কমিউনিজমের ভয়ে তথাকথিত বোর্ডার স্টেটসগুলো (রুশ বিপ্লবকালে যেসব দেশ রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন- ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড, বাইলোরাশিয়া, ইউক্রেন ও রুমানিয়া) নিজেদের মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তির পেছনে ১৯২০-এর দশকে ইউরোপে বিরাজিত এ পরিস্থিতির প্রভাবও কাজ করে। ইউরোপে স্থিতাবস্থা ছিল সোভিয়েত স্বার্থের পরিপন্থী। তাই দেশটি স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল না। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ এ অভিমত পোষণ করতেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে সংঘাত শুধু সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল নয়, বরং এ সংঘাত কমিউনিজম বিস্তারেও সহায়ক হবে। পরবর্তীকালে পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সোভিয়েতদের হিসাব সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

১৯৩৫ সালে চেকোশ্লাভাকিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফ্রান্সও ছিল চুক্তির একটি অংশীদার। চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে, সম্ভাব্য জার্মান হামলায় ফ্রান্স এগিয়ে এলে সোভিয়েত ইউনিয়নও সামরিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসবে। ১৯৩৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়ায় জার্মান অভিযানকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তির বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী দেশটিকে সহায়তা করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু চেকোশ্লাভাকিয়ার এ্যাগ্রেরিয়ান পার্টি সোভিয়েত সৈন্য প্রেরণের প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে

থাকে। দলটি এ হুমকিও দেয় যে, সোভিয়েত সৈন্যরা চেকোশ্লাভাকিয়া সীমান্ত অতিক্রম করলে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। ১৯২৪ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার আরেকটি পৃথক চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু ফরাসীরা দু'টি চুক্তির কোনোটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ১৯৩৫ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অর্থহীন।

মস্কোয় রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোয়াকিম ভন রিবেন্ট্রপ। পাশে সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন

১৯৩৪ সালে পোল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানীর একটি অনাগ্রাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৯ সালের মার্চে এ চুক্তি বাতিলে হিটলারের ঘোষণাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর আগ্রাসী মনোভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবে বিবেচনা করে। ১৯৩৯ সালের এপ্রিলে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনভ সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্সের সমন্বয়ে জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের অঙ্গীকার সম্বলিত একটি জোট গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং পোল্যান্ডের মধ্য দিয়ে সৈন্য প্রেরণের অধিকার দাবি করায় বৃটিশ সরকার এ প্রস্তাবে সম্মতি দানে দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নেয়। এদিকে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন ১৯৩৯ সালের ২৪ মার্চ পোল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দেন। ফ্রান্সও একই নিশ্চয়তা দেয়। ২৫ এপ্রিল তিনি পোল্যান্ডের সঙ্গে প্যাক্ট অব মিউচুয়াল এসিস্ট্যান্স-এ সই করেন। বৃটেন ও পোল্যান্ড চুক্তি স্বাক্ষর করায় স্টালিনের মন থেকে এ আশংকা দূর হয়ে যায় যে, হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাশ্চাত্য তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করবে। তবে তিনি এ সম্ভাবনাও দেখতে পেলেন যে, জার্মানী ও

পাশ্চাত্যের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারবে এবং একে অপরকে ধ্বংস করা নাগাদ তিনি অপেক্ষা করতে পারবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও বৃটেনের সমন্বয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে একটি জোট গঠনের আলোচনা পারস্পরিক অবিশ্বাসে স্থবির হয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর সম্ভাব্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমর্থনের নিশ্চয়তা দাবি করে এবং পশ্চিম সীমান্ত বরাবর দেশগুলোতে আক্রমণকারী শক্তির অনুকূলে বিদ্যমান নীতির পরিবর্তনের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার অধিকারের স্বীকৃতি চায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের এ দাবিতে বৃটিশ ও ফরাসীরা শংকিত হয়ে উঠে। তারা বুঝতে পারে যে, বৈদেশিক হামলার ঝুঁকি না থাকলেও এ গ্যারান্টি প্রদান করা হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিবেশী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবে।

জার্মানী পোল্যান্ডের কাছে ভূখণ্ডগত ছাড় দাবি করলে যুদ্ধের হুমকি বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ সালে এপ্রিলের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে টেলিগ্রাম বার্তা বিনিময় হতে থাকা সত্ত্বেও ১১ আগস্ট নাগাদ পাশ্চাত্যের সামরিক মিশন মস্কো এসে পৌছায়নি। পাশ্চাত্যের সামরিক মিশন মস্কো এসে পৌছলেও কোনো চুক্তি করার কর্তৃত্ব তাদের ছিল না। পোল্যান্ড সংকট ছিল খুবই জটিল। সোভিয়েত সরকার বিতর্কিত ভূখণ্ড ক্রেসি গ্রাস করতে চায় বলে পোলিশ সরকার আশংকা করতে থাকে। ১৯২০-এর দশকে পোলিশ-সোভিয়েত যুদ্ধে এ ভূখণ্ড পোল্যান্ডের সঙ্গে একীভূত করা হয়। পোলিশ সরকার সোভিয়েত সৈন্যদের তার ভূখণ্ডে প্রবেশ এবং জার্মানীর সঙ্গে অনিবার্য যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানায়। পোলিশ সরকারের এ মনোভাবের প্রেক্ষিতে রেড আর্মির জন্য পোল্যান্ড দখল করা ছাড়া জার্মানীকে মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও মতবিরোধে আলোচনা ভেঙ্গে যায়। ক্রেমলিন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলো তাদেরকে এমন এক পরিস্থিতিতে ঠেলে দিচ্ছে যেখানে যুদ্ধ কেবল জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরে সোভিয়েত অবস্থানের সমর্থকরা বলছেন যে, ১৯৩৮সালের সেপ্টেম্বরে মিউনিখ চুক্তির পর সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। তারা উল্লেখ করেন, মিউনিখ চুক্তিতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পশ্চিমা শক্তিগুলো অক্ষশক্তিকে তুষ্ট করার নীতি অনুসরণ করছে এবং তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে নাৎসী বিরোধী জোট গঠনে আগ্রহী নয়। তাছাড়া এ উদ্বেগও দেখা দেয় যে, জার্মানী হামলার সূচনা করলে বৃটেন ও ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকবে এই আশা নিয়ে যাতে বিবদমান রাষ্ট্র দু'টি একে অপরের শক্তি ক্ষয় করে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নাৎসী জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই ধ্বংস হয়।

স্টালিন বিশ্বাস করতেন, বৃটিশরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে এবং পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলো চাচ্ছে জার্মানী কমিউনিস্ট

রাশিয়ায় হামলা করুক এবং তাদের হামলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হয়ে যাক। অথবা দু'টি দেশ একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে ধ্বংস হোক। তিনি মনে করতেন, এ দুরভিসন্ধি থাকায় বৃটিশরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে প্রস্তাবিত নাৎসী বিরোধী জোটে শামিল হচ্ছে না। স্টালিনের জীবনীকাররা বলছেন, মিউনিখ চুক্তি উপলক্ষে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন ও এডলফ হিটলার বৈঠকে মিলিত হলে স্টালিনের অবিশ্বাস আরো জোরালো হয়।

সোভিয়েত অবস্থানের সমর্থকরা উল্লেখ করছেন যে, ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো অবস্থায় না থাকায় সময় ক্ষেপণে জার্মানীর সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরে রাজি হয়। তারা বলছেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমপক্ষে ৩ বছরের প্রয়োজন ছিল। স্টালিনের সমালোচকদের অভিমতের সঙ্গে তাদের অভিমতের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। স্টালিনের সমালোচকরা বলছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না থাকার কারণ ছিল ১৯৩৬-৩৮সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও সশস্ত্র বাহিনীতে স্টালিনের ব্যাপক শুদ্ধি অভিযান। শুদ্ধি অভিযানকালে সশস্ত্র বাহিনীর অধিকাংশ দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের নির্মূল করা হয়। এটা সুবিদিত সত্যি কথা যে, বিদেশী ও সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থার উপর্যুপরি আগাম হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মান সৈন্যরা সোভিয়েত ইউনিয়নে হামলা চালানোর সময় রেড আর্মি এ ধরনের একটি যুদ্ধের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

জার্মানীর ক্রমবর্ধমান সামরিক হুমকি মোকাবিলায় স্টালিনের সদিচ্ছা নিয়ে সমালোচকরা প্রশ্ন তুলছেন। তারা বলছেন, ১৯৩৬ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সামরিক সহযোগিতা গড়ে তুলেছিল। জার্মান হামলা শুরু হওয়া নাগাদ এ সহযোগিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করলে সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতা জার্মানীকে মিত্রবাহিনীর নৌ-অবরোধ বিকল করে দিতে সহায়তা করেছে।

১৯৩৯ সালের ৩ মে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল জোসেফ স্টালিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে মলোটভকে মাক্সিম লিটভিনভের স্থলাভিষিক্ত করেন। ফলে জার্মানীর সঙ্গে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। লিটভিনভ ইতিপূর্বেকার নাৎসী বিরোধী জোট গঠনের নীতির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং ক্রেমলিনের মানদণ্ডে তিনি পশ্চিমাপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে মলোটভ ঘোষণা করেন যে, তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে জার্মানীর সঙ্গে সকল ইস্যুর নিষ্পত্তিকে স্বাগত জানাবেন।

১৯৩৯ সালে আগস্টের শেষ দু'সপ্তাহে জাপান-সোভিয়েত সীমান্ত যুদ্ধ তুঙ্গে পৌছে। এ পর্যায়ে হিটলারের পরামর্শে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ ১৯ আগস্ট মস্কো সফর করেন। তার সফরকালে মস্কো ও বার্লিনের মধ্যে ৭ বছর মেয়াদী একটি অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বলা হয় যে, ২০ কোটি জার্মান মার্কের ঋণের বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীতে পেট্রোল, আকরিক লৌহ, খাদ্যশস্য, তুলা,

ফসফেট ও কাঠ রপ্তানি করবে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ নিজেদের ভৌগলিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে অতিরিক্ত একটি প্রটোকল স্বাক্ষরের প্রস্তাব দেন। অনেকেই বলছেন যে, মলোটভ অতিরিক্ত প্রটোকল স্বাক্ষরের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ১৯৩৯ সালের ১৯ আগস্ট স্টালিনের ভাষণে তার প্রতিফলন ঘটেছিল। সেদিন স্টালিন তার ভাষণে বলেছিলেন, বিশ্ব বিপ্লব প্রসারে পাশ্চাত্যের শক্তিগুলোর মধ্যে একটি মহাযুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

২৩ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর মধ্যে ১০ বছর মেয়াদী একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, কোনো পক্ষ কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলে আলাপ-আলোচনা অথবা মধ্যস্থতার মাধ্যমে তার নিরসন করা হবে। কোনো পক্ষ তৃতীয় কোনো শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে অন্য পক্ষ নিরপেক্ষ থাকবে। কেউ কোনো পক্ষের প্রতি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বৈরি অন্য কোনো গ্রুপের সদস্য হবে না। চুক্তির গোপন অনুচ্ছেদে বলা হয়, উত্তরাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় ইউরোপের দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর মধ্যে নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী ভাগাভাগি করে নেয়া হবে। উত্তরাঞ্চলে ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া ও লাটভিয়া এবং নারেভ, ভিস্তুলা ও সান নদীর পূর্বাংশ দখল করবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমাংশ দখল করবে জার্মানী। পূর্ব প্রুশিয়ার নিকটবর্তী লিথুয়ানিয়া যাবে জার্মান নিয়ন্ত্রণে। চুক্তিতে রুমানিয়ার বেসারবিয়ার সোভিয়েত স্বার্থ এবং জার্মানীর অনাগ্রহ স্বীকার করে নেয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর মধ্যে ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট স্বাক্ষরিত চুক্তি ছাড়া আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তার একটি ছিল ২৮ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত সীমান্ত ও মৈত্রী চুক্তি এবং আরেকটি ছিল ১৯৪১ সালের ১০ জানুয়ারী স্বাক্ষরিত পৃথক অন্য একটি গোপন চুক্তি। ২৩ আগস্ট স্বাক্ষরিত রুশ-জার্মান গোপন চুক্তি কোনো পক্ষ কখনো প্রকাশ অথবা স্বীকার করেনি। তারপরেও ঘটনাক্রমে বিভিন্ন চ্যানেলে এ ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। জার্মান কূটনীতিক হ্যান্স ভন হ্যারওয়ার্থ ২৪ আগস্ট তার মার্কিন সহকর্মী চার্লস বোহলেনকে এ গোপন চুক্তি সম্পর্কে অবহিত করেন। তবে এ তথ্যটি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ভেস্তে যাবার আগেই থেমে যায়। চুক্তি স্বাক্ষরের পরদিন সোভিয়েত ও জার্মান পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত খবর ও প্রকাশ্য বিষয়বস্তু প্রকাশিত হলে ইউরোপ স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। শুরু থেকেই সন্দেহ করা হচ্ছিল যে, যতটুকু প্রকাশ করা হয়েছে চুক্তিটির সীমা তার চেয়ে অনেক বেশী। এস্তোনীয় জেনারেল স্টাফের একজন কমকর্তা ২৬ আগস্টের মধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এ চুক্তিতে সোভিয়েত ও জার্মান স্বার্থের অনুকূলে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোকে ভাগ করা হয়েছে এবং এস্তোনিয়াকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। লাটভিয়ার কূটনৈতিক সার্ভিসও চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরই বিষয়বস্তু জানতে পেরেছিল। অন্যদিকে, গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, জার্মানী লাটভিয়াকে রাশিয়ার কাছে অর্পণ করেছে।

কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করার শর্ত থাকা সত্ত্বেও স্টালিন ও মলোটভ মস্কোয় বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় এসব দেশকে চাপ প্রয়োগে বশ্যতা স্বীকারের কৌশল হিসেবে জার্মানীর সঙ্গে গোপন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়বস্তু ফাঁস করে

দেন। মস্কো আলোচনায় যেসব বাল্টিক নেতা অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে লিথুয়ানিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাউজাস আর্থিস ও লিথুয়ানীয় সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল স্টাসিস রাসটি কিস ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এ দু'জনসহ আরো সূত্র এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

সোভিয়েতরা বাল্টিক মন্ত্রীদের কাছে চুক্তির বিষয়বস্তু প্রকাশ করে আবার সে কথা জার্মানদেরও অবহিত করে। এতে জার্মানী চরম ক্ষুব্ধ হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ বাল্টিক নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠি পাঠিয়ে এ চুক্তির গুরুত্বকে উড়িয়ে দিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেন। তবে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর এ কেনাবেচার সংবাদ পাশ্চাত্য জানতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া নাগাদ তাদের কাছে বিষয়টি ছিল অজ্ঞাত। ১৯৪৬ সালে নুরেমবার্গ ট্রায়ালে এ চুক্তির বিষয়বস্তু প্রথম জানাজানি হয় এবং পরে তা বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮ সালের ১০ আগস্ট এস্তোনীয় দৈনিক রাহভা হা'ল-এ রুশ-জার্মান গোপন প্রটোকলের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়, মূল কপিটি বন-এ জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মোহাফেজখানায় রক্ষিত ছিল। তদানীন্তন সোভিয়েত বার্তা সংস্থা তাস'র প্রধান ভ্যালেন্তিন ফালিন মস্কোতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুনরুক্তি করে বলেন, এ প্রটোকলের মূল কপি কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মি. ফালিন সত্যি কথাই বলেছিলেন। যুদ্ধের পর দখলীকৃত জার্মান দলিলপত্র সংরক্ষণ ও ফটোকপি করার প্রকল্পে নিয়োজিত আমেরিকান পণ্ডিতগণও স্বীকার করেছেন যে, রাইখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দলিল-পত্রের অধিকাংশের মূল কপি পাওয়া যায়নি।

১৯৪৫ সালে মিত্রবাহিনীর ভয়াবহ বোমা হামলার মুখে জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মোহাফেজখানা বার্লিন থেকে বন-এ সরিয়ে ফেলা হয় এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দলিলের ফটো কপি করার নির্দেশ দেন। রাইখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান দোভাষী পল অটো স্মিট এ কাজ সম্পন্ন করেন। স্মিটের সহকারী কার্ল ভন লোয়েচ ফিল্মগুলো বাক্সে বোঝাই করে মাটিতে পুঁতে ফেলেন। এভাবে নাৎসীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল রক্ষা পায়। ১৯৪৫ সালে মে মাসের শেষদিকে ভন লোয়েচ বৃটিশ ডকুমেন্ট টীমের প্রধান লেঃ কর্নেল আর, সি, থমসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাছে ফিল্মগুলো হস্তান্তর করেন এবং তার হস্তান্তরিত দলিলপত্র দখলীকৃত জার্মান রেকর্ড প্রকল্পের অংশে পরিণত হয়। রিবেনট্রপের ফাইলের ভেতর ২৩ আগস্ট ও ২৮সেপ্টেম্বরের চুক্তি দু'টির ফিল্ম পাওয়া যায়। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এ গোপন চুক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। তবে সে বছর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য আলেক্সান্ডার নিকোলায়েভিচ ইয়াকোলেভ এ চুক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর ১৯৯২ সালে এ চুক্তির বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হলেও মূল কপি প্রকাশ করা হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাবার পর পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ রুশ-জার্মান গোপন চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনাকে পাশ্চাত্যের জালিয়াতি বলে দাবি করতেন। কিন্তু তাদের দাবি ছিল অসার। রুশ-জার্মান গোপন চুক্তির ফটো কপি যে জাল নয় তা প্রমাণ করা কঠিন নয়। ১৯৩৯-৪১ সালে রুশ-জার্মান পত্র বিনিময় এবং তখনকার বিদ্যমান পরিস্থিতিও প্রমাণ করে যে, তাদের মধ্যে অনুরূপ চুক্তি ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৩৯ সালের শরতে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বাল্টিক নেতৃবৃন্দের কাছে এ চুক্তির বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছিলেন। অন্যদিকে, চুক্তি স্বাক্ষরের বাস্তব লক্ষণ ফুটে উঠায় জার্মানরা তার সত্যতা অস্বীকার করতে পারেনি। ১৯৩৩-৪১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মান সরকারের আচরণেও এটা প্রমাণিত হয় যে, ভৌগলিক সুবিধা অনুযায়ী পূর্ব ইউরোপ ভাগাভাগি করার একটি গোপন চুক্তি তাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যদি ধরে নেয়া হয় যে, চুক্তির ফটো কপি জাল তাহলে এ চুক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশিত শত শত দলিলপত্রও জাল বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এসব দলিলের সত্যতা নিয়ে কেউ কোনোদিন সন্দেহ প্রকাশ করেনি। সহায়ক অসংখ্য দলিলে রুশ-জার্মান গোপন চুক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং পূর্ব ইউরোপ ভাগাভাগিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নাৎসী জার্মানীর মধ্যে যে একটি গোপন চুক্তি হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ থাকে না। চুক্তি হওয়ার রটনা মিথ্যা হয়ে থাকলে সোভিয়েত ইউনিয়নও সহজেই প্রমাণ করতে পারতো। কিন্তু দেশটি তার মোহাফেজখানায় কখনো কাউকে প্রবেশ করতে দেয়নি। এমনকি নিরপেক্ষ ও সত্যানুসন্ধানীদের নয়। এতেই বুঝা যায় যে, চুক্তির ফটো কপি জাল নয়। ১৯৮৮ সালে মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তির ৫০তম বার্ষিকীতে লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে এক বিশাল সমাবেশে সে দেশের খ্যাতনামা কবি জাস্টিকাস মারকিনকেভিকিয়াস উদাত্ত কণ্ঠে এ গোপন চুক্তির সত্যতা স্বীকার করেছিলেন।

স্টালিন এ ব্যাপারে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিলেন যে, চুক্তির এ গোপন ধারায় হিটলারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে অব্যাহতি দিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তার পরিণাম হচ্ছে যুদ্ধ। তাই তিনি প্রকাশ করেননি।

১৯৪০ সালের এপ্রিলে জার্মান সৈন্যরা ডেনমার্ক ও নরওয়ে এবং ১৯৪০সালের জুনে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু রুমানিয়ার বেসারাবিয়া ও বুকোভিনা দখল করে নিলে এ চুক্তির ধস শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট দু'টি পক্ষ চুক্তিতে বর্ণিত তাদের সীমা লংঘন করতে থাকে। ১৯৪৭ সালে স্টালিন স্বীকার করেন যে, হিটলার আগ্রহী হলে জার্মানীর সঙ্গে কাজ করে যেতে তার কোনো আপত্তি ছিল না। স্টালিনের এ উক্তি অযথার্থ ছিল না। কারণ বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করার চেয়ে জার্মানীর সঙ্গে সহযোগিতায় তিনি অধিক লাভবান হতেন। ঐতিহাসিক ই.এইচ. কার-এর মতে, স্টালিন বিশ্বাস করতেন, জার্মানরা এত বোকা নয় যে, তারা দু'টি ফ্রন্টে লড়াই করবে। পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে জার্মানরা লড়াই চালিয়ে গেলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট উপকার হতো বলে তিনি ধারণা করতেন। চুক্তি স্বাক্ষরের এক দশক আগে সোভিয়েতরা বিভিন্ন পন্থায় নাৎসীদের

বিরোধিতা এবং তাদের সঙ্গে লড়াই করছে। তবে এ বাস্তবতার গুরুত্বকে খাটো করে দেখানোর জন্য সোভিয়েত কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সোভিয়েত প্রচার মাধ্যমেও বহু প্রচারণা চালানো হয়। তবে তারা এব্যাপারে সচেতন ছিল যাতে তাদের প্রচারণা জার্মানপন্থী বলে বিবেচিত না হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তি অনাক্রমণ চুক্তি হলেও এটি আঁতাত গঠনের চুক্তি ছিল কিনা সে ব্যাপারে মলোটভের একটি উক্তির উল্লেখ করা হয়। জার্মানদের পুনরায় আশ্বস্ত করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর পর তিনি সাংবাদিকদের কাছে 'ফ্যাসিবাদ একটি উপভোগ্য বিষয়' (Facism is a matter of taste) বলে মন্তব্য করেছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের বিনিময়ে আশপাশের দেশগুলো দখল করে নিয়েছিল। এসব দেশ দখল জার্মান হামলাকালে তার বিপর্যয় রোধে কতটা সহায়ক হয়েছিল চুক্তির মূল্যায়নে তা একটি অমীমাংসিত বিষয়। সোভিয়েত সূত্র দাবি করছে যে, মস্কোর কয়েক কিলোমিটার দূরে জার্মান অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়া হয়। অতএব এ ধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত ভূখণ্ডের ভূমিকা ছিল গৌন। তবে অন্যারা বলছেন যে, পোল্যান্ড ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর মধ্যে বাফার রাষ্ট্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তি শুধু পশ্চিম ইউরোপ নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নে জার্মান হামলায়ও ছিল একটি পূর্বশর্ত।

১৯৩৯-৪১ সালে নাৎসী জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সহযোগিতাকালে একযোগে দু'টি ঘটনা ঘটে। একটি ছিল মিডল জোনে জার্মানীর সম্প্রসারণ এবং আরেকটি ছিল রুশ অগ্রযাত্রার সূচনা। তবে ১৯৪১সালে জার্মান অভিযান শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্বদিকে বহুদূরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পরে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপে চূড়ান্ত অগ্রযাত্রা শুরু করে। এতে দেশটি ১৯৩৯ সালে নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত গোপন চুক্তিতে প্রদত্ত সুবিধার চেয়ে বেশী লাভবান হয়।

চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র এক সপ্তাহ পর ১ সেপ্টেম্বর জার্মান হামলায় পোল্যান্ডের বিভক্তির পালা শুরু হয়। ১৭সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্বদিক থেকে হামলা শুরু করলে দেশটির চতুর্থ দফা বিভক্তি সম্পন্ন হয়। তথাকথিত কার্জন লাইনের পশ্চিমে সোভিয়েত ইউনিয়ন সংলগ্ন মলোটভ-রিবেনট্রপ লাইন নামে পরিচিত পোল্যান্ডের পূর্ব সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ধরনের একটি সীমান্ত নির্ধারণের প্রস্তাব দিলে পোল্যান্ড তা প্রত্যাখ্যান করে। মলোটভ-রিবেনট্রপ লাইনে প্রায় ৪০ লাখ পোলিশের বসবাস ছিল। তবে এখানে বসবাসকারী জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল ইউক্রেনীয়, রুশ ও বেসারাবীয়। একারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে 'মাদার রাশিয়া' হিসেবে আবির্ভূত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডগত দাবি হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া অথবা পোল্যান্ডের অনুরূপ ছিল না। তার দাবির পেছনে সাম্রাজ্যবাদী আকাংখাও কাজ করতো। এক বছর আগে ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে পোলরা জাতিগত ইস্যু উত্থাপন করে চেকোশ্লাভাকিয়ার কাছ থেকে টেশেন দখল করে

নেয়। রুশরা একইভাবে পোলিশ অধীনতা থেকে 'জ্ঞাতি ভাইদের মুক্ত করার' শ্লোগান দিতে থাকে। উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগে গণতান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীল, ফ্যাসিস্ট, অথবা কমিউনিস্ট যাই হোক না কেন, প্রতিটি সরকারের কাছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলে জাতিগত ইস্যু ছিল একটি সুবিধাজনক অজুহাত।

রুশ-জার্মান চুক্তি পাশ্চাত্যের সরকারগুলোর মধ্যে গভীর অস্বস্তির জন্ম দেয়। তারা চুক্তির পরিণাম নিয়ে শংকিত হয়ে উঠে। কমিউনিস্টদের মধ্যে আতংকের মাত্রা ছিল আরো বেশী। অধিকাংশ কমিউনিস্ট তাদের নাৎসী শত্রুদের সঙ্গে মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের এসব কার্যকলাপকে কমিউনিজমের আদর্শের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করতেন। ১৯৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর লন্ডনের ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড-এ কার্টুনিস্ট ডেভিড লোর একটি বিখ্যাত ব্যঙ্গ চিত্রে দেখানো হয় যে, হিটলার ও স্টালিন পোল্যান্ডের মৃতদেহের উপর একে অপরকে অভিবাদন করছেন। হিটলার মৃত পোল্যান্ডকে দেখিয়ে বলছেন,'এই দেখুন বিশ্বের আর্বজনা।' জবাবে স্টালিন বলেন, 'শ্রমিকদের নিকৃষ্ট আততায়ী।'

১৯৩৯ সালের ২৮সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্রকে প্যাক্ট অব ডিফেন্স এন্ড মিউচ্যুয়াল এসিস্ট্যান্স নামে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর দানের নির্দেশ দেয়। এ চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় সৈন্য মোতায়েনের সুযোগ দেয়। একইদিন একটি সম্পূরক জার্মান-সোভিয়েত প্রটোকলের আওতায় লিথুয়ানিয়ার অধিকাংশ এলাকা জার্মান নিয়ন্ত্রণ থেকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করা হয়। অনুরূপ দাবি প্রত্যাখ্যান করায় ৩০ নভেম্বর সোভিয়েত সৈন্যরা ফিনল্যান্ডে হামলা চালায়। 'উইন্টার ওয়ার'-এ ৩ মাস প্রচণ্ড যুদ্ধ ও ক্ষয়ক্ষতির পর সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশটির ১০ শতাংশ ভূখণ্ডের বিনিময়ে লড়াই বন্ধ করে।

১৯৪০ সালের ১৫-১৭ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্রে হামলা চালিয়ে সেগুলো একীভূত করে নেয়। একই সময়ে দেশটি রুমানিয়ার বেসারাবিয়া, বুকোভিনা ও হারৎজা অঞ্চলকে চরমপত্র দেয়। সোভিয়েতদের এ উদ্যোগে শংকিত হয়ে ২৫ জুন রিবেন্ট্রপ সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠানো তার জবাবে রুমানিয়ায় জার্মানীর গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের কথা উল্লেখ করেন। তিনি তার জবাবে এ নিশ্চয়তা দেন যে, রুমানিয়াকে রণাঙ্গনে পরিণত করা হবে না। তাছাড়া তিনি দাবি করেন, বেসারাবিয়ায় বসবাসকারী ১ লাখ সংখ্যালঘু জার্মানের বিশ্বাস ও ভবিষ্যত প্রশ্নে জার্মানী উদ্বিগ্ন।

সেপ্টেম্বরে রুশ-জার্মান জনসংখ্যা স্থানান্তর চুক্তির অংশ হিসেবে বেসারাবিয়া থেকে সংখ্যালঘু জার্মানদের অধিকাংশকে জার্মানীতে পুর্নবাসিত করা হয়। রুমানিয়ার উপর সোভিয়েত চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাকে রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না। ফ্রান্সের পতনে দেশটি আরো বেশী ঘাবড়ে যায়। অন্যদিকে, সোভিয়েত দাবি মেনে নেয়ার জন্য জার্মানী রুমানিয়াকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। অগত্যা ইতালীয় সরকারের পরামর্শে রুমানিয়া সোভিয়েত দাবির কাছে নতি স্বীকার করে। ১৯৪০সালের আগস্টে সোভিয়েত ভীতির মুখে দেশটি আরো ভূখণ্ড হারায়।

সোভিয়েত অধিকৃত ভূখণ্ডগুলো সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। অধিকৃত ভূখণ্ডের জনসংখ্যার ভেতর সোভিয়েত বিরোধী শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং নয়া সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়। এসব ভূখণ্ডের লাখ লাখ লোককে হত্যা কিংবা দূরপ্রাচ্য অথবা গুলাগ শ্রম শিবিরে পাঠানো হয়। সেখানে বহু লোকের মৃত্যু হয়। পরে দখলীকৃত ভূখণ্ডগুলো জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা লাইন হিসেবে কাজ করে।

১৯৪১ সালের গোড়ার দিকে লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ডের মাঝ বরাবর জার্মানী ও সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করা হয়। এ পর্যায়ে নাৎসী-সোভিয়েত সম্পর্ক আবার শীতল হতে থাকে। ওয়ারম্যাট (জার্মান সশস্ত্র বাহিনী) ও রেড আর্মির মধ্যে সংঘর্ষের লক্ষণ ফুটে উঠে। অধিকৃত পশ্চিম ইউরোপের জনগণের কাছে রুশ-জার্মান সংঘাত ছিল কাংখিত। ২০/২২ বছর আগে রাশিয়ায় সংঘটিত বলশেভিক বিপ্লবের প্রতি তাদের ঘৃণা ছিল তখনো তুঙ্গে। প্রাচ্যের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে হিটলার দেশ ও বিদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা আশা করেছিলেন এবং বৃটেনের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা চালান। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর বিরুদ্ধে হিটলারকে যুদ্ধের উস্কানি দিতো। এই উস্কানিতে তিনি পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধে পশ্চিম রণাঙ্গন খুলে বসেন। কিন্তু নিয়তির ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের নিষ্পত্তি হওয়ার আগে তার কৌশলগত মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলেন। একই সঙ্গে দু'টি রণাঙ্গনে লড়াই করতে গিয়ে অজেয় জার্মান সৈন্যরা হেরে যায়। সেই সঙ্গে ঘটে বিশ্ব ত্রাস হিটলারের পতন।

পোল্যান্ডে জার্মান ব্লিৎসক্রিগ

হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। পোল্যান্ড আক্রমণের প্রাক্কালে হিটলার বিশ্বাস করতেন, বৃটেন ও ফ্রান্স এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবে এবং তারা একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হবে। পোল্যান্ড আক্রমণে হিটলারের সিদ্ধান্ত ছিল জুয়াখেলার সমতুল্য। দু'টি কারণে তিনি বিশ্বাস করতেন সংক্ষিপ্ত সময়ে পোল্যান্ড অভিযান সফল হবে। এক, হিটলার মনে করতেন বিশ্বে প্রথমবার মোতায়েনকৃত সাঁজোয়া কোর ব্লিৎসক্রিগ গতিতে হামলা চালিয়ে পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীকে দ্রুত পরাজিত করতে সক্ষম হবে। দুই, তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড দালাদিয়েরকে দুর্বল মনে করতেন। তিনি আরো মনে করতেন বৃটিশ ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দোদুল্যমানতায় ভোগে যুদ্ধে নামার পরিবর্তে বরং শান্তি চুক্তি করবেন।

হিটলারের এ বিশ্বাসের পেছনে কারণও ছিল। তার চাপের মুখে বৃটেন ও ফ্রান্স ভার্সাই চুক্তি সংশোধনে রাজি হয়। এ দু'টি দেশ ১৯৩৫ সালে জার্মানীর পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার অধিকার মেনে নেয়। পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত হয়ে জার্মানী ১৯৩৬ সালে তার হৃত ভূখণ্ড রাইনল্যান্ড উদ্ধার করে এবং ১৯৩৮ সালের মার্চে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একীভূত হয়। রাইনল্যান্ড উদ্ধার এবং অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একীভূত হওয়া ছিল ভার্সাই চুক্তির লংঘন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি হয়। এ চুক্তিতে পরাজিত জার্মানীর উপর হীন শর্ত আরোপ করা হয়। হিটলারের মনোবল বৃদ্ধির পেছনে পাশ্চাত্যের অনুকূল জনমতও কাজ করেছিল। পাশ্চাত্যের জনগণ গণতন্ত্রের জন্য নাৎসীবাদ নয়, বরং কমিউনিজমকে হুমকি হিসেবে গণ্য করতো। শুধু তাই নয়, তারা ভার্সাই চুক্তিকেও ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করতো। এ প্রেক্ষাপটে অনেকে পুনরায় জার্মানীর অস্ত্রসজ্জিত হয়ে উঠায় আনন্দিত হয়। তারা মনে করতো কমিউনিস্ট সোভিয়েত হুমকির বিরুদ্ধে জার্মানী হচ্ছে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে মিউনিখে বৃটেন ও ফ্রান্স অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাতিগত সুদেতানল্যান্ডকে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে জার্মানীর কাছে বলপ্রয়োগে হস্তান্তরে সম্মতি দেয়। এ সময় হিটলার প্রবল সামরিক শক্তি ব্যবহার বিশেষ করে ব্যাপক বিমান হামলার হুমকি দিয়ে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন। ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিক গেইমস অনুষ্ঠান এবং ডিউক অব উইন্ডসর ও সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জের সফরের প্রেক্ষিতে হিটলার পাশ্চাত্যের পত্রপত্রিকা-গুলোর অনুকূল সমর্থন ভোগ করছিলেন।

১৯৩৯ সালের মার্চে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির অবসান ঘটে। পূর্ববর্তী সফলতায় উৎসাহী হয়ে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া দখলে জার্মান সৈন্যদের নির্দেশ দেন। তাছাড়া তিনি লিথুয়ানিয়ার কাছ থেকে মামেল প্রদেশ কেড়ে নেন এবং পূর্ব প্রুশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে যোগাযোগের উন্নয়নে পোল্যান্ড ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে নয়া সড়ক পথ ও রেলওয়ে লাইন নির্মাণে পোল্যান্ডের উপর চাপ প্রয়োগ করেন।

১৯১৯ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পোল্যান্ড গঠনের প্রয়োজনে রাশিয়া ও জার্মানীর সীমান্ত পুনর্গঠনকালে মিত্র শক্তি বাদবাকি জার্মানী থেকে পূর্ব প্রুশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ১৭৯৫ সালে রাশিয়ার জার ও প্রুশিয়া পোলিশ ভূখণ্ডকে ভাগাভাগি করে নিলে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পোল্যান্ড তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

পোল্যান্ডে জার্মান অভিযানে বিধ্বস্ত একটি পোলিশ জঙ্গিবিমান

চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করা ছিল ১৯৩৮ সালে মিউনিখে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিনের কাছে হস্তান্তরিত হিটলারের লিখিত গ্যারান্টির লংঘন। চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে হিটলার ঘোষণা করেন, ইউরোপে আর কোনো ভূখণ্ডের উপর তার দাবি নেই। তাই ১৯৩৯ সালের ৩১ মার্চ চেম্বারলিন পোল্যান্ড সীমান্তের আনুষ্ঠানিক গ্যারান্টি দাবি করে বলেন। তিনি আশা করেছিলেন, হিটলার তার দাবি পূরণ করবেন।

কিন্তু হিটলার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিনের দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে ১৯৩৯ সালের ৩ এপ্রিল জার্মান সৈন্যদের পোল্যান্ড আক্রমণের নির্দেশ দেন। পোল্যান্ড অভিযানের পূর্বাহ্নে ওয়ারম্যাট (জার্মান সেনাবাহিনী) একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না। অন্যদিকে, জার্মান অর্থনীতি ছিল শান্তিকালীন উৎপাদনের পর্যায়ে। এ কারণে জেনারেলগণ শংকিত হয়ে উঠেন। হিটলারের নেতৃত্বের প্রতি

অসন্তোষ দেখা দেয়। ক্ষুব্ধ সেনানায়কদের কেউ কেউ পোল্যান্ড আক্রমণে তার পরিকল্পনা বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছে ফাঁস করে দেয়।

জেনারেলগণ সতর্কতা বজায় রাখার পরামর্শ দেন এবং পশ্চিম দিক থেকে বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলায় 'ওয়েস্ট ওয়াল'-এর প্রতিরক্ষা জোরদারে আরো সময় চান। এ সময় জার্মান সেনাবাহিনীর একটি বিরাট অংশ পূর্ব রণাঙ্গনে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু হিটলার জেনারেলদের উদ্বেগ নাকচ করে দেন এবং তার সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য কামনা করেন। হিটলারের একমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল, পোল্যান্ডে আকস্মিক হামলায় স্টালিন শংকিত হয়ে উঠতে পারেন এবং এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। স্টালিন জার্মান হামলার আশংকা করতেন এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে নাৎসীবিরোধী একটি জোট গঠনে দীর্ঘদিন চেষ্টা চালান। কিন্তু ১৯৩৯ সালের জুলাই নাগাদ বৃটেন ও ফ্রান্স নাৎসীবিরোধী জোট গঠনে চুক্তির শর্তের ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। অন্যদিকে, পোল্যান্ডও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জোট গঠনের প্রস্তাব নাকচ করে দেয় এবং জার্মানীর সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের মোকাবিলায় পোলিশ ভূখণ্ডে লাল ফৌজ মোতায়েনের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। হিটলার এটাকে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তিনি তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোয়াসিম ভন রিবেনট্রপকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে গোপন আলোচনার জন্য মস্কো পাঠান। এর ফলে ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জাতীয় স্বার্থ এবং ১৯১৯ সালের পূর্ববর্তী সীমান্ত পুনরুদ্ধারে হিটলার ও স্টালিন পারস্পরিক বৈরিতা ভুলে যান।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জার্মান সৈন্যরা পোল্যান্ডে অভিযান চালায়। সেদিন ভোরে উইলান নামে একটি অরক্ষিত শহরে বিমান হামলার মাধ্যমে এ অভিযানের সূচনা করা হয়। এ বিমান হামলায় প্রায় ১২ শ' লোক নিহত হয়। ভোর ৪ টা ৪৭ মিনিটে জার্মান যুদ্ধজাহাজ শ্লেসউইস-হোলস্টেইন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম গোলাটি বর্ষণ করা হয়। যুদ্ধজাহাজ শ্লেসউইস পোল্যান্ডে এক কথিত শুভেচ্ছা সফরে ছিল। ডানজিগ বন্দরের পোতাশ্রয়ে যুদ্ধজাহাজটি নোঙ্গর ফেলে। ১ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে ৪ টায় এটি ডানজিগ বন্দরের পোতাশ্রয় থেকে ধীরে ধীরে একটি খালের ভেতর প্রবেশ করে এবং ওয়েস্টারপ্লেটের বিপরীত দিকে অবস্থান গ্রহণ করে। এ সময় 'ফায়ার' বলে গোলাবর্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়। পুরো ঘটনাটিই ছিল পরিকল্পিত। শ্লেসউইস পোলিশ সীমান্তের কাছে গ্লেইউইজের কাছে নিজেদের একটি রেডিও স্টেশনে গোলাবর্ষণ করে। পোলিশ সৈন্যরাই এ হামলা চালিয়েছে—এটা প্রমাণ করার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একদল জার্মান বন্দীকে পোলিশ সৈন্যদের ইউনিফর্ম পরিয়ে গুলী করে হত্যা করা হয় এবং তাদের লাশ ওই রেডিও স্টেশনের আশপাশে ফেলে রাখা হয়। তৎক্ষণাৎ পোলিশভাষী একজন জার্মান ঘোষক রেডিও থেকে ঘোষণা করে যে, এ রেডিও স্টেশনে পোল্যান্ডের গোলাবর্ষণে কয়েকজন জার্মান নিহত হয়েছে। এ সাজানো ঘটনার এক ঘন্টা পর জার্মান ইউনিট পোল্যান্ড সীমান্ত অতিক্রম করে।

পোলিশ নৌ-বাহিনীর একটি গোলাবারুদ মজুদ এবং ডানজিগে (বর্তমান গদানস্কে) ওয়েস্টারপ্লেট সেনা ছাউনিতে গোলাবর্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এটাই ছিল প্রথম লড়াই। ১ সেপ্টেম্বর সকাল ৮ টায় ফ্রান্স ও বৃটেনের কাছে পোল্যান্ড জরুরি সামরিক

সহায়তা কামনা করে। ৩ সেপ্টেম্বর বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে বৃটেনের আগে বিকেল ৫ টায়। বৃটেন কিছুটা বিলম্ব করছিল এ আশায় যে, হিটলার মিত্র পক্ষের দাবি মেনে নেবেন এবং যুদ্ধ বন্ধে রাজি হবেন।

পাশ্চাত্যের সামরিক কমান্ডারগণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণকৌশলের উপর পুরোপুরি নির্ভর করছিলেন এবং পোল্যান্ডে জার্মানীর ব্লিৎসক্রীগ (ঝটিকা গতিতে হামলা) অভিযানের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তারা ধারণা করছিলেন, পোলিশ প্রতিরক্ষা লাইনে কয়েক সপ্তাহ বোমাবর্ষণের পর জার্মানী পূর্ণাঙ্গ হামলা শুরু করবে। যে মুহূর্তে জার্মান পাঞ্জার পোল্যান্ডের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল তখন ফরাসী সৈন্যরা জার্মান ওয়েস্ট ওয়াল-এ ম্যাপিং ও স্কাউটিংয়ে ব্যস্ত ছিল। এ সময় তারা বৃটিশ এক্সপিডিশনারী ফোর্স (বিএফএফ) মোতায়েন এবং তাদের পূর্ণাঙ্গ সমাবেশের অপেক্ষায় ছিল। ফ্রান্স আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রতীক্ষা করায় কোনো আক্রমণাত্মক কৌশল প্রণয়ন করা হয়নি। আক্রমণাত্মক রণকৌশল না থাকায় ফরাসীরা ম্যাজিনো লাইনে শক্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে। অন্যদিকে, বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণের পরিবর্তে শান্তি স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে শুধু লীফলেট বর্ষণ করে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৯ সালের ২৬ আগস্ট জার্মানীর পোল্যান্ড অভিযানের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু হিটলারের মিত্র মুসোলিনী জানান যে, ইতালী যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত নয়। তাই তিনি ২৫ আগস্ট ভোর পৌনে ৫ টায় এ পরিকল্পনা স্থগিত করেন। পরে ইতালীর সমর্থন নিশ্চিত হলে ৩১ আগস্ট বিকেল ৪ টায় পোল্যান্ডে হামলার নির্দেশ দেয়া হয়। পোল্যান্ড অভিযানে ইতালী কোনো সামরিক সহায়তা দেয়নি। তবে দেশটির সমর্থনের রাজনৈতিক ও সামরিক মূল্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অভিযান শুরুর আগে হিটলার পোলিশ-জার্মান চুক্তিকে অন্তঃসারশূন্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পূর্ণাঙ্গ হামলা শুরু হওয়ার আগে পোল্যান্ড সীমান্তে জার্মানী অসংখ্য উস্কানিমূলক তৎপরতা চালায়। ৬২ টি জার্মান পাঞ্জার ডিভিশন পোল্যান্ড দখলে অংশ নেয়।

জেনারেল ওয়ালথার ভন ব্রাউসিটসের নেতৃত্বে ৫ টি আর্মি গ্রুপ (প্রতিটি আর্মি গ্রুপ গঠিত হতো অন্তত কয়েক লাখ সৈন্য নিয়ে) ও রিজার্ভ (চতুর্দশ পদাতিক, প্রথম পাঞ্জার ও দ্বিতীয় মাউন্টেন ডিভিশন) নিয়ে আক্রমণকারী বাহিনী গঠন করা হয়। জার্মানরা মোরাভিয়া ও স্লোভাকিয়ার মধ্যবর্তী সাইলেসিয়া, ওয়েস্টার্ন পোমেরানিয়া ও পূর্ব প্রুশিয়া -এ তিন দিক থেকে হামলা চালায়। কর্নেল জেনারেল গার্ড ভন রুনডেস্টাডের আর্মি গ্রুপ সাউথে ছিল জেনারেল ব্লাসকোভিজের অষ্টম, জেনারেল ভন রেইচেনাউয়ের দশম ও কর্নেল জেনারেল লিস্টের নেতৃত্বাধীন চতুর্দশ আর্মি। সব মিলিয়ে আর্মি গ্রুপ সাউথে ছিল অষ্টাদশ পদাতিক, চতুর্থ স্লোভাক পদাতিক, ফার্স্ট মাউন্টেন ডিভিশন, দ্বিতীয় যান্ত্রিক, চতুর্থ হাল্কা যান্ত্রিক ও চতুর্থ পাঞ্জার ডিভিশন। আর্মি গ্রুপ সাউথ মোরাভিয়া ও স্লোভাকিয়ার মধ্যবর্তী সাইলেসিয়ার মধ্য দিয়ে হামলা চালায়। এতে ছিল ২ হাজারের অধিক ট্যাংক ও ৮শ' সাঁজোয়া যান। কর্নেল জেনারেল ফেডার ভন বকের আর্মি গ্রুপ নর্থ (অষ্টম পদাতিক, দ্বিতীয় যান্ত্রিক ও প্রথম পাঞ্জার ডিভিশন) এর একটি অংশ এবং জেনারেল গুন্থার ভন ক্লাউসের নেতৃত্বাধীন চতুর্থ আর্মি পশ্চিম পোমেরানিয়ার

মধ্য দিয়ে হামলা চালায়। কর্নেল জেনারেল ফেডার ভন বকের নেতৃত্বাধীন আর্মি গ্রুপ নর্থ (একাদশ পদাতিক ও প্রথম পাঞ্জার) এর আরেকটি অংশ জেনারেল জর্জ ভন কুচলারের নেতৃত্বাধীন থার্ড আর্মির সঙ্গে সম্মিলিতভাবে পূর্ব প্রুশিয়ার মধ্য দিয়ে হামলা চালায়। আর্মি গ্রুপ নর্থে ছিল ৬ শ' ট্যাংক ও ২শ' সাঁজোয়া যান। পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ এবং ভিস্তুলা নদীর পশ্চিমে অবস্থানরত পোলিশ সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করাই ছিল এ ত্রিমুখী আক্রমণের লক্ষ্য। মোট ১৮ লাখ জার্মান সৈন্য, ৩ হাজার ১ শ'র বেশি ট্যাংক, ১০ হাজার কামান এবং লুফটওয়াফে (জার্মান বিমান বাহিনী)'র দু'টি বহরের ২ হাজার ৮৫ টি জঙ্গীবিমান এ অভিযানে অংশগ্রহণ করে। আক্রমণকারী বাহিনীতে আরো ছিল ক্রিগসসেরিনের প্রথম 'ওস্ট'(পূর্ব) গ্রুপ। এ গ্রুপ পোলিশ নৌ-বাহিনীকে মোকাবিলা করে এবং জার্মান স্থল বাহিনীকে সহায়তা দেয়। একযোগে তিনদিক থেকে পোল্যান্ড আক্রমণের সামর্থ্য থাকা ছিল আক্রমণকারী বাহিনীর জন্য একটি অতিরিক্ত সুবিধা। জার্মানদের ছিল একটি সুসংগঠিত গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। তাছাড়া পোল্যান্ডে বসবাসকারী সংখ্যালঘু জার্মানদের সহায়তার উপরও তারা নির্ভর করতে পারতো। জার্মানরা পোল্যান্ডের রেল লাইন ও সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট থাকায় সে দেশের রেল ও সড়ক যোগাযোগ সম্পর্কে তাদের চমৎকার ধারণা ছিল।

আক্রান্ত পোলিশ বাহিনীতে ছিল ৭ টি আর্মি গ্রুপ। এগুলো হলো জেনারেল ক্রুকুভিচ প্রেসড্রিমিরস্কির নেতৃত্বাধীন মোডলিন আর্মি, জেনারেল ব্রন্টোনোভিস্কির নেতৃত্বাধীন পোমোরজি আর্মি, জেনারেল কুটরেঝবার নেতৃত্বাধীন পোজন্যাম আর্মি, জেনারেল রোমেল ক্রাকোউয়ের নেতৃত্বাধীন লোডজ আর্মি, জেনারেল সাজিলিংয়ের নেতৃত্বাধীন ক্রাকোউ আর্মি, জেনারেল পিস্করের নেতৃত্বাধীন লুবলিন আর্মি ও জেনারেল ফাব্রিসির নেতৃত্বাধীন কারপাটি আর্মি। এছাড়া ছিল সিঙ্গেল অপারেশনাল গ্রুপ ও কয়েকটি রিজার্ভ গ্রুপ। পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন ফিল্ড মার্শাল স্মিগলি রীজ। পোলিশ সেনাবাহিনী অন্যান্য ইউনিটসহ ৩৯টি পদাতিক ডিভিশন, ১১ টি এলিট ক্যাভালরি ব্রিগেড, ৩টি মাউন্টেন ব্রিগেড ও ২টি সাঁজোয়া যান্ত্রিক ব্রিগেড মোতায়েন করে। আর্মি লোডজ, ক্রাকোউ ও কারপাটিতে ছিল ২৪১ টি ট্যাংক ও ৩২ টি সাঁজোয়া যান। আর্মি পোমোরজি ও পোজন্যাম, মোডলিন ও চতুর্থ অপারেশনাল গ্রুপে ছিল ২৩৪ টি ট্যাংক ও ৫২ টি সাঁজোয়া যান। রিজার্ভ বাহিনীতে ছিল ১৮৫ টি ট্যাংক।

যুদ্ধের জন্য পোলিশ সেনাবাহিনী ছিল অপ্রস্তুত। পোলরা ১৬ শ' কিলোমিটারব্যাপী অগ্রবর্তী ফ্রন্টে জার্মান হামলার জবাব দিচ্ছিল। তারা পাল্টা হামলা চালাতে এবং শিল্প কেন্দ্রগুলো রক্ষায় আক্রমণকারী বাহিনীকে মোকাবিলার চেষ্টা করছিল। জার্মানরা কোন্ কোন্ দিক দিয়ে হামলা চালাতে পারে, পোলিশ কৌশলবিদগণ তার সঠিক পূর্বাভাস দিতে পেরেছিলেন। তবে তারা জানতেন যে, মিত্রদের পাল্টা হামলা চালানোর সুযোগ করে দেয়ার স্বার্থে তারা অগ্রসরমান জার্মানদের অগ্রাভিযানে বাধা দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারবেন না। শত্রুর হামলা মোকাবিলায় জেনারেল রোমেল ক্রাকোউয়ের নেতৃত্বে ওয়ারশজাওয়া ও জেনারেল ক্লীবার্গের নেতৃত্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অপারেশনাল গ্রুপ

গঠন করা হয়। ৩১ আগস্ট পোলিশ বাহিনী পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। শুরুতে ছিল ১০ লাখ সৈন্য এবং পরে সৈন্য সংখ্যা সাড়ে ১৩ লাখে পৌঁছে।

৯ শ' ট্যাংক, ৪ হাজার ৩ শ' কামান ও ৪৩৫ টি বিমানের সমাবেশ ঘটানো হয়। পোলিশ নৌ-বাহিনীর অধিকাংশকে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করার নির্দেশ দেয়ায় বাল্টিক সাগরে এডমিরাল সোয়ারস্কির নেতৃত্বে নৌ-বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ উপস্থিত ছিল মাত্র। অবশিষ্ট এ পোলিশ নৌ-বাহিনীর মূল দায়িত্ব ছিল গাদাইনিয়া, ওকসিভিই, ওয়েস্টারপ্লেট ও হেল-এর প্রতিরোধকারীদের সহযোগিতা করা এবং সুইডেন, এস্তোনিয়া ও ফিনল্যান্ডে জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করা। পোল্যান্ড ১৯৩৬ সালে আধুনিকায়ন ও সমরসজ্জা প্রক্রিয়া শুরু করায় দেশটির সমর সম্ভারের এক ক্ষুদ্র অংশ ছিল আধুনিক এবং বাদবাকি বিশাল অংশ ছিল সেকেলে। পোলিশ সেনাবাহিনীতে মোটরচালিত যানবাহনের ব্যাপক ঘাটতি থাকায় তাদেরকে পদাতিক ও ঘোড়ায় টানা যানবাহনের উপর নির্ভর করতে হয়। অধিকন্তু পোলিশ বাহিনীকে পুরোপুরি সমাবেশ করা সম্ভব হয়নি এবং তারা ছিল ৩ হাজার কিলোমিটার ব্যাপী সীমান্ত বরাবর তিনদিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত।

১ ও ২ সেপ্টেম্বর পোলিশ সেনাবাহিনী পূর্বদিকে পিছু হটে গিয়ে প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তুলতে এবং হামলাকারীদের অগ্রাভিযান বিলম্বিত করতে প্রচণ্ড লড়াইয়ে জড়িত হয়ে পড়ে। প্রথমদিন অধিকাংশ পোলিশ বিমান মুখ থুবড়ে থুবড়ে পড়ায় পোল্যান্ডের আকাশে জার্মানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঞ্জার ডিভিশনের অগ্রভাগে উড়ে গিয়ে জার্মান জাঙ্কার্স জেইউ-৮৭ বোমারু বিমানগুলো (স্টুকা) গোলন্দাজ বাহিনীকে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে এবং জার্মানদের অগ্রাভিযানের পথে সকল বাধা গুঁড়িয়ে দেয়। ৩ সেপ্টেম্বর পোলিশ বাহিনী পোলিশ করিডোর বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একইদিন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তবে তারা পোল্যান্ডকে সরাসরি সহায়তা দানে কোনো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা চালায়নি। পদাতিক সৈন্য নিয়ে গঠিত পোলিশ বাহিনী পিছু হটতে ব্যর্থ হয় এবং জার্মান পাঞ্জার ইউনিট ও যান্ত্রিক বহরের উপর্যুপরি ধাওয়ার মুখে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করে। বহু পোলিশ ইউনিট এমনকি আর্মি গ্রুপ জার্মান হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে অথবা পিছু হটতে গিয়ে হয়তো ঘেরাও হয় নয়তো ধ্বংস হয়। অন্যূন ৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ পোলিশ হাই কমান্ড উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, পরিস্থিতি খুবই গুরুতর এবং মিত্রবাহিনীর সহায়তা ছাড়া তাদের টিকে থাকার কোনো আশা নেই। বহু ইউনিট পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তারা লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। উত্তর দিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাবার ভয়ে আর্মি ক্রাকোউ পূর্বদিকে প্রত্যাহার করলে জার্মানরা ক্রাকোউ শহরে প্রবেশ করে। একইদিন আর্মি প্রাসি পুরোপুরি অবস্থান গ্রহণ করতে না পারায় পোলিশদের পাল্টা হামলা চালানোর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ফলে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর পিয়েট্রাকাউ ট্রিবুনালস্কি ঘেরাও হয়ে পড়ে। জার্মানদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে ৭ দিন মরণপন লড়াইয়ের পর ৭ সেপ্টেম্বর মেজর সুচারস্কির নেতৃত্বে ওয়েস্টারপ্লেটে মোতায়েন পোলিশ নৌ-বাহিনী ও গ্যারিসন আত্মসমর্পন করে। একইভাবে প্রচণ্ড ও প্রাণপন লড়াই করে জার্মানরা ৮

সেপ্টেম্বর ওয়ারশ পৌঁছে। ওয়ারশ দখলে জার্মানরা ১৩৭ টি বিমান হারায়। ৯ সেপ্টেম্বর পোলিশ অভিযানে রক্তক্ষয়ী ও চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়। বাজুরায় পোলিশ অভিযান ছিল ওয়ারশ রক্ষায় একটি পাল্টা হামলা এবং কুটনো, লোয়িজ ও সোচাসজিউ এলাকায় এ লড়াই সংঘটিত হয়। আর্মি পোমোরজি ও পোজন্যাম এ লড়াই চালায়। এ দু'টি পোলিশ আর্মি গ্রুপকে জার্মান অষ্টম আর্মি প্রায় ঘেরাও করে ফেলে। প্রথমদিকে পোলিশরা সফল হয় এবং আকস্মিক হামলা চালিয়ে জার্মানদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এমনকি তারা জার্মানদের পিছু হটতেও বাধ্য করে। তবে খাদ্য ও গোলাবারুদের ঘাটতি এবং অন্যান্য ফ্রন্টের পরিস্থিতি নাজুক হয়ে উঠায় তারা এ ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি। অন্যদিকে, জার্মান ইউনিটগুলোর ক্ষিপ্রগতির সামনে পোলিশ অপারেশন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফরাসী মার্শাল মরিস গেমেলিন উপর্যুপরি আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, ফরাসী সৈন্যরা পুরোপুরিভাবে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে ফরাসী সৈন্যদের ম্যাজিনো লাইনের পেছনে হটে যাবার নির্দেশ দেয়া হয় এবং ১৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ থেমে যায়। ১৬ সেপ্টেম্বর নাগাদ জার্মানরা পোলিশদের উত্তরদিকে হটিয়ে দেয়। জেনারেল তাদিউস কুত্রজিবার নেতৃত্বে পোলিশ বাহিনী ওয়ারশর পতন কিছুকাল বিলম্বিত করতে সক্ষম হলেও তারা পুরোপুরি ধ্বংস হয় এবং ২০ সেপ্টেম্বর প্রতিরোধ শেষ হয়ে যায়। বাজুরা লড়াইয়ে চতুর্থ, অষ্টম ও দশম আর্মির ১৪ টি জার্মান ডিভিশন অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে দু'টি পোলিশ আর্মি। মাত্র কয়েকটি পোলিশ ইউনিট শত্রু বেষ্টনী ভেদ করে লড়াই করতে করতে ওয়ারশ পৌঁছতে সক্ষম হয়। ১০ সেপ্টেম্বর আর্মি পোজন্যাম শহর থেকে পিছু হটে গেলে জার্মানরা সেখানে প্রবেশ করে। ১৮ সেপ্টেম্বর তোমাসজাউ লুবেলিস্কিতে বৃহত্তম ট্যাংক লড়াই সংঘটিত হয়। এখানে প্রায় ৮০ টি পোলিশ ট্যাংক জার্মান ট্যাংকের মোকাবিলা করে। ৭ সেপ্টেম্বর জার্মান চতুর্থ পাঞ্জার ডিভিশন ওয়ারশর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। ৯ সেপ্টেম্বর ওয়ারশর উপর জার্মানদের প্রথম হামলা হয়। তবে ২৪ সেপ্টেম্বর নাগাদ পোলিশরা জার্মানদের সকল হামলা প্রতিহত করছিল। ২৫ সেপ্টেম্বর জার্মানরা শহরের উপর একযোগে স্থল ও বিমান হামলা শুরু করে। সেদিন থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওয়ারশ দখলে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পোলিশ সৈন্যদের রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় ২৮ সেপ্টেম্বর ওয়ারশর পতন ঘটে। তবে একই সময়ে ১০ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেনারেল ভিক্টর টমির নেতৃত্বাধীন মোডলিন ঘাঁটিতে জার্মানরা নিষ্ফল হামলা চালায়। ওয়ারশর পতন ঘটায় এবং সরবরাহ না থাকায় ২৯ সেপ্টেম্বর এ ঘাঁটির পতন ঘটে। ১৭ সেপ্টেম্বর লুবলিন জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

১৬ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ মস্কোয় নিযুক্ত পোল রাষ্ট্রদূতের কাছে একটি নোট অর্পণ করেন। নোটে তিনি লিখেছিলেন, 'সোভিয়েত রাশিয়া পোল্যান্ড আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পোল্যান্ডে এখন কোনো সরকার নেই। সেজন্য দেশটির সঙ্গে যেসব চুক্তি করা হয়েছে সেগুলোর অবসান ঘটেছে। পোল্যান্ডে বহু শ্বেত রুশ ও ইউক্রেনীয়দের বসবাস। নাৎসীদের স্বৈরাচারের মুখে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া যায় না। তাদেরকে রক্ষায় এবং সোভিয়েতের আত্মরক্ষায়

পোল্যান্ডে সামরিক অভিযান চালানো প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' পোল রাষ্ট্রদূত এ নোট গ্রহণ করেননি। পোলিশ সরকার মস্কো থেকে তার রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে।

১৭ সেপ্টেম্বর ভোর ৪ টায় পূর্ব পোল্যান্ডে বসবাসকারী বাইলোরুশ ও ইউক্রেনীয়দের 'রক্ষা' ও 'মুক্ত' করতে সোভিয়েত লাল ফৌজ পূর্ব দিক থেকে পোল্যান্ড আক্রমণ করে। সোভিয়েত লাল ফৌজের এ অপ্রত্যাশিত অভিযানে অবশিষ্ট পোলিশ সৈন্যদের পুনর্গঠিত হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। লাল ফৌজের সর্বাধিনায়ক মার্শাল ভরেশিলভ স্বয়ং অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পোল্যান্ডে সোভিয়েত অভিযান ছিল ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট স্বাক্ষরিত রিবেনট্রপ- মলোটভ চুক্তির অংশ। এ চুক্তিতে অনাক্রমণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও একটি গোপন আঁতাতও স্থান পায়। গোপন আঁতাতে পোল্যান্ডকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর মধ্যে ভাগাভাগি করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়। তাছাড়া এ চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো দখল করে নেয়ার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

সোভিয়েত সৈন্যরা দু'টি ফ্রন্টে এগিয়ে আসে। একটি ছিল জেনারেল তিমোসজেনকোর নেতৃত্বাধীন ইউক্রেনীয় আর্মি এবং আরেকটি ছিল জেনারেল কোওয়লোউর নেতৃত্বাধীন বাইলোরুশ আর্মি। উভয় ফ্রন্টে প্রায় ১৫ লাখ সোভিয়েত সৈন্য ছিল। দু'টি ফ্রন্টে ছিল ৬ হাজার ১৯১টি ট্যাংক, ১ হাজার ৮ শ' যুদ্ধবিমান ও ৯ হাজার ১৪০টি কামান। ভয়ংকর লড়াইয়ের পর ১৮ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত সৈন্যরা উইলনো দখল করে নেয়। পরে ২২ সেপ্টেম্বর তারা গ্রোদনো ও লাওয়ো দখল করে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর বাগ নদীর তীরে পৌঁছে যায়। পোলিশ হাই কমান্ড সোভিয়েত রেড আর্মির সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত না হতে সৈন্যদের নির্দেশ দেয়। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ নির্দেশ সকল ইউনিটে পৌঁছেনি। প্রথমদিকে পোলিশ সৈন্য ও জনগণ উভয়ে ধারণা করেছিল সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের সহায়তা করতে এসেছে। এ উপলব্ধি থেকে তারা সোভিয়েতদের বাধা দেয়নি। তবে দ্রুত তারা বুঝতে পারে যে, সোভিয়েতরাও আক্রমণকারী। ফলে তাদের সঙ্গে পোলিশদের রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হয়। পোলিশদের প্রচণ্ড বাধার মুখে সোভিয়েতরা বাগ নদীর ভাটিতে পূর্ব প্রুশিয়া অভিমুখী একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহে থামতে বাধ্য হয়।

১৮ সেপ্টেম্বর রাতে পোলিশ প্রেসিডেন্ট ও হাইকমান্ড রেনাল্ট আর ৩৫ সজ্জিত মাত্র একটি ব্যাটালিয়ন সঙ্গে নিয়ে রুমানিয়ায় প্রবেশ করে। সেখানে তাদের আটক করা হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর ব্রীসিচ ও বুগিয়েমে জার্মান ও সোভিয়েতদের পারস্পরিক সাক্ষাত হয় এবং তারা শুভেচ্ছা বিনিময় করে। ২ অক্টোবর হেল-এ রিয়র এডমিরাল আনরাগের অধীনস্থ পোলিশ সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে। ২ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবরের মধ্যে তারা শেষবারের মতো লড়াই করে। ১৯৩৯ সালের ৬ অক্টোবর শুক্রবার শেষ পোলিশ সৈন্যটি আত্মসর্মপণ করে।

জার্মান সাঁজোয়া ইউনিটে ছিল ৭ টি পাঞ্জার, ৪ টি হাল্কা ও ৪ টি যান্ত্রিক পদাতিক ডিভিশন। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর নাগাদ জার্মান পাঞ্জার বাহিনীতে ছিল ১ হাজার ৪৪৫টি ভারি ট্যাংক, ১ হাজার ২২৩ টি হাল্কা ট্যাংক ও ৯৮টি থার্ড এবং ২১১টি ফোর্থ

ভিডিয়াম ট্যাংক। তাছাড়া ছিল আরো ২১৫টি কমান্ড ট্যাংক ও ২০২ টি এক্স-চেক সহ অন্যান্য ধরনের সাঁজোয়া যান। ট্যাংক ছাড়াও ছিল ৩০৮টি জরি ও ৭১৮ টি হাল্কা সাঁজোয়া যান। আরো ছিল ৬৮টি মাঝারী আকারের আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার।

যুদ্ধে জার্মান পক্ষে নিহত হয় ৮,০৮২ থেকে ১০,৫৭২ সৈন্য। আহত হয় ২৭,২৭৮ থেকে ৩০,৩২২ জন। এছাড়া নিখোঁজ হয় ৩,৪০৪ থেকে ৫,০২৯। অন্যদিকে, পোলিশ পক্ষে নিহত হয় ৬৬,৩০০ এবং আহত হয় ১,৩৩,৭০০ সৈন্য। বন্দী হয় ৪২,০০০। যুদ্ধে পোল্যান্ড তার মোট ৪৩৩টি বিমানের মধ্যে ৩২৭টি হারায়। ৯৮টি রুমানিয়া পালিয়ে যায়। ২৬,০০০ বেসামরিক পোলিশও নিহত হয়। জার্মানরা ৯৯৩ থেকে ১,০০০ সাঁজোয়া ও ১১,০০০ মোটর যান হারায়। তাছাড়া তাদের কমান খোয়া যায় ৩৭০ থেকে ৪০০টি। বিমান খোয়া যায় ৬৯৭ থেকে ১,৩০০। পোল্যান্ড জার্মানীর দু'টি ডেস্ট্রয়ার, দু'টি মাইনলেয়ার ও প্রেসউইস—হোলস্টেইনসহ আরো কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে, জার্মানরা পোলিশ ডেস্ট্রয়ার 'উইচার', মাইনলেয়ার 'গ্রিল', ও গোলন্দাজ প্রশিক্ষণ জাহাজ 'মাজুর' ডুবিয়ে দেয়। সোভিয়েতরা এ যুদ্ধে ৭৭৩ জন সৈন্য হারায়। আহত হয় ১,৮৫৯ সৈন্য। এছাড়া সোভিয়েতরা ৪২ টি ট্যাংকও হারায়। সোভিয়েতদের হাতে ২,৪২,০০০ পোলিশ সৈন্য বন্দী হয়। অন্যদিকে, ৭০,০০০ থেকে ১,২০,০০০ সৈন্য হাঙ্গেরী ও রুমানিয়া এবং আরো ২০,০০০ সৈন্য লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় পালিয়ে যায়।

পোল্যান্ড অভিযান ছিল জার্মানীর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এ অভিযানের মাধ্যমে জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনের গতি ও ক্ষিপ্রতা ফুটে উঠে। এ যুদ্ধে একথাও প্রমাণিত হয় যে, বিশাল পদাতিক ও ক্যাভালরি নিয়ে গঠিত বাহিনীর দিন ফুরিয়ে গেছে। যুদ্ধে সাঁজোয়া বহর ব্যবহারে জার্মানদের দক্ষতার প্রমাণও হয় এ যুদ্ধে। জার্মানরা এ শিক্ষা অর্জন করে যে, সুরক্ষিত এলাকায় ট্যাংক ব্যবহার উপযোগী নয়। ওয়ারশ দখলের লড়াইয়ে এটা প্রমাণিত হয়।

পোল্যান্ড দখল নিঃসন্দেহে জার্মানীর একটি সামরিক বিজয়। কিন্তু এ বিজয় পরবর্তীতে তার পরাজয় ডেকে আনে। পোল্যান্ডে জার্মান অভিযানের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ৬ বছর ধরে এ যুদ্ধ চলে। সত্যি হিটলার পোল্যান্ড নিয়ে জুয়া খেলছিলেন। এ খেলায় তিনি চূড়ান্তভাবে হেরে যান।

ডেনমার্ক ও নরওয়েতে জার্মান অভিযান

মহাযুদ্ধের দাবানল উত্তর ইউরোপে প্রজ্জলিত হয়ে উঠে। কয়েক ঘন্টার জার্মান অভিযানে ডেনমার্কের পতন ঘটে। পরে জার্মানী গোটা নরওয়ে দখল করে নিয়ে উত্তর সাগরের পূর্ব সীমান্ত অবরোধ করে। ফিনল্যান্ডের সঙ্গে লড়াইয়ের শেষভাগে সমগ্র স্ক্যান্ডেনেভিয়ায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। মিত্রপক্ষ বিপন্ন ফিনল্যান্ডকে রক্ষায় সৈন্য ও সমরোপকরণ পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু নরওয়ে ও সুইডেন নিজ নিজ এলাকার মধ্য দিয়ে মিত্রপক্ষকে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণে অসম্মতি প্রকাশ করলেও স্ক্যান্ডেনেভিয়ায় যুদ্ধ বেধে যায়নি। কিন্তু পরে আপন স্বার্থে মিত্রপক্ষ শান্তিপ্রিয় স্ক্যান্ডেনেভিয়াকে রণক্ষেত্রে পরিণত করে।

সুইডেন ছিল লৌহ খনির জন্য জগদ্বিখ্যাত। পৃথিবীর উৎকৃষ্ট লৌহ সুইডেনেই পাওয়া যেতো। জার্মানীতে ছিল লৌহের প্রচণ্ড অভাব। অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য লৌহের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। জার্মানী সুইডেন থেকে লৌহ ও পিতল আমদানি করে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে আসছিল। উত্তর নরওয়ের নার্ভিক বন্দর থেকেই সুইডিশ লৌহ ও পিতল বৃটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হতো। জার্মানী বছরে যে ৬০ লাখ টন সুইডিশ লৌহ আমদানি করতো তার অর্ধেক আসতো নার্ভিক বন্দর দিয়ে। বৃটেন ছিল জার্মানীর এ লৌহ আমদানি বন্ধে বদ্ধপরিকর। নরওয়ের সমুদ্রপোকূলে বৃটিশ নৌ-বহরের কড়া প্রহরা বসানো হয়। কিন্তু জার্মানী কম শেয়ানা ছিল না। তারা লৌহ বোঝাই জাহাজগুলো বিমানের ছত্রছায়ায় নরওয়ে উপকূলের পাশ দিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। বৃটিশ রণতরী দেখা মাত্রই তাতে জার্মান বিমানগুলো বোমবর্ষণ করতো এবং এই ফাঁকে জার্মান জাহাজগুলো নরওয়ে উপকূলে প্রবেশ করে আত্মরক্ষা করতো। এ পরিস্থিতিতে বৃটেন নরওয়ে উপকূলে মাইন স্থাপন করে। জার্মানী আগে থেকেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত ছিল। লৌহ আমদানির পথ নিষ্কন্টক করার লক্ষ্যে জার্মানী গোটা স্ক্যান্ডেনেভিয়া অঞ্চল দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা স্থির করে। বৃটেন মাইন স্থাপন করায় জার্মানী নাটকীয় গতিতে নরওয়ের বড় বড় বন্দর ও শহরগুলো দখল করে নেয়। ৯ এপ্রিল মাত্র কয়েক ঘন্টার ঝটিকা হামলায় ডেনমার্কের পতন ঘটে। ডেনিশ সীমান্ত অতিক্রম করে ৪০ হাজার জার্মান সৈন্য দেশটিতে প্রবেশ করে। ডেনমার্ক অভিযানে যেসব জার্মান সেনা ইউনিট অংশগ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে ছিল ১৭০, ১৯৮ ও ২১৪তম পদাতিক ডিভিশন। জার্মান সৈন্যরা প্রবেশের দেড় ঘন্টা পর ডেনিশ সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সমবেতভাবে ঘোষণা করে যে, প্রতিরোধ করার চেষ্টা হবে নিষ্ফল। কাজেই তারা বাধা দানের কোনো চেষ্টা করবে না। বলতে গেলে বিনা

ব্যাটল অব বার্লিন

জার্মানীর রাজধানী বার্লিনের পতনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। এখানকার লড়াই ছিল মূলতঃ নাৎসীবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যকার মর্যাদার লড়াই। ১৯৪৫ সালের প্রথমার্ধে দু'টি ফ্রন্ট থেকে জার্মান সৈন্যরা ক্রমাগত পিছু হটছিল। পিছাতে পিছাতে এক সময় তারা নিজেদের ভূখণ্ডে এসে ঠেকে। একদিকে, সোভিয়েত লাল ফৌজ এবং অন্যদিকে, পশ্চিমা মিত্র জোট উভয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করছিল। তবে এক্ষেত্রে লাল ফৌজ ছিল এগিয়ে। পশ্চিমা মিত্র জোট বার্লিনে ছত্রী সেনা অবতরণের একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। কিন্তু পরে এ পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট হিসাব করে দেখতে পেয়েছিলেন যে, পশ্চিমা মিত্রবাহিনীর ছত্রী সেনারা বার্লিনে অবতরণ করলে কমিউনিস্ট পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের সংঘাত অনিবার্য। এ পরিস্থিতিতে জার্মানীর পতন ঘটার পরিবর্তে পতন ঘটবে পশ্চিমা মিত্র জোটের। তাই তিনি বৃথা রক্তক্ষয়ের ঝুঁকি নিতে চাননি।

জার্মানী পরাজিত হলে দেশটিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক মতাদর্শ কায়েম করা হয়। পশ্চিম জার্মানীতে কায়েম করা হয় পশ্চিমা ধাঁচের বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং পূর্ব জার্মানীতে সোভিয়েত মডেলের কমিউনিজম। ঐতিহাসিক বার্লিন নগরীর পশ্চিমাংশ অখ্যাত বন-কে করা হয় পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী। অন্যদিকে, বার্লিন সোভিয়েত অধিকৃত পূর্ব জার্মানী বা জিডিআর-এর রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মানীর রাজধানী বার্লিনকে পদানত করে এ মহানগরীর মাঝ বরাবর একটি দুর্ভেদ্য দেয়াল তৈরি করে। ১৯৮৯ সালের ৯ অক্টোবর বার্লিন দেয়ালের পতন ঘটলে দুই জার্মানীর এক হওয়ার সুযোগ আসে। এক বছরের মধ্যে দেশটি ঐক্যবদ্ধ হয়। বার্লিন আবার অভিন্ন জার্মানীর রাজধানী হিসেবে অভিষিক্ত হয়। আজ এগুলো কেবলি স্মৃতি।

বার্লিন দখলের লড়াইয়ে শুধু সোভিয়েত সৈন্যরাই নয়, পাশ্চাত্যের মিত্রজোটও অংশগ্রহণ করেছিল। উভয়ে বিপরীত দিক থেকে বার্লিনের দিকে এগিয়ে এসে এক জায়গায় মিলিত হয়। পাশ্চাত্যের মিত্রজোট জার্মানীতে সামরিক অভিযান চালালেও তারা বার্লিনে প্রবেশ করতে পারেনি। সোভিয়েত সৈন্যরাই এখানে আগে প্রবেশ করে এবং এ নগরী কব্জা করে নেয়। পাশ্চাত্যের মিত্রজোট বার্লিনের উপর হাজার হাজার টন বোমাবর্ষণ করে। সোভিয়েতরা দাবি করছে যে, তারা বার্লিনে যে পরিমাণ

কামানের গোলা নিক্ষেপ করেছে মিত্রজোটের বোমাবর্ষণের চেয়ে তার পরিমাণ ছিল অনেক বেশী।

বার্লিন দখলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে লড়াই করেছিল ২৫ লাখ সৈন্য। এসব সৈন্য তিনটি ফ্রন্টে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ফ্রন্টে ছিল কয়েকটি আর্মি। এক একটি আর্মি ছিল আজকের কয়েকটি কোরের সমান। সোভিয়েতদের কামানের সংখ্যা ছিল ৪১ হাজার ৬ শ', ট্যাংকের সংখ্যা সোয়া ৬ হাজার, ট্রাকের উপর স্থাপিত কাতুশা রকেট ৩ হাজার ২৫৫, বিমানের সংখ্যা সাড়ে ৭ হাজার, সামরিক যানের সংখ্যা ৯৫ হাজার ৩৮৩ টি। অন্যদিকে, জার্মানীর পক্ষে সৈন্য ছিল ১০ লাখ, কামান ১০ হাজার ৪ শ', ট্যাংক দেড় হাজার, বিমান ৩ হাজার ৩শ'। 'স্টালিন অরগ্যান্স' ছদ্মনামের হাজার হাজার কাতুশা রকেট নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে বার্লিনে লড়াই শুরু হয়। তিন সপ্তাহের লড়াইয়ে সোভিয়েত রেড আর্মি এ অবরুদ্ধ নগরীতে ২০ লাখের বেশী কামানের গোলা ও রকেট নিক্ষেপ করে। সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন বার্লিন অপারেশনে মার্শাল জর্জি ঝুকভকে কমান্ডার নিযুক্ত করেন। তার ডেপুটি ছিলেন জেনারেল আইভান কোনেভ ও জেনারেল ভাসিল চুইকভ। জার্মান পক্ষে কমান্ডার ছিলেন জেনারেল গথার্ড হেইনরিচ, হেলমুট ওয়েডলিং, হেলমুট রেম্যান ও উইলহেম মোনকি।

শেষ দিনগুলোতে হিটলার বার্লিনেই ছিলেন। তার পালানোর কোনো জায়গা ছিল না। রাইখ চ্যান্সেলারীর বাগানের নীচে দু'তলা ভবন সদৃশ ভূগর্ভস্থ একটি বাংকারে তিনি আশ্রয় নেন। সব কিছু শেষ হয়ে আসছে বুঝতে পেরে তিনি ৩০ এপ্রিল রক্ষিতা ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করেন। সেদিনই তিনি আত্মহত্যা করেন। সায়ানাইড বিষপানে প্রথমে ইভা ব্রাউন জীবন দেন। পরে নিজের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে হিটলার আত্মহত্যা করেন। তার লাশ বাগানে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সোভিয়েত সৈন্যরা লাশ পোড়ানোর কটু গন্ধ পেয়েছিল। হিটলারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জার্মানীতে থার্ড রাইখ বা তৃতীয় সাম্রাজ্যের শাসন শেষ হয়ে যায়। অথচ তিনি একবার গর্ব করে বলেছিলেন, থার্ড রাইখ হাজার বছর শাসন করবে। কী অলীক স্বপ্নই না হিটলার দেখেছিলেন! মাত্র ১২ বছরের মাথায় থার্ড রাইখের পতন ঘটে।

হিটলার ভেবেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নকে পদানত করতে পারলে ইউরোপ ও এশিয়ায় জার্মানীর আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। তাই তিনি একবার বলেছিলেন, 'অপারেশন বারবারোসা শুরু হলে বিশ্বের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে এবং নিশ্চুপ হয়ে যাবে।' তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় পরিকল্পিত সামরিক অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করে এ কথা বলেছিলেন। হিটলার এক সময় যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন সে যুদ্ধ পরে তার ঘাড়েই এসে পড়ে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে রুশরা বার্লিনের দিকে এগিয়ে আসছিল। এ পরিস্থিতিতে হিটলার আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে যেতে নির্দেশ জারি করেন এবং বার্লিনকে একটি দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলে একে রক্ষার শপথ নেন। রাজধানীর কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল হেলমুট রেম্যান হিসাব করে দেখতে পান যে, বার্লিনকে রক্ষা করতে হলে কমপক্ষে অভিজ্ঞ ২ লাখ সৈন্যের প্রয়োজন। কিন্তু ভক্সস্টার্ম বা হোম গার্ড গঠনে যাদের

পাওয়া গিয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল নারী, শিশু ও বৃদ্ধ। জার্মান প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ছিল ৫০ হাজার শিশু ও পেনশনভোগী বৃদ্ধ। ভক্সট্রাম গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে মহানগরী বার্লিন সোভিয়েত অগ্রাভিযানের মুখে নিজেকে রক্ষায় প্রস্তুত হয়। ব্যারিকেড স্থাপন এবং ট্যাংক ফাঁদে ফেলার জন্য পরিখা খনন করা হয়। তবে কমান্ড্যান্ট রেম্যান এসব প্রস্তুতিকে নিষ্ফল হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, 'কেবলমাত্র কোনো অলৌকিক ঘটনাই আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। অন্যথায় সোভিয়েতরা বার্লিন অবরোধ করার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাজধানী রক্ষায় প্রয়োজনীয় সৈন্য ও সমরাস্ত্র কখনো পাওয়া যায়নি।

জার্মানদের চেয়ে শক্তিতে বেশি হওয়ায় বার্লিনে রুশদের বিজয় ছিল অনিবার্য। রুশ ও জার্মানদের শক্তির অনুপাত ছিল সৈন্য ৫ঃ১, কামান ১৫ঃ১, ট্যাংক ৫ঃ১ ও বিমান ৩ঃ১। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও বার্লিনে লড়াইয়ের ভবিষ্যত ছিল অনিশ্চিত। সৈন্যবাহিনী অনেক আগে ধ্বংস গেলেও হিটলার তার বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করতেন। বৃটিশ, আমেরিকান ও রুশরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে বলে একটা ভুল ধারণা তিনি পোষণ করতেন। অন্যদিকে, জোসেফ স্টালিন মনে করতেন, বার্লিনে প্রথমে যারা নিজেদের পতাকা উত্তোলন করবে তারাই যুদ্ধে বিজয়ী বলে গণ্য হবে। তবে পাশ্চাত্যের মিত্রশক্তির হিসাব ছিল ভিন্নতর। বার্লিনের লড়াইয়ে নিয়োজিত রেড আর্মি জার্মানীর ভবিষ্যত বিভক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পোন্নত ভূখণ্ড দখল করতে চাইছিল। স্টালিনের এ ভুল ধারণার জন্য রেড আর্মিকে চড়া মূল্য দিতে হয়। বার্লিন দখলের লড়াইয়ে একজন জার্মান সৈন্যের বিপরীতে ৪ জন রুশ সৈন্যকে প্রাণ দিতে হয়।

সোভিয়েত কমান্ডার মার্শাল জর্জি ঝুকভ ঘোষণা করেন যে, প্রতিশোধ গ্রহণে তাদের চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে গেছে। মস্কোর নির্দেশে মাতৃভূমি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে লড়াই করতে সোভিয়েত পতাকার নামে প্রতিটি সৈন্যকে শপথ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। ১৬ এপ্রিল বার্লিন দখলের লড়াই চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হয়। সেদিন তিনটি সোভিয়েত ফ্রন্ট উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে একযোগে বার্লিনে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ২০ এপ্রিল হিটলার টুয়েলফথ আর্মিকে আমেরিকানদের মোকাবিলা এবং নাইন্থ আর্মিকে বার্লিনের অবরোধ ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশের নির্দেশ দেন। এ দু'টি জার্মান আর্মি গ্রুপ তার নির্দেশ পালনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ততক্ষণে বার্লিনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। ২৪ এপ্রিল এ তিনটি সোভিয়েত আর্মি গ্রুপ জার্মান রাজধানীকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। পরদিন এলবি নদীর তীরে তোরগাউয়ে ইউএস ফার্স্ট আর্মির সঙ্গে সোভিয়েত ফিফথ গার্ড ট্যাংকের সংযোগ ঘটে। ভবনে ভবনে ও রাস্তায় রাস্তায় লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। ২৫ এপ্রিল নাগাদ রুশ সৈন্যরা পুরোপুরি বার্লিন ঘেরাও করে ফেলে এবং ৩০ এপ্রিল দুপুর ২ টা ২৫ মিনিটে রাইখস্টাগের পতন ঘটে। স্টালিনের দেয়া শেষ সময়সীমা পেরিয়ে যাবার

সামান্য আগে রাইখস্টাগের শীর্ষে সোভিয়েত পতাকা উত্তোলন করা হয়। লড়াইয়ে সাড়ে ৮১ হাজার সোভিয়েত সৈন্য নিহত এবং ২ লাখ ৮০ হাজার সৈন্য আহত হয়। ১ হাজার ১৯৭ টি সাঁজোয়া যান এবং ২ হাজার ১০৮টি কামান ও ৯১৭টি বিমান ধ্বংস হয়। অন্যদিকে, জার্মান পক্ষে নিহত হয় দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭৩ হাজার সৈন্য। বন্দী হয় ১ লাখ ৩৪ হাজার। এছাড়া, ১লাখ ৫২ হাজার বেসামরিক লোকও নিহত হয়। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে কুরস্কের যুদ্ধে জার্মান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং আফ্রিকায় জার্মান ও ইতালীয় বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সে মিত্রবাহিনীর সফল অবতরণ এবং রাশিয়ায় উপর্যুপরি বিপর্যয়ে জার্মানী নিজেকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে দেখতে পায়। ১৯৪৫ সালের শুরুতে বৃটিশ, আমেরিকান ও রুশরা ক্রমশঃ জার্মানীর দিকে ধেয়ে আসছিল। জানুয়ারীর শেষদিকে রুশরা রাজধানী বার্লিনের ১শ' মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়। সোভিয়েত সৈন্যরা পোল্যান্ড থেকে তাদের অগ্রযাত্রা শুরু করে। জানুয়ারীতে রেড আর্মি পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ দখল করে নেয়। পোল্যান্ডের সমতল ভূমি ছিল উন্মুক্ত। এ সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে ওয়ারশ এবং নারেউ নদীর ওপার থেকে রেড আর্মির ৩ টি ফ্রন্ট বিশাল এলাকা জুড়ে জার্মানীর দিকে যাত্রা করে। যাত্রার ৪ দিনের মাথায় তারা প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার করে এগুতে থাকে। তারা তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র, ডানজিগ, পূর্ব প্রুশিয়া, পোজনান প্রভৃতি দখল করে বার্লিন থেকে ৬০ কিলোমিটার পূর্বদিকে ওডার নদী বরাবর একটি রেখায় এসে থামে।

২৪ ফেব্রুয়ারী হেইনরিচ হিমলারের নেতৃত্বে নবগঠিত আর্মি গ্রুপ ভিস্তুলা রেড আর্মির উপর পাল্টা হামলা চালালেও তা ব্যর্থ হয়। রুশরা পোমেরানিয়ায় এগিয়ে যায় এবং ওডার নদীর দক্ষিণ তীর মুক্ত করে। ১৩ ফেব্রুয়ারী হাঙ্গেরীর অবরুদ্ধ রাজধানী বুদাপেস্টের অবরোধ ভাঙতে জার্মানদের তিনটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেদিন সোভিয়েতদের হাতে এ শহরের পতন ঘটে। জার্মানরা রেড আর্মির উপর আবার পাল্টা হামলা চালায়। হিটলার দানিয়ুব নদী পুনর্দখলের উপর জোর দেন। ১৬ মার্চ দানিয়ুব পুনর্দখলে জার্মানদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। একই দিন রেড আর্মি-ও জার্মানদের উপর পাল্টা হামলা চালায়। ৩০ মার্চ তারা অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে এবং ১৩ এপ্রিল অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা দখল করে নেয়।

পরবর্তীকালে পূর্ব জার্মানী বা জিডিআর হিসেবে পরিচিত পূর্বাঞ্চলীয় জার্মানীতে সোভিয়েত অগ্রাভিযানের লক্ষ্য ছিল দু'টি। যুদ্ধোত্তরকালে পশ্চিমা মিত্ররা তাদের দখলীকৃত ভূখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে হস্তান্তর করবে কিনা সে ব্যাপারে স্টালিন ছিলেন সন্দিহান। এজন্য সোভিয়েত সৈন্যরা একটি বিরাট ফ্রন্ট জুড়ে হামলার সূচনা করে এবং যত দ্রুত সম্ভব পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পশ্চিমা মিত্র সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে। তবে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বার্লিন। বার্লিন দখল করা ছাড়া জার্মানী দখল করা ছিল অর্থহীন। হিটলারের উপস্থিতি এবং জার্মানীর পারমাণবিক কর্মসূচীসহ যুদ্ধোত্তর বার্লিনের কৌশলগত গুরুত্বও ছিল বিবেচ্য বিষয়।

৯ এপ্রিল রেড আর্মির কাছে পূর্ব প্রুশিয়ার কোনিসবার্গের পতন ঘটে। ফলে জেনারেল রোকসোভস্কির নেতৃত্বাধীন সেকেন্ড বাইলোরাশান ফ্রন্ট ওডার নদীর পূর্ব তীর ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এপ্রিলের প্রথম দুই সপ্তাহে রুশরা দ্রুত গতিতে তাদের সৈন্য পুনঃমোতায়েন সম্পন্ন করে। মার্শাল জর্জি ঝুকভ সীলো হাইটসের (সীলো পাহাড়ের চূড়া) সম্মুখ ভাগে একটি অঞ্চলে তার ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট মোতায়েন করেন। তার আগে এটি বাল্টিকের দক্ষিণে ফ্রাংকফোর্ট থেকে ওডার নদী বরাবর মোতায়েন ছিল। সীলো হাইটসের উত্তরে যেখান থেকে ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট সরে আসে সেখানে সেকেন্ড বাইলোরাশান ফ্রন্ট অবস্থান গ্রহণ করে। সৈন্য পুনঃমোতায়েনকালে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা লাইনে যে ফাঁক ফোঁকর তৈরি হয় সেখান দিয়ে ডানজিগের কাছে একটি অবস্থানে অবরুদ্ধ জার্মান সেকেন্ড আর্মি ওডার নদীর এপারে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। দক্ষিণে জেনারেল কোনেভ ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টের মূল শক্তিকে আপার সাইলেশিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেইসি নদীর উত্তর-পশ্চিমে মোতায়েন করেন।

সোভিয়েত অগ্রাভিযানের মুখে জার্মান ওয়ারম্যাট (সশস্ত্র বাহিনী)-এর জ্বালানি সরবরাহ ছিল না। তারা তাদের প্রয়োজনীয় জ্বালানি চাহিদার মাত্র ১২ শতাংশ সরবরাহ পাচ্ছিল। জ্বালানির অভাবে বিমানগুলোও আকাশে উড়তে পারছিল না। মিউনিখ বিমান ঘাঁটিতে অধিকাংশ বিমান বিধ্বস্ত হয়। এটা প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বার্লিনের পতন মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার। তবে ধারণা করা হচ্ছিল যে, লড়াই হবে ভয়ংকর। যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে জার্মানীর সমরাস্ত্র কারখানায় বিমান ও ট্যাংক উৎপাদন করা হতো ঠিকই। কিন্তু সেগুলোর মান ১৯৪৪ সালের আগের মতো ছিল না। সমরাস্ত্রের ঘাটতি দেখা দেয়ায় এবং জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় জার্মানদের বড়জোড় একমাস টিকে থাকার ক্ষমতা ছিল।

২০ মার্চ জেনারেল গথার্ড হেইনরিচ আর্মি গ্রুপ ভিস্চুলার কমান্ডার হিসেবে ফিল্ড মার্শাল হিমলারের স্থলাভিষিক্ত হন। জেনারেল গথার্ড হেইনরিচ ছিলেন জার্মান সেনাবাহিনীর একজন সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা টেকটিশিয়ান। তিনি অবিলম্বে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। জেনারেল হেইনরিচ সঠিকভাবে ধারণা করতে পেরেছিলেন যে, ওডার নদীর ওপার থেকে এবং পূর্ব-পশ্চিম বরাবর অটোবান (জার্মানীর মূল মহাসড়ক) ধরে সোভিয়েত সৈন্যরা তাদের নিষ্পত্তিকারী হামলা চালাবে। এ উপলব্ধি থেকে তিনি ওডার নদীর তীর রক্ষার চেষ্টা না করার সিদ্ধান্ত নেন। পরিবর্তে তিনি সীলো হাইটসের ওই অংশ যেখানে ওডার নদী অটোবানকে অতিক্রম করেছে সেখানে জার্মান প্রকৌশলীদের মোতায়েন করেন। তিনি সীলো হাইটসের প্রতিরক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে অন্যান্য প্রতিরক্ষা লাইনে প্রাপ্ত জনবল হ্রাস করেন। জার্মান সেনাবাহিনীর প্রকৌশলীগণ উজানের একটি জলাধারের পানি ছেড়ে দিয়ে ওডার নদীর সমতল ভূমি প্লাবিত করে দেয়। বার্লিনকে প্লাবিত জলাভূমির পেছনে রেখে তিনটি প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণ করা হয়। ট্যাংকবিধ্বংসী পরিখা, ট্যাংকবিধ্বংসী কামান ও বাংকারের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এসব প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করা হয়।

১৬ এপ্রিল হাজার হাজার কামান থেকে গোলাবর্ষণ এবং কাতুশা রকেট নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে বার্লিনে সোভিয়েত হামলা শুরু হয়। এ হামলা বিরামহীন গতিতে চলতে থাকে। অতি ভোরে ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট ওডার নদীর ওপার থেকে হামলার সূচনা করে। একই সময়ে নেইসি নদীর ওপার থেকে ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্ট-ও হামলায় অংশগ্রহণ করে। ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট ছিল অধিকতর শক্তিশালী। তবে এ ফ্রন্টের কাজ ছিল কঠিন। অধিকাংশ জার্মান সৈন্যদের হামলা মোকাবিলা করতে হয়েছে তাদেরকেই। ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্টের প্রাথমিক হামলায় বিপর্যয় ঘটে। জার্মান জেনারেল হেইনরিচ সোভিয়েত হামলা আঁচ করতে পেরে আগেই তিনি তার সৈন্যদের প্রতিরক্ষা লাইনের পরিখা থেকে প্রত্যাহার করেছিলেন। সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মানদের দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়ার জন্য ১৪৩টি সার্চলাইট ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু ভোরের কুয়াশায় সার্চ লাইটের আলো বাধাগ্রস্ত হয়। জার্মানদের পাল্টা হামলা এবং প্লাবিত জলাভূমি সোভিয়েতদের জন্য একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রমাণিত হয়। অগণিত সোভিয়েত সৈন্য প্রাণ হারায়। অগ্রযাত্রায় মন্থরতা দেখে স্টালিনের প্রত্যক্ষ নির্দেশে মার্শাল ঝুকভ তার রিজার্ভ সৈন্যদের রণাঙ্গনে পাঠান। সম্ভাব্য অগ্রগতিকালে পশ্চাৎভাগ রক্ষায় রিজার্ভ সৈন্যদের নিয়োজিত করা ছিল তার পরিকল্পনা। সন্ধ্যা নাগাদ কয়েকটি এলাকায় ৬ কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রগতি ঘটে। তবে তখনো জার্মান প্রতিরক্ষা লাইন ছিল অক্ষত। দক্ষিণে ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্ট পরিকল্পনা মাফিক হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। ফলে ঝুকভ স্টালিনের কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য হন যে, সীলো হাইটসে পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ হচ্ছে না। এ কথা শুনে স্টালিন ক্ষুব্ধ হন এবং খোঁচা মেরে ঝুকভের সুপ্ত পৌরুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য বললেন, তাহলে তিনি ট্যাংক আর্মি নিয়ে বার্লিনে এগিয়ে যেতে জেনারেল কোনেভকে অনুমতি দেবেন।

দ্বিতীয় দিন ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্টের স্টাফের সংখ্যা কমিয়ে তাদেরকে রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। একযোগে হামলা চালানোর সোভিয়েত রণকৌশলে হতাহতদের সংখ্যা প্রচলিত কৌশলের চেয়ে বেশী বলে বিবেচিত হচ্ছিল। ১৭ এপ্রিল রাত নাগাদ জেনারেল ঝুকভের বিপরীতে জার্মানদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ছিল অটল। তবে দক্ষিণে মার্শাল ফার্ডিনান্ড শোরনারের নেতৃত্বাধীন জার্মান আর্মি গ্রুপ সেন্টার তেমন একটা প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হচ্ছিল না। ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান আর্মির প্রবল আক্রমণে শোরনারের বাম পাশে ফোর্থ পাঞ্জার আর্মি পিছু হটছিল। তিনি ফোর্থ পাঞ্জারের শক্তি বৃদ্ধি করার পরিবর্তে তার দু'টি রিজার্ভ ডিভিশনকে দক্ষিণে মোতায়েন রাখেন। রাতের মধ্যে আর্মি গ্রুপ ভিস্চুলা ও আর্মি গ্রুপ সেন্টারের দক্ষিণ বাহু ভেঙ্গে পড়তে থাকায় লড়াই একটি সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়। ফোর্থ পাঞ্জার আর্মির মতো এ দু'টি আর্মি পিছু না হটলে তাদেরকে অবরুদ্ধ হওয়ার মুখোমুখি হতে হতো। সীলো হাইটসের দক্ষিণে জেনারেল শোরনারের নাজুক প্রতিরক্ষা লাইনের উপর কোনেভের সফল হামলায় হেইনরিচের প্রতিরক্ষা লাইন কাবু হয়ে পড়ে।

১৮ এপ্রিল দু'টি সোভিয়েত ফ্রন্ট দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করে। তবে এতে তাদের হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। রাতের মধ্যে ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট জার্মানদের শেষ ও চূড়ান্ত প্রতিরক্ষা লাইনে পৌছে যায়। অন্যদিকে, ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্ট ফোরস্ট নামে একটি জায়গা দখল করে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করার চেষ্টা চালায়। ১৯ এপ্রিল চতুর্থ দিনে ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট সীলো হাইটসের চূড়ান্ত প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙ্গে ফেলে। এ সময় এ ফ্রন্ট ও বার্লিনের মধ্যে ছিন্নভিন্ন জার্মান সেনা ইউনিট ছাড়া আর কোনো বাধা ছিল না। সীলো হাইটসের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত নাইন্থ জার্মান আর্মির বাদবাকি সৈন্য এবং ফোর্থ পাঞ্জার আর্মির উত্তরাঞ্চলীয় বাহুর অবশিষ্ট সৈন্যরা ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টের সৈন্যদের হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টে ছিল থার্ড গার্ডস আর্মি, থার্ড ও ফোর্থ গার্ডস ট্যাংক। ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টের এ তিনটি সোভিয়েত আর্মি জার্মান ফোর্থ পাঞ্জার আর্মির প্রতিরক্ষা লাইন তছনছ করে দিয়ে বার্লিনে পৌছতে এবং ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্টের সঙ্গে মিলিত হতে উত্তর দিকে মোড় নেয়। ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টের অন্যান্য আর্মি আমেরিকানদের সঙ্গে সংযোগ সাধনে পশ্চিম দিকে ছুটে যায়। ১৯ এপ্রিলের দিকে জার্মান পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। তখন যা অবশিষ্ট ছিল সেগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ। ১ এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত সোভিয়েতদের মূল্য দিতে হয় চড়া। এ সময় তাদের ২ হাজার ৮০৭ টি ট্যাংক খোয়া যায়। একই সময়ে জার্মানীর পশ্চিম রণাঙ্গনে পশ্চিমা মিত্রদের খোয়া যায় ১ হাজার ৭৯ টি ট্যাংক।

২০ এপ্রিল হিটলারের জন্মদিনে ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্টের কামান থেকে বার্লিনের কেন্দ্রস্থলে মুহূর্মুহু গোলাবর্ষণ করা হতে থাকে এবং শহরটি আত্মসমর্পণ করা নাগাদ এ গোলাবর্ষণ অব্যাহত থাকে। গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট শহরের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে এগুতে থাকে। ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্ট জার্মান আর্মি গ্রুপ সেন্টারের উত্তরাঞ্চলীয় বাহু চুরমার করে এগিয়ে আসে এবং এলবি নদী বরাবর আমেরিকান অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে অর্ধেক সামনে জুটারবগ নামে একটি জায়গার উত্তর দিক অতিক্রম করে। সেকেন্ড বাইলোরাশান ফ্রন্ট স্টেটিন ও শিউইডের মধ্যবর্তী জায়গার উত্তরে আর্মি গ্রুপ ভিস্চুলার আওতাধীন থার্ড পাঞ্জার আর্মির উত্তরাঞ্চলীয় বাহুর উপর হামলা চালায়। ২১ এপ্রিল সেকেন্ড গার্ডস আর্মি বার্লিনের উত্তরে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌছে যায় এবং ওয়ারনিউচন নামে একটি জায়গার দক্ষিণ-পশ্চিমে আক্রমণ চালায়। অন্যান্য সোভিয়েত ইউনিট বার্লিনের বহিঃস্থ বৃত্তে পৌছে যায়। প্রথমে বার্লিন এবং পরে এলিভেন্থ আর্মিকে ঘেরাও করা ছিল সোভিয়েতদের পরিকল্পনা। জার্মান ফিফথ কোরের কমান্ড ফাঁদে পড়ে গেলেও এটি তখনো কোটবাস নামে একটি জায়গা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ফোর্থ পাঞ্জার আর্মির দক্ষিণাঞ্চলীয় বাহু ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ার ফ্রন্টের উপর পাল্টা হামলা চালিয়ে স্থানীয়ভাবে কয়েকটি সাফল্য লাভ করার পর হিটলার কতিপয় নির্দেশ জারি করেন। এ নির্দেশ জারির ঘটনায় এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, তার বাস্তব সামরিক জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। তিনি নাইন্থ আর্মিকে কোটবাস ধরে রাখতে এবং পশ্চিম দিক বরাবর একটি ফ্রন্ট খোলার

নির্দেশ দেন। আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, উত্তর দিক থেকে অগ্রসরমান সোভিয়েত বহরের উপর তাদেরকে হামলা চালাতে হবে। এ হামলা তাদেরকে উত্তরাঞ্চলীয় সাঁড়াশি বাহু হতে সহায়তা করবে। এ সাঁড়াশি বাহুকে দক্ষিণ দিক থেকে আগুয়ান ফিফথ পাঞ্জার আর্মির সঙ্গে মিলিত হতে হবে এবং ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান আর্মিকে ঘেরাও করে ধ্বংস করে দিতে হবে। নির্দেশে আরো বলা হয় যে, দক্ষিণ দিকে থার্ড পাঞ্জার আর্মি আক্রমণ করা না পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় সাঁড়াশি বাহু হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ দক্ষিণাঞ্চলীয় সাঁড়াশি বাহু ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্টকে অবরোধ করবে এবং বার্লিনের উত্তর দিক থেকে এসএস জেনারেল ফেলিক্স স্টেইনারের নেতৃত্বাধীন এলিভেন্থ আর্মি সোভিয়েত ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্টকে ধ্বংস করবে। কিন্তু দিনের শেষভাগে স্টেইনার জেনারেল হেইনরিচকে খোলাখুলি জানিয়ে দেন যে, এ কাজ করার মতো প্রয়োজনীয় ডিভিশন তার হাতে নেই। স্টেইনারের কাছ থেকে এ রিপোর্ট পেয়ে জেনারেল হেইনরিচ হিটলারের স্টাফকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন যে, অবিলম্বে নাইন্থ আর্মিকে পিছু হটার অনুমতি দেয়া না হলে সোভিয়েতদের হাতে তারা ঘেরাও হয়ে যাবে। তিনি এটাও জানিয়ে দেন, এ আর্মিকে বার্লিনের উত্তর-পশ্চিমে ফিরিয়ে আনার সময় ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে। তাই এটিকে পশ্চিমে পিছু হটতে দিতে হবে। হেইনরিচ আরো জানান, হিটলার নাইন্থ আর্মিকে পশ্চিমে পিছু হটার অনুমতি না দিলে তিনি তাকে কমান্ড থেকে অব্যাহতি দানের প্রার্থনা জানাবেন।

২২ এপ্রিল সম্মেলন কক্ষে হিটলার রাগে ক্ষোভে কেঁদে ফেলেন। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, আগের দিন তিনি যেসব নির্দেশ জারি করেছেন সেগুলো আর কার্যকর হচ্ছে না। হতাশা থেকে তিনি বললেন, আমরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গেছি। এ কথা বলে তিনি জেনারেলদের দোষারোপ করেন এবং ঘোষণা করেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বার্লিনেই অবস্থান করে আত্মহত্যা করবেন। এ সময় হিটলারকে কপট সান্ত্বনা দিয়ে জেনারেল আলফ্রেড জোডল বললেন, আমেরিকানরা ইতিমধ্যেই এলবি নদী বরাবর পৌছে গেছে। তাই বার্লিনের দিকে তাদের এগিয়ে আসার সম্ভাবনা কম। সুতরাং আমেরিকানদের মোকাবিলায় মোতায়েন টুয়েলফথ আর্মি বার্লিনে মুভ করতে পারে। জোডলের ধারণা হিটলারের মনঃপূত হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ আমেরিকানদের বিরুদ্ধে রণে ভঙ্গ দিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে টুয়েলফথ আর্মিকে প্রত্যাহার করে বার্লিনের প্রতিরক্ষা জোরদারে নগরীর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থান গ্রহণে জেনারেল ওয়ালথার ওয়েঙ্ককে নির্দেশ দেন। তখন ধারণা করা হয়েছিল, নাইন্থ আর্মি এগিয়ে এলে এটি টুয়েলফথ আর্মির সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এ আশায় সন্ধ্যায় এ সংযোগ সাধনে হেইনরিচকে অনুমতি দেয়া হয়।

ফুয়েরার বাংকারে রক্ষিত মানচিত্রে যুদ্ধের পরিস্থিতি যতই জার্মানদের অনুকূলে বলে ধারণা করা হোক না কেন, তখন বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভয়াল ডিভিশনগুলোর সাহায্যে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রেখে সোভিয়েতরা ছিল বিজয়ের পথে। সেকেন্ড বাইলোরাশান ফ্রন্ট ১৫ কিলোমিটার গভীর অভ্যন্তরে ওডার নদীর পূর্ব প্রান্তে

একটি সেতু নির্মাণ করে এবং থার্ড পাঞ্জার আর্মির সঙ্গে ভয়াবহ লড়াইয়ে মেতে উঠে। নাইন্থ আর্মি কোটবাসের নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং তাদের উপর পূর্ব দিক থেকে চাপ বৃদ্ধি পায়। একটি সোভিয়েত ট্যাংক বহর বার্লিনের পূর্ব দিকে হাভেল নদী অতিক্রম করে এবং আরেকটি ট্যাংক বহর বার্লিনের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যূহের একটি অংশ ভেঙ্গে ফেলে।

২৩ এপ্রিল সোভিয়েত ফার্স্ট বাইলোরাশান ও ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্ট বার্লিন ঘেরাও করে এগিয়ে আসতে থাকে। তারা শহরের সঙ্গে জার্মান নাইন্থ আর্মির যেটুকু সংযোগ ছিল সেটুকু বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টের ইউনিটগুলো বার্লিনের পশ্চিম দিক দিয়ে অগ্রসর হয় এবং শহর অভিমুখে অগ্রসরমান জার্মান টুয়েলফথ আর্মির সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এ পরিস্থিতিতে হিটলার জেনারেল ওয়েন্ডলিংকে বার্লিনের প্রতিরক্ষা কমান্ড্যান্ট নিযুক্ত করেন। ২৪ এপ্রিল নাগাদ ফার্স্ট বাইলোরাশান ও ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্ট বার্লিন অবরোধ সম্পন্ন করে। পরদিন ২৫ এপ্রিল সেকেন্ড বাইলোরাশান ফ্রন্ট স্টেটিনের দক্ষিণে একটি সেতুর আশপাশে থার্ড পাঞ্জার আর্মির অবস্থান ভেঙ্গে এগিয়ে আসে এবং তারা র‍্যাভো সোয়াম্প নামে একটি জলাভূমি অতিক্রম করে। তখন তাদের পশ্চিমে এগিয়ে গিয়ে বৃটিশ টুয়েনটি ফার্স্ট আর্মি গ্রুপের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এবং বাল্টিক বন্দর স্ট্রাসলসুন্ডে এগিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। সোভিয়েত ফিফথ গার্ড আর্মির ফিফটি এইটথ গার্ড ডিভিশন এলবি নদীর তীরে জার্মানীর তোরগাউয়ে ফার্স্ট ইউএস আর্মির সিক্সটি নাইন্থ ডিভিশনের সঙ্গে মিলিত হয়।

বার্লিনের প্রতিরক্ষার জন্য যাদের পাওয়া গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল কয়েকটি ছিন্নভিন্ন আর্মি এবং কয়েকটি ওয়াফেন-এসএস ডিভিশন। পুলিশ ও হিটলার যুব আন্দোলনের ছাত্ররা তাদের সহায়তা দেয়। তাছাড়া ভক্সট্রাম নামে আরেকটি প্রতিরক্ষা বাহিনী ছিল। এ প্রতিরক্ষা বাহিনীর অধিকাংশ লোকই ছিলেন বৃদ্ধ। তাদের কেউ কেউ যৌবনে সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেছেন। আবার কেউ বা ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবীণ সৈনিক। বার্লিনের পশ্চিমে টুয়েনটিন্থ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন, উত্তরে নাইন্থ প্যারাশুট ডিভিশন, উত্তর-পূর্ব দিকে পাঞ্জার ডিভিশন মিউনিববার্গ, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এলিভেন্থ এসএস পাঞ্জারগ্রেনাডিয়ার ডিভিশন নোর্ডল্যান্ড এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে রিজার্ভ সেকেন্ড টুয়েনটিন্থ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন অবস্থান গ্রহণ করে। অপরিমেয় সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে জার্মানদের এতটুকু প্রতিরক্ষা ছিল তাসের ঘরের মতো ভঙ্গুর।

বার্লিন রক্ষার লড়াই শেষ হয়ে যায়। তবে বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ চলতে থাকে। সোভিয়েতরা তিনটি মেক বরাবর শহরের কেন্দ্রস্থলে এগিয়ে আসে। রাইখস্টাগ, মন্টবিক ব্রীজ, আলেক্সান্ডারপ্লাৎস ও হাভেল ব্রীজে প্রচণ্ড লড়াই হয়। এসব জায়গায় ঘরে ঘরে ও হাতাহাতি লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। এসএস বাহিনীর ফরেন কন্টিনজেন্ট প্রাণপনে লড়াই করে। তারা ছিল নাৎসীবাদের আদর্শের অনুসারী। তাই তারা আশংকা করছিল যে, ধরা পড়লে তাদের মৃত্যু অবধারিত। যে কোনো মূল্যে বার্লিন রক্ষার হিটলার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন হেইনরিচ সে নির্দেশ পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করলে

তাকে কমান্ড থেকে অপসারণ করা হয় এবং পরদিন জেনারেল কুর্ট স্টুডেন্ট তার স্থলাভিষিক্ত হন। ৩০ এপ্রিল সোভিয়েত সৈন্যরা বার্লিনের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গেলে হিটলার ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করেন। পরে তিনি আত্মহত্যা করেন। হিটলারের মৃত্যু সংবাদ শুনে স্টালিন মন্তব্য করেছিলেন, 'অতএব এখানেই জারজটার শেষ। তবে সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো যে, তাকে জীবিত ধরা সম্ভব হলো না।' ২ মে জেনারেল ওয়েন্ডলিং সোভিয়েতদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে বার্লিনের শেষ প্রতিরোধ স্তব্ধ হয়ে যায়।

বার্লিনে লড়াই থেমে গেলেও এ নগরীর দক্ষিণে বেশ কয়েকদিন ভয়াবহ লড়াই অব্যাহত ছিল। জার্মান নাইন্থ আর্মি যেসব অবস্থানে অবরুদ্ধ ছিল সেগুলো থেকে বের হওয়ার জন্য মরিয়া লড়াইয়ে মেতে উঠে। নাইন্থ আর্মি জার্মান টুয়েলফথ আর্মির সঙ্গে মিলিত হয়ে এলবি নদী অতিক্রম করে আমেরিকানদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল।

জার্মানদের জনবল ও রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় এক সপ্তাহ পর প্রচণ্ড লড়াই বন্ধ হয়ে যায়। তাদের সরবরাহ মজুদ করা ছিল বহিঃস্থ প্রতিরক্ষা লাইনের বাইরে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতরা জার্মানদের এসব মজুদ দখল করে। বার্লিনের লড়াইয়ে সোভিয়েতরা ২ হাজার সাঁজোয়া যান হারায়। জার্মানদের পাঞ্জারফাউস্ট নামে কাঁধে বহনযোগ্য রকেটের সুনিপুন আঘাতে এসব সোভিয়েত সাঁজোয়া যানের অধিকাংশ ধ্বংস হয়। বেসামরিক জার্মানদের কাছেও প্রচুর পাঞ্জারফাউস্ট রকেট সরবরাহ করা হয়েছিল। প্রতিশোধকামী সোভিয়েত সৈন্যরা শহরের অধিকাংশ এলাকায় লুটতরাজ চালায় এবং মহিলাদের ধর্ষণ করে। কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত লুটপাট চলতে থাকে। প্রথমদিকে রেড আর্মির অফিসারগণ এসব অন্যায় সহ্য করতেন। কিন্তু সামরিক অভিযান দখলদারিত্বে পরিণত হলে কর্তৃপক্ষ ও এনকেভিডি এগুলো থামিয়ে দেয়। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ৪ হাজার সোভিয়েত সেনা কর্মকর্তার বিচার করা হয়।

হিটলারের শেষ ইচ্ছানুযায়ী এডমিরাল কার্ল ডোয়েনিটস নয়া জার্মান প্রেসিডেন্ট এবং জোসেফ গোয়েবলস নয়া রাইখ চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১ মে গোয়েবলস আত্মহত্যা করলে পরবর্তী রাষ্ট্র প্রধানের উপর মিত্রপক্ষের সঙ্গে জার্মানীর আত্মসমর্পণের আলোচনা চালিয়ে যাবার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৪৫ সালের ৮ মে মিত্রবাহিনীর কাছে সকল জার্মান সশস্ত্র বাহিনী নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করলে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটে।

পরাজিত হলেও হিটলার বিশ্বের চেহারা বদলে দিয়ে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে দু'টি নতুন পরাশক্তির জন্ম হয়-একটি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আরেকটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ দু'টি পরাশক্তি পরে স্নায়ুযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। খ্যাতনামা মার্কিন দার্শনিক ডি, টোকেভিলে ১৯৪৫ সালের প্রায় দেড় শ' বছর আগে একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, 'আজ হোক কাল হোক, যুক্তরাষ্ট্র ও

রাশিয়া বিশ্বের দু'টি প্রধান শক্তিতে পরিণত হবে।' ১৯৪৫ সালে জার্মানী ও জাপানের পতনের মধ্য দিয়ে তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি প্রমাণিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এ যুদ্ধ শেষে দেশটি ইউরোপ থেকে ত্বরিত গতিতে তার পুরো সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাহার করতে পেরেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা সম্ভব হয়নি। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আধিপত্য কায়েম হলে পশ্চিম ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিরোধী একটি সামরিক ও রাজনৈতিক জোট গড়ে উঠে। যুদ্ধোত্তর রুশ প্রজন্মকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হয়। যুদ্ধে প্রতি তিনটি শিশুর একজন পিতৃহীন হয়। এ যুদ্ধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আজো থেমে যায়নি। উদাহরণস্বরূপ— প্রতিটি বিয়ে অনুষ্ঠানে প্রত্যেক কনেকে স্থানীয় যুদ্ধের স্মারক স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে হয়। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক অবস্থানে পৌঁছে যায়। স্টালিন চেয়েছিলেন আর যেন কেউ তার দেশে আগ্রাসন চালাতে না পারে। তার দেশের বিরুদ্ধে পশ্চিমা পুঁজিবাদীদের সম্ভাব্য হামলা রোধে তিনি একটি বাফার জোন গঠন করতে চেয়েছিলেন। তিনি তার প্রচেষ্টায় সফলও হয়েছিলেন। ইউরোপে সোভিয়েত উপস্থিতি সম্পর্কে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মিসিসিপির ফাল্টনে এক ভাষণে মন্তব্য করেছিলেন, 'মহাদেশের বুকে একটি লৌহ যবনিকা নেমে এসেছে।'

হিটলারের মৃত্যু

ক্রমাগত সোভিয়েত অগ্রাভিযানের মুখে এডলফ হিটলার নিরাপত্তার জন্য রাজধানী বার্লিনে চ্যান্সেলারী ভবনের ৫০ ফুট নীচে ভূগর্ভস্থ বাংকারে আশ্রয় নেন। এ বাংকারকে বলা হতো 'ফুয়েরারবাংকার।' বোমা প্রতিরোধী ভূগর্ভস্থ এ কমপ্লেক্সে ছিল দু'টি পৃথক ফ্লোরে ৩০টি কক্ষ। সেখানে বায়ু চলাচলের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ছিল। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সীমিত। তাই বাংকারে স্টাফ অফিসারগণ সরাসরি রণাঙ্গনের খবরাখবর সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হতেন। এ সীমাবদ্ধতা থাকায় তারা বাইরে অবস্থানরত বেসামরিক লোকজনের কাছে টেলিফোন করে সোভিয়েত সৈন্যদের অগ্রযাত্রার অবস্থান জেনে নিতেন। বাংকারে প্রতিদিন জেনারেলগণ হিটলারকে যুদ্ধ সম্পর্কে ব্রীফিং দিতেন। সেখান থেকেই তিনি রণাঙ্গনের সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত হতেন। জাতীয় জীবনের এ সন্ধিক্ষণে পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসরমান আমেরিকানদের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য ধাবমান তিনি তার বিধ্বস্ত আর্মিকে পাগলের মতো নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তার সৈন্যরা জেনারেল (পরবর্তীকালে ফিল্ড মার্শাল) জর্জি ঝুকভের নেতৃত্বাধীন ৮টি সোভিয়েত আর্মির অগ্রযাত্রা নস্যাত করে দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু তার এ আশা ছিল দুরাশা মাত্র। হিটলারের বিশ্বস্ত এসএস তাকে রক্ষায় এবং বার্লিনের পতন রোধে সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। সোভিয়েত অগ্রযাত্রায় ভীত হয়ে জার্মানরা জায়গায় জায়গায় সাদা পতাকা দেখাচ্ছিল। এসএস এ সময় নিষ্ঠুরভাবে সাদা পতাকা উত্তোলনকারী জার্মানদের গুলী করে হত্যা করে।

২২ এপ্রিল বাংকারে যুদ্ধ বিষয়ক ৩ ঘন্টার এক সামরিক বৈঠকে যারা তাকে পরিত্যাগ করেছেন তাদের তিনি কঠোর ভাষায় দোষারোপ করেন এবং দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তিনি তার রাইখকে ব্যর্থ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এখন তার কিছুই করণীয় নেই। তিনি বার্লিনেই অবস্থান করবেন এবং শেষ পরিণতির জন্য প্রস্তুত। তার স্টাফ তাকে বার্চটেসগাডেনের আশপাশের পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে অবশিষ্ট সৈন্যদের দিকনির্দেশনা দিয়ে রাইখকে টিকিয়ে রাখার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি এ পরামর্শ উপেক্ষা করে জানান যে, তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

মুহূর্মুহু সোভিয়েত কামানের গোলাবর্ষণের মুখে প্রচারমন্ত্রী ডঃ গোয়েবলস তার ৬ সন্তানসহ পুরো পরিবার নিয়ে হিটলারের সঙ্গে অবস্থান করার জন্য বাংকারে এসে আশ্রয় নেন। গোয়েবলসের সন্তানদের চোখে-মুখে ছিল ভীতির চিহ্ন। লেডি ফ্রাউলিন গোয়েবলস ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত মহিলা। গোয়েবলস তার স্ত্রী ও সন্তানদের মৃত্যুর জন্য

প্রস্তুত হতে বলেন। অন্যদিকে হিটলার যেসব দলিল গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো পুড়িয়ে ফেলার জন্য বাছাই করছিলেন। বাংকার ত্যাগে তিনি স্টাফদের অনুমতি দেন। অনেকেই তার হুকুম মান্য করে এবং ট্রাক ও বিমানে করে বার্চটেসগাডেনের দিকে রওনা হয়ে যায়। তবে কিছু স্টাফ বাংকারে থেকে যায়। তাদের মধ্যে ছিলেন মার্টিন বোরম্যান, গোয়েবলসের পরিবার, এসএস ও সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসার, হিটলারের দু'জন সচিব এবং তার দীর্ঘদিনের সহচরী ইভা ব্রাউন। ২৩ এপ্রিল হিটলারের বন্ধু ও সমরমন্ত্রী আলবার্ট স্পীয়ার ফুয়েরারের সঙ্গে শেষবার সাক্ষাৎ করার জন্য আসেন। এ সময় তিনি তাকে জানান যে, হিটলার তাকে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি তা পালন করেননি। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর পুনর্গঠনের জন্য তিনি শিল্প-কারখানাগুলো ধ্বংস করেননি। আলবার্ট স্পীয়ার ভেবেছিলেন একথা শুনে হিটলার রেগে যাবেন। কিন্তু না। হিটলার তাকে অবাক করে দেন। নীরবে তার বক্তব্য শুনে যান।

সেদিন বিকেলে হিটলার বিমান বাহিনী প্রধান মার্শাল গোয়েরিংয়ের কাছ থেকে একটি জরুরি টেলিগ্রাম পান। গোয়েরিং ততক্ষণে বার্চটেসগাডেনে পৌছে গিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে তাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে হিটলার যে ডিক্রি জারি করেছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি তার টেলিগ্রাম বার্তায় বলেন,

'প্রিয় ফুয়েরার,

বার্লিনের দুর্গে আপনার অবস্থান করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আপনি কি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, ১৯৪১ সালের ২৯ জুন জারিকৃত ডিক্রি অনুযায়ী আপনার ডেপুটি হিসেবে আমি দেশ ও বিদেশে পূর্ণ স্বাধীনতায় রাইখের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি? আজ রাত ১০ টার মধ্যে জবাব না পেলে ধরে নেবো আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন এবং আপনার ডিক্রির শর্তগুলো পূরণ করা হয়েছে। তখন আমি দেশ ও জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করবো। আপনার জীবনের এ দুঃসময়ে আপনার প্রতি আমার টান কতটুকু হতে পারে আপনি তা জানেন। আমি আমার অনুভূতি প্রকাশে ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

আপনার অনুগত হেরম্যান গোয়েরিং।'

গোয়েরিংয়ের এ বার্তা পড়ে হিটলার রাগে ফেটে পড়েন। বোরম্যান তাকে আরো উত্তেজিত করে তোলেন। ক্রুদ্ধ হিটলার গোয়েরিংয়ের কাছে আরেকটি পাল্টা বার্তা পাঠিয়ে বলেন যে, তিনি দেশদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়েছেন। তার এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে তিনি অবিলম্বে সকল পদে ইস্তফা দিলে দীর্ঘদিনের সার্ভিস বিবেচনা করে তাকে ক্ষমা করা হবে। বোরম্যান গোয়েরিংকে গ্রেফতার করার জন্য বার্চটেসগাডেনের কাছাকাছি অবস্থানরত এসএস-কে নির্দেশ দেন। ২৫ এপ্রিল ভোর হওয়ার আগেই গোয়েরিং গ্রেফতার হয়ে যান। পরদিন চ্যান্সেলারী ভবন ও বাংকারের ঠিক উপরে প্রথম সোভিয়েত কামানের গোলা এসে পতিত হয়। সেদিন সন্ধ্যায়

লুফটওয়াফের (জার্মান বিমান বাহিনী) জেনারেল রিটার ভন গ্রেইম ও মহিলা টেস্ট পাইলট হানা রীচ একটি ক্ষুদ্র বিমান নিয়ে ফুয়েরার বাংকারের কাছে একটি রাস্তায় অবতরণ করেন। বিমান উড্ডয়নকালে সোভিয়েতদের গোলায় জেনারেল গ্রেইমের পা জখম হয়। হিটলার আহত গ্রেইমকে জানান যে, তিনি তাকে গোয়েরিংয়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তাকে লুফটওয়াফের কমান্ডে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করা হলো। হিটলার সশরীরে উপস্থিত হয়ে কমান্ড গ্রহণে জেনারেল গ্রেইমকে নির্দেশ দেন। অথচ টেলিগ্রাম পাঠিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করা যেতো। পায়ে গুলী লাগায় গ্রেইমকে বাংকারে তিনদিন বিশ্রামে থাকতে হয়। ২৭ এপ্রিল রাতে বাংকারে সোভিয়েত গোলাবর্ষণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে। হিটলার বিধ্বস্ত জার্মান আর্মির সাহায্যে বার্লিন মুক্ত করার জন্য ফিল্ড মার্শাল কিটেলের কাছে উন্মত্তের মতো টেলিগ্রাম পাঠাতে থাকেন। কিন্তু মার্শাল কিটেল তাকে জানিয়ে দেন যে, বার্লিনে সৈন্য পাঠানো সম্ভব নয়। সোভিয়েতদের কাছে এ শহরের পতন অনিবার্য।

২৪ এপ্রিল হিটলার চরম আঘাত পান। সেদিন তিনি জানতে পারেন যে, এসএস'র কমান্ডার হেইনরিচ হিমলার মিত্রপক্ষের সঙ্গে আলোচনার এবং পশ্চিমে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের কাছে জার্মান আর্মির আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক খবরে বলা হয় যে, হিমলার সুইস রেড ক্রসের কাউন্ট বারনাডেটির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের মিত্রশক্তির সঙ্গে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে যোগাযোগ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হিমলারের এ আত্মঘাতি উদ্যোগের কথা জানতে পেরে হিটলার উন্মাদের মতো আচরণ করতে থাকেন। তাকে কখনো এরকম আচরণ করতে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে হিমলার ছিলেন তার সঙ্গী। তিনি ছিলেন তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত। তাই তাকে উপাধি দেয়া হয়েছিল 'ডার ট্রু' বা বিশ্বস্ত। সেই বিশ্বাসী হিমলার হিটলারের বিপদের দিনে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। হিমলারকে তিনি গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি বাংকারে হিমলারের প্রতিনিধি ও ইভা ব্রাউনের ভগ্নিপতি এসএস লেঃ জেনারেল হারমেন ফেজেলিয়ানকে চ্যান্সেলারীর বাগানে দাঁড় করিয়ে গুলী করার নির্দেশ দেন। জেনারেল ফেজেলিয়ানকে হিমলারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি হ্যাঁসূচক জবাব দেন। তিনি ইতিবাচক জবাব দেয়ায় এসএস তাকে টেনে হিঁচড়ে চ্যান্সেলারীর বাগানে নিয়ে গিয়ে গুলী করে। একসময়ের আস্থাভাজন গোয়েরিং ও হিমলারের বিশ্বাসঘাতকতা এবং বার্লিনের দিকে সোভিয়েত সৈন্যরা ধেয়ে আসতে থাকায় হিটলার নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ২৮ এপ্রিল সন্ধ্যার পর তিনি দু'টি উইল তৈরি করেন। ১৯২৩-২৪ সালে রচিত মেইন ক্যাম্ফে তার যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল, এ দু'টি উইলে তাই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের জন্য তিনি ইহুদীদের দায়ী করলেন। এক সংক্ষিপ্ত সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মধ্যরাতের আগে হিটলার ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করেন। বিয়ে অনুষ্ঠানে ইভা ব্রাউন সিল্কের একটি কালো জামা পরেন। বিয়ের মন্ত্র পড়ান একজন নিম্নপদস্থ নাৎসী অফিসার। তিনিই ছিলেন সিভিল ম্যারেজ অনুষ্ঠানের দায়িত্বে। বিয়েতে পৌরহিত্যকারী নাৎসী অফিসার নিয়ম অনুযায়ী বর ও

কনে উভয়ের কাছে জানতে চান তারা বিশুদ্ধ আর্য রক্তের কিনা। তাদের শরীরে বংশপরম্পরায় কোনো রোগ আছে কিনা। হিটলারের ব্যক্তিগত স্যুটে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। জেনারেল ও অন্যান্যরা তাদের অভ্যর্থনা জানান। সাক্ষী হিসেবে গোয়েবলস ও বোরম্যান বিয়ের রেজিস্টার খাতায় সই করেন। অতিথিরা শ্যাম্পেইন পানের উৎসবে মেতে উঠেন। নাচে গানে পরিবেশ অনেকটা হাল্কা হয়ে আসে। হিটলার আবেগপ্রবণ হয়ে যান। এ সময় তিনি স্মৃতিচারণে হারিয়ে যান। অনেক না-বলা কথা তিনি প্রকাশ করেন। উপস্থিত লোকজন হিটলারের স্মৃতিচারণ মনযোগ দিয়ে শোনেন। তিনি বললেন, তার জীবন থেকে সুখ বিদায় নিয়েছে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুগতরা ত্যাগ করায় মৃত্যুই কেবল তাকে মুক্তি দিতে পারে।

২৯ এপ্রিল বিকেলের দিকে সোভিয়েত সৈন্যরা ফুয়েরার বাংকারের এক মাইলের মধ্যে পৌছে যায়। ইতালীর একনায়ক মুসোলিনীকে তার সৈন্যরা গ্রেফতার করে এবং পরে তাকে হত্যা করে তার লাশ মিলানের একটি চত্বরে ঝুলিয়ে রাখে। মুসোলিনীর রক্ষিতা ক্লারা প্যাত্তাসির পরিণতিও হয় একই। বাংকারে রুদ্ধশ্বাসে হিটলার তার ঘনিষ্ঠ মিত্র মুসোলিনীর এ পরিণামের কথা শুনেছিলেন। বাইরের দুনিয়া থেকে এটাই ছিল হিটলারের শেষ খবর প্রাপ্তি। তিনি বুঝতে পারেন যে, আত্মহত্যা না করলে তার ভাগ্যও মুসোলিনীর মতো হবে। ৩০ এপ্রিল দুপুরে হিটলার সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে শেষ বৈঠকে মিলিত হন। তখন তাকে জানানো হয় যে, বাংকার থেকে সোভিয়েতরা মাত্র কয়েকটি ভবন দূরে রয়েছে। তাই তিনি দ্রুত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হিটলার রাইখ চ্যান্সেলারীর বাগানে বিষ প্রয়োগে তার প্রিয় কুকুর ব্লোন্ডিকে হত্যা করেন এবং বিষের কার্যকারিতা লক্ষ্য করেন। ব্লোন্ডির ছিল দু'টি বাচ্চা। বাচ্চা দু'টিকেও বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। হিটলার তার মহিলা সচিবদের কাছে একটি করে সায়ানাইডের ক্যাপস্যুল তুলে দিয়ে তাদের প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা চান এবং বলেন, চিরবিদায়ের মুহূর্তে তাদের জন্য তার কাছে এর চেয়ে উত্তম উপহার আর নেই। সচিবদের জানিয়ে দেয়া হয়, কেবলমাত্র সোভিয়েতরা বাংকারে হামলা চালালে তারা এসব ক্যাপস্যুল ব্যবহার করবে। তার আগে নয়। ৩০ এপ্রিল আড়াইটায় হিটলার স্টাফদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্য ডাইনিং এলাকায় তার ব্যক্তিগত কক্ষ থেকে বাইরে বের হয়ে আসেন। বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি সবার সঙ্গে নীরবে করমর্দন করেন। করমর্দন শেষে আবার তিনি নিজের কক্ষে ফিরে যান। হিটলারের বিদায় নেয়ার পর উপস্থিত স্টাফরা পরস্পর চোখ চাওয়া চাওয়ি করছিল। তারা এইমাত্র যে দৃশ্য দেখেছে তার পরিণাম যে শুভ নয় তা তারা বুঝতে পারে। হিটলারের জীবন প্রদীপ নিভে আসছে এ ইঙ্গিত পেয়ে তাদের মনের ভার যেন উবে গিয়েছিল।

হিটলার শেষবারের মতো আহার করেন। আহার ছিল নিরামিষ। চ্যান্সেলারীর বাগানে ২শ' লিটার গ্যাসোলিন সরবরাহে তার ব্যক্তিগত গাড়ী চালককে নির্দেশ দেয়া হয়। ব্যক্তিগত সচিব গানসিকে আত্মহত্যার পর পর চ্যান্সেলারীর বাগানে তাদের লাশ দ্রুত পুড়িয়ে ফেলতে বলা হয়। বোরম্যান, গোয়েবলস, জেনারেল ক্রেবস ও জেনারেল বার্গডর্ফ এবং অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তা ও স্টাফদের সঙ্গে হিটলার ও ইভা ব্রাউন

বিদায়ী সাক্ষাত করেন। বিদায় নিয়ে তারা তাদের ব্যক্তিগত কক্ষে প্রবেশ করেন। বোরম্যান ও গোয়েবলস নীরবে অশ্রুমোচন করছিলেন। তার কয়েক মিনিট পর গুলীর আওয়াজ শোনা যায়। অপরাহ্ন সাড়ে তিনটায় বোরম্যান, গোয়েবলস, হিটলারের ভৃত্য হেইঞ্চ লিঞ্চ, অটো গানসি ও হিটলার ইয়ুথ মুভমেন্টের প্রধান আর্থার এ্যাক্সম্যান তার কক্ষে প্রবেশ করেন এবং একটি সোফায় তার শরীর এলিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। তখনো তার কপালে গুলীতে ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। ইভা ব্রাউন বিষ পানে মারা যান। গানসি ও লিঞ্চে একটি কম্বল দিয়ে হিটলারের লাশ ঢেকে ফেলে। হিটলার ও ইভা ব্রাউনের লাশ চ্যান্সেলারীর বাগানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং গ্যাসোলিন ঢেলে লাশে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। দু'জন এসএস সদস্য তাদের লাশ পুড়িয়ে ফেলে। ইভা ব্রাউনের লাশ আগুনের ভেতর খাড়া হয়ে উঠে। বোরম্যান ও গোয়েবলস সামরিক কায়দায় হিটলারকে শেষ অভিবাদন জানান। পরবর্তী ৩ ঘন্টায় লাশগুলোয় পুনঃপুনঃ গ্যাসোলিন ঢালা হয়। হিটলার ও ইভা ব্রাউনের দেহাবশেষ মোটা কাপড়ে জড়িয়ে শবাধারে তোলা হয় এবং তৎক্ষণাৎ সমাহিত করা হয়। বাংকারের পেছনে প্রত্যেকে প্রকাশ্যে ধূমপান করে বুঝিয়ে দেয় যে, ফুয়েরার আর নেই। হিটলারের জীবদ্দশায় কেউ তার সামনে ধূমপান করতো না। বাংকারে তখন বৃষ্টির মতো সোভিয়েত কামানের গোলা এসে পড়ছিল। হিটলারের জীবিত স্টাফরা সোভিয়েতদের হাতে ধরা পড়ার আগে কিভাবে বার্লিন থেকে পালানো যায় সে পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠে।

হিটলারের আত্মহত্যার পরদিন গোয়েবলস তার ৬ সন্তানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। তিনি তাকে ও তার স্ত্রী ফ্রাউলিন ম্যাগদাকে পেছন থেকে গুলী করে হত্যা করার জন্য এসএস'কে অনুরোধ করেন। এসএস তার অনুরোধ রক্ষা করে। তিনি বাংকার থেকে বাইরে এলে এসএস তাকে ও তার স্ত্রীকে পেছন থেকে গুলী করে হত্যা করে। বোরম্যান নিখোঁজ হয়ে যান। তার লাশের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ২ মে রেড আর্মির গোয়েন্দা ইউনিট 'স্মার্স' (SMERSH) চ্যান্সেলারী ভবনে প্রবেশ করে। রেড আর্মির সাধারণ সৈন্যদের বাংকার ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। রেড আর্মির অন্যান্য ইউনিটের কাছে আতংক হিসেবে পরিচিত 'স্মার্স-এর সৈন্যরা জানতো যে, হিটলারের লাশের প্রতি স্টালিনের আগ্রহ বেশী। এ লাশ খুঁজে বের করতে না পারলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। এ দুশ্চিন্তায় স্মার্স উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। হিটলারের বাংকারে এ ইউনিটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল ভাদিস। আত্মহত্যার পর হিটলারের ভাগ্যে কি ঘটেছিল সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ যেসব বিবরণ দিচ্ছেন সেগুলোর ভিত্তি হচ্ছে ভাদিসের রিপোর্ট। মস্কো হিটলারের মৃত্যুকে ভাওতা হিসেবে ঘোষণা দেয়। তাই তার দেহ খুঁজে বের করা একটি রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। ভাদিস বাংকারে জীবিত জার্মানদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং সবাই একই জবাব দেয় যে, হিটলার আত্মহত্যা করেছেন। বাংকার তল্লাশি করা হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহকারী জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হিটলারের দেহ খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারপরেও তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। এরপর স্টালিন এনকেভিডি'র একজন জেনারেলকে বার্লিনে পাঠানোর জন্য গুপ্ত পুলিশ প্রধান বেরিয়াকে নির্দেশ দেন। এ জেনারেলকে মস্কোতে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতে হতো।

৩ মে রুশ গোয়েন্দা ইউনিটের সৈন্যরা বাংকারের মেঝেতে গোয়েবলস, গোয়েবলসের স্ত্রী ম্যাগদা ও তাদের ৬ সন্তানের লাশ খুঁজে পায়। গোয়েবলসের সন্তানদের মুখ নীল হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি তার সন্তানদের সায়ানাইড পানে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। জার্মান নেভির ভাইস এডমিরাল ভস তাদের লাশ শনাক্ত করেন। একইদিন চ্যান্সেলারীর বাগানে একটি লাশ পাওয়া যায়। হিটলারের মতো চার্লি চ্যাপলিন মার্কা গোঁফ। মাথার চুলও অবিকল তার মতো আঁচড়ানো। তবে পায়ে ছিল বুনন মোজা। লাশের পায়ে বোনা মোজা দেখে স্মার্স ঘোষণা করে যে, হিটলার কখনো হাতে বোনা মোজা পরতেন না। তাই লাশ তার হতে পারে না। ৪ মে চ্যান্সেলারীর বাগানে হিটলার ও ইভা ব্রাউনের লাশ পাওয়া যায়। স্মার্সের একজন এজেন্ট একটি শবাধারের নীচে ধূসর কম্বলের একটি টুকরো দেখতে পায়। বাগান খনন করা হয়। খননের পর হিটলার ও ইভা ব্রাউনের ভস্মীভূত লাশের অবশিষ্টাংশ উত্তোলন করা হয়। একটি জার্মান এ্যালসেশিয়ান কুকুর ও কুকুরের একটি বাচ্চাও পাওয়া যায়। ৫ মে ভোরে বার্লিনের উত্তর-পূর্বদিকে বাচ-এ স্মার্সের সদর দপ্তরে এ দু'টি লাশ পাঠানো হয়। হিটলারের লাশ সংরক্ষণে এত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় যে, জার্মানীতে সোভিয়েত সামরিক অপারেশনের অধিনায়ক জেনারেল ঝুকভকেও জানানো হয়নি। হিটলারের ডেন্টাল রেকর্ড এবং তার ডেন্টাল বা দন্ত পরীক্ষার পর জেনারেল ভাদিস নিশ্চিত হন যে, তিনি হিটলারের দেহাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। ৭ মে মস্কোকে জানানো হয়, হিটলারের দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। তখন থেকে এ ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে। ১৯৭০ সালে ক্রেমলিন হিটলারের দেহাবশেষ সমাহিত করার ঘোষণা দেয়। তারা দাবি করে যে, তারা ম্যাগডেবার্গে আর্মির একটি প্যারেড গ্রাউন্ডে হিটলারের লাশ সমাহিত করেছে। সোভিয়েত গোয়েন্দা ইউনিট স্মার্স হিটলারের চোয়াল রেখে দেয়। তারা তাদের ডেন্টাল পরীক্ষায় এ চোয়াল ব্যবহার করে। ইয়েলিনা রাঝেভস্কিয়া এ কথা স্বীকার করেছেন। বাচ-এ হিটলারের দন্ত স্টাফদের স্মার্সের জিজ্ঞাসাবাদকালে তিনি দোভাষী হিসেবে কাজ করেন। এনকেভিডি হিটলারের মাথার খুলি রেখে দেয়। মস্কোর মোহাফেজখানায় হিটলারের চোয়াল ও মাথার খুলি দু'টিই দেখা গেছে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি রুশ কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে, তারা ম্যাগডেবার্গ প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে হিটলারের দেহাবেশেষ উত্তোলন করে এবং পরে তা পুড়িয়ে শহরের নর্দমায় ছিটিয়ে দেয়।

হিটলারের শেষ ইচ্ছা

'যেহেতু আমি আমার সংগ্রামমুখর জীবনে বিয়ে করার মতো দায়িত্ব পালন করার কথা ভাবতে পারিনি তাই আমি জীবনের অস্তাচলগামী মুহূর্তে আমার অবরুদ্ধ জীবনে সুখ দুঃখের অংশীদার হতে স্বেচ্ছায় যে আমার বাংকারে এসেছে তাকে অর্থাৎ ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে তার ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রী হিসেবে আমার সঙ্গে জীবন দিতে চায়। আমাদের জনগণের কল্যাণে আমরা এতদিনে যা হারিয়ে ফেলেছি হয়তো এ বিয়েতে তার কিছুটা লাঘব হবে। আমার যা সম্পদ রয়েছে তার কোনো মূল্য থাকলে

সেগুলোর মালিক হবে দল। দল ধ্বংস হয়ে গেলে মালিক হবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে গেলে সেখানে আমার সিদ্ধান্ত দেয়া নিষ্প্রয়োজন। আমি সারা জীবন যেসব চিত্রকর্ম সংগ্রহ করেছি সেগুলো আমি নিজের জন্য সংগ্রহ করিনি। সংগ্রহ করেছিলাম ডোনাউ-এ আমার নিজ শহর লিঞ্চের একটি সংগ্রহশালা সম্প্রসারণের জন্য। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, আমার অনুরোধ যথাযথভাবে রক্ষা করা হবে। আমি আমার দলের বিশ্বস্ত সহকর্মী মার্টিন বোরম্যানকে আমার প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করছি। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ আইনগত কর্তৃত্ব তাকে দেয়া হলো। আমার ভাই ও বোন, সর্বোপরি আমার স্ত্রীর মা এবং আমার বিশ্বস্ত সহকর্মী বিশেষ করে আমার পুরনো সচিব ফ্রাউ উইন্টার যারা তাদের কাজের মাধ্যমে দীর্ঘদিন আমাকে সহায়তা দিয়েছে তাদের সংসার জীবনে যদি কোনো জিনিসের আবেগঘন মূল্য থাকে অথবা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় তাও বোরম্যানকে নিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হলো।

শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার অসম্মান এড়িয়ে যেতে আমি ও আমার স্ত্রী সহমরণে যাচ্ছি। আমাদের ইচ্ছা যে, আমাদের লাশ সেখানে অনতিবিলম্বে পুড়িয়ে ফেলা হবে যেখানে আমি আমার জাতির জন্য বিগত ১২টি বছর দিনরাত কাজ করেছি।'

বার্লিন, ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৫, রাত ৪টা
(স্বাক্ষর) এ, হিটলার।
সাক্ষী ঃ (১) ডাঃ জোসেফ গোয়েবলস (২) মার্টিন বোরম্যান (৩) কর্নেল নিকোলাস ভন বীলো।

হিটলারের রাজনৈতিক দলিলের প্রথমাংশ

'প্রথম মহাযুদ্ধ যা রাইখের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তখন থেকে একজন নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে জাতির সেবায় আমি ৩০ টি বছর কাটিয়ে দিয়েছি। এ তিন দশক আমার কর্ম, চিন্তা ও শ্রম সবই ছিল আমার জাতির মঙ্গলের জন্য। আমার জাতি আমাকে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে শক্তি যুগিয়েছে যার দৃষ্টান্ত বিরল। এ তিন দশকে আমি জাতির সেবায় আমার জীবন, কর্মশক্তি ও স্বাস্থ্য সবই বিলিয়ে দিয়েছি।

আমি অথবা জার্মানীর কেউ যুদ্ধ চায়নি। এ যুদ্ধ ঐসব আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনায়করাই চেয়েছিলেন এবং উস্কে দিয়েছিলেন যারা হয়তো ছিলেন ইহুদী বংশোদ্ভূত নয়তো ছিলেন ইহুদী স্বার্থের প্রতিভূ। আমি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও সীমিতকরণে বহু প্রস্তাব দিয়েছি। এসব প্রস্তাব পর্যালোচনা করলে আগামীদিনের বংশধর যুদ্ধ শুরু হওয়ার দায় দায়িত্ব আমার উপর চাপাতে সক্ষম হবে না। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমি কখনো চাইনি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধুক। ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকা আক্রান্ত হোক। শত শত বছর পরে হলেও আমাদের শহর ও স্মৃতিসৌধ থেকে ঘৃণা উত্থিত হবে তাদের বিরুদ্ধে যারা এ যুদ্ধের জন্য চূড়ান্তভাবে দায়ী।

জার্মান-পোলিশ যুদ্ধ শুরু হওয়ার ৩ দিন আগে আমি আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে সার নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ যেভাবে মীমাংসা করা হয়েছিল সেভাবে দু'টি দেশের বিরোধ

নিষ্পত্তির জন্য বার্লিনে নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমার এ প্রস্তাবের কথা কারো অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ বৃটিশ রাজনীতির নেতৃস্থানীয় অংশ যুদ্ধ চেয়েছিলেন। তারা যুদ্ধ চেয়েছিলেন দু'টি কারণে। এক, অস্ত্র বিক্রি ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আরেকটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ইহুদী গোষ্ঠীর প্ররোচনা। আমি স্পষ্ট করে বলেছিলাম, এ রক্তাক্ত যুদ্ধের মূল হোতা আন্তর্জাতিক ইহুদী চক্রান্তকারীদের ফাঁদে পা দিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলো এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে দায়দায়িত্ব তাদেরই বহন করতে হবে। আমি এটাও নিঃসন্দেহাতীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, এ যুদ্ধে ইউরোপের লাখ লাখ আর্য সন্তান অনাহারে মারা গেলে, বয়স্ক লোকের মৃত্যু হলে কিংবা হাজার হাজার শিশু ও মহিলা ভস্মীভূত হলে এবং শহরগুলো ধ্বংস্তূপে পরিণত হলে ইহুদীদেরও অনুশোচনা করতে হবে।

৬ বছর যুদ্ধের পর আমি রাইখের রাজধানী বার্লিন ত্যাগ করতে পারি না। আমার বাংকারে শত্রুর হামলা মোকাবিলা করার মতো সৈন্য খুবই সামান্য হওয়ায় এবং আমাদের প্রতিরোধ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ায় আমি এ শহরে যারা এখনো অবস্থান করছেন তাদের অনুরূপ ভাগ্য বরণ করতে চাই। আমি শত্রুর হাতে ধরা পড়তে চাই না। তাই বার্লিনে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফুয়েরার ও চ্যান্সেলর হিসেবে আমার মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব না হলে আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমার নামে সৈন্যরা ফ্রন্টে লড়াই করছে, মহিলারা ঘরে এবং কৃষক ও শ্রমিকরা বাইরে পরিশ্রম করছে। এটা এক অনন্য ইতিহাস। আমি আপনাদের সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি এ আশা ব্যক্ত করছি যে, আপনারা কোনো অবস্থাতেই এ সংগ্রাম পরিত্যাগ করবেন না। আপনারা মহান ক্লজউইজের খাঁটি বংশধর হিসেবে পিতৃভূমির শত্রুদের বিরুদ্ধে যে কোনো স্থানে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন। আমার মরণে কোনো দুঃখ নেই। অনেক নারী-পুরুষ আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাদেরকে সে অনুমতি দেইনি। আমি তাদেরকে জাতির বৃহত্তর সংগ্রামে অংশ নিতে পরামর্শ দিয়েছি। জাতীয় সমাজতন্ত্রের যে চেতনায় আমাদের সৈন্যরা উজ্জীবিত সেই চেতনায় শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আমি সেনা নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানদের অনুরোধ করেছি। আমি তাদের একথাও জানিয়ে দিয়েছি যে, এ সংগ্রামের স্থপতি ও স্রষ্টা হিসেবে ক্ষমতা ত্যাগ কিংবা কাপুরুষের মতো বন্দী হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই আমার কাছে উত্তম। আমাদের নৌ-বাহিনী প্রতিরোধ লড়াইয়ে যে নজির স্থাপন করেছে আমাদের কোনো জেলা বা শহরের সম্ভাব্য আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে জার্মান সৈন্যরা সম্মানের সেই আচরণবিধি অনুসরণ করবেন বলে আমি কামনা করি। আমি আশা করি সকল কমান্ডার আমৃত্যু বিশ্বস্ততার সঙ্গে কর্তব্য পালন করে উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করবেন এবং সামনে এগিয়ে যাবেন।'

রাজনৈতিক দলিলের দ্বিতীয় অংশ

'আমি আমার মৃত্যুর পূর্বে রাইখমার্শাল হেরম্যান গোয়েরিংকে দল থেকে বহিষ্কার করছি এবং ১৯৪১ সালের ২৯ জুন ঘোষিত ডিক্রির আওতায় তিনি যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন সেগুলো থেকে তাকে অব্যাহতি দিচ্ছি। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর

রাইখস্টাগে প্রদত্ত আমার বিবৃতি বলে আমি গ্রসএডমিরাল ডোয়েনিটসকে রাইখের প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত করছি। আমি আমার মৃত্যুর পূর্বে সাবেক রাইখ ফুয়েরার-এসএস এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেইনরিচ হিমলারকে দল ও রাষ্ট্রের সকল পদ থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি। আমি গলিটার কার্ল হেঙ্কিকে রাইখ ফুয়েরার-এসএস এবং জার্মান পুলিশ প্রধান এবং গলিটার পল গিয়েসলারকে রাইখ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করছি।

আমার প্রতি আনুগত্যহীনতা ছাড়াও গোয়েরিং ও হিমলার শত্রুর সঙ্গে গোপন আলোচনা এবং বেআইনীভাবে নিজেরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালানোর মাধ্যমে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন। এগুলো তারা করেছেন আমার অজ্ঞাতে এবং আমার মতের বাইরে। (হিটলার পরে নয়া সরকারের সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন)

মার্টিন বোরম্যান ও গোয়েবলসের মতো বেশকিছু লোক সস্ত্রীক নিজের ইচ্ছায় আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তারা কোনো পরিস্থিতিতে রাইখের রাজধানী ত্যাগ করতে চাননি। বরং তারা আমার সঙ্গে মরতে প্রস্তুত। তবে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে বলবো। তাদেরকে আবেগের উর্ধে উঠে জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হবে। সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের কর্ম ও আনুগত্যের মাধ্যমে মৃত্যুর পর তারা আমার সঙ্গী হবেন। আমি বিশ্বাস করি আমার আত্মা তাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে এবং তাদেরকে অনুসরণ করবে। আমি চাই তারা কর্মে কঠোর হবেন। তবে অন্যায় করবেন না। সর্বোপরি তারা তাদের কাজে কখনো ভীতির কাছে নতি স্বীকার করবেন না এবং তারা জাতির সম্মানকে বিশ্বে সবকিছুর উর্ধে স্থান দেবেন।

শেষ কথা হলো, তাদেরকে এ সত্য মানতে হবে যে, আমাদের কর্ম যা একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের অব্যাহত প্রচেষ্টা তা আগামী শতাব্দীতে আমাদের আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করবে। প্রতিটি ব্যক্তিকে একটি অভিন্ন স্বার্থে কাজ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে একটি বাধ্যবাধকতার আওতায় নিজের সুখ ও সুবিধাকে বিসর্জন দিতে হবে। আমি সকল জার্মান, সকল ন্যাশনালিস্ট সোসালিস্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি নয়া সরকার ও এ সরকারের প্রেসিডেন্টের প্রতি বিশ্বস্ত হতে এবং আমৃত্যু আনুগত্য প্রদর্শন করার আহ্বান জানাচ্ছি।

সকল জাতির সার্বজনীন বিষপ্রয়োগকারী আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের নির্মম বিরোধিতা এবং জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার আইন প্রয়োগে শৈথিল্যের পরিচয় দেয়ায় আমি জাতির ঐসব নেতৃবৃন্দ এবং তাদের আওতায় যারা কাজ করেছেন তাদের অভিযুক্ত করছি।

বার্লিনে প্রদত্ত ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৫ সাল, ভোর ৪ টা
এডলফ হিটলার
সাক্ষী ঃ (১) ডঃ গোয়েবলস (২) মার্টিন বোরহ্যাম (৩) উইলহেম বার্গডর্ফ (৪) হ্যান্স ক্রেবস।

বেশী। তিনি ১০ বছর হিটলারের চ্যান্সেলারীর আশপাশে ট্যুর গাইড হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি হোটেল এডলনের যে কার্ড সংগ্রহ করেছিলেন তা নিয়ে জার্মানীর বহুল প্রচারিত দৈনিক 'দ্য ফ্রাংকফার্টার এ্যালিজেমেইন জেইটাং- এ একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। জার্ক আশংকা প্রকাশ করছিলেন যে, তার নাতি যদি জানতে চায় যে, বার্লিনে নাৎসীদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কোনটি- তাহলে দেখানোর মতো কিছু থাকবে না। তিনি হিটলারের বাংকার খুলে দেয়ার এবং এখানে যেসব ঘটনা ঘটেছিল সেগুলোর একটি রেকর্ড তৈরির স্বপ্ন দেখছিলেন। জার্ক তার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি বই প্রকাশের চেষ্টা চালান। কিন্তু তিনটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান তাকে ফিরিয়ে দেয়। তিনি মনে করেন, পুরো বিষয়টি একটি নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, শহরের রিয়েল এস্টেট মার্কেটের মাঝামাঝি দক্ষিণে ছিল হিটলারের চ্যান্সেলারী ভবন।

জার্ক হিটলারের বাংকার সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন। তার মতো আরো অনেকেই এ দাবি করেছেন। কিন্তু কারো দাবি গ্রাহ্য করা হয়নি। বার্লিনের প্রত্নতাত্ত্বিক অফিসে বহু চিঠি ও ফ্যাক্স পাঠানো হয়। কিন্তু কোনোটির জবাব দেয়া হয়নি। এ উদাসীনতা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা জানান, কোনো নাৎসী স্থাপনা সংরক্ষণ করা হলে তা নব্য নাৎসীদের তীর্থস্থানে পরিণত হতে পারে। হিউ ট্রেভার-রোপার তার 'দ্য লাস্ট ডেজ অব হিটলার' গ্রন্থে হিটলারের আত্মহত্যার সত্যিকার ঘটনা ফাঁস হলে তার অনুসারীরা উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে বলে রুশদের ভীতি উল্লেখ করে প্রশ্ন রেখেছেন, 'একটি সত্যিকার তীর্থস্থানের অনিশ্চয়তা কি তার ভক্ত-অনুরাগীদের আরেকটি ভুয়া তীর্থস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা থেকে বিরত রাখতে পারবে?' হিটলারের স্মারক চিহ্ন সংরক্ষণের পক্ষপাতি কেউ নয়। ভয় একটাই- না জানি হিটলারের বিশ্ব কাঁপানো চেতনা আবার জেগে উঠে।

হিটলারের প্রতি ইভার ভালোবাসা

আর দশটি মানুষের মতো হিটলারেরও মন ও আবেগ ছিল। ঘর বাঁধার স্বপ্নও ছিল। কিন্তু তার সাধ পূরণ হয়নি। ইভা ব্রাউনকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। সোভিয়েত সৈন্যরা এসে পৌঁছানোর আগে বার্লিনে 'ফুয়েরারবাংকারে' তারা দু'জন একসঙ্গে আত্মহত্যা করে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। পারিবারিক আপত্তি থাকায় তারা তাদের ১৭ বছরের অন্তরঙ্গ জীবনে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারেননি। তবে এমন এক সময় তারা বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিলেন যখন মৃত্যু ছিল তাদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা দূরে। কোঁকড়ানো চুলের ইভা ছিলেন লাজুক। রাজনীতিতে তার কোনো আগ্রহ ছিল না। নাৎসী দলের সর্বময় কর্তা এডলফ হিটলারের ঘনিষ্ঠ হলেও তিনি কখনো সরকারী কাজে প্রভাব বিস্তার করতে চাননি। নাৎসী দলের সঙ্গে তার ন্যূনতম সম্পর্কও ছিল না। বরাবরই তিনি ছিলেন শিশুর মতো সহজ সরল। বাস্তব জীবন সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন। তবে ফুয়েরার বাংকারে জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সাহসী ও বাস্তববাদী এক মহিয়সী নারী।

১৯১২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী মিউনিখে ইভা আন্না পাউলা ব্রাউনের জন্ম হয়। তার পিতা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। প্রাথমিক স্কুলের পড়াশোনা শেষ হলে ১৬ বছর বয়সে ইভা ইংরেজ সন্ন্যাসিনীদের পরিচালিত একটি কনভেন্টে শিক্ষা লাভ করেন। কনভেন্টে তিনি অন্যান্য বিষয়ে নম্বর পেতেন গড়পড়তা। তবে এ্যাথলেটিক্সে নৈপুন্যের পরিচয় দেন।

হিটলারের সঙ্গে ইভা ব্রাউনের মন দেয়া-নেয়ার কথা খুব কম লোকই জানতো। হিটলার ছিলেন চাপা প্রকৃতির। তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত কথাগুলো কারো কাছে প্রকাশ করেননি। সারাক্ষণই তার মন রাজনীতির জটিল জগতে বিচরণ করতো। তবে বিদ্যুৎ চমকের মতো কখনো কখনো ইভা তার হৃদয়ে ছায়া ফেলতেন। পৃথিবীর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এক শাসকের প্রেমে পড়লেও ইভা ছিলেন নিরুত্তাপ। তিনি ছিলেন মুখচোরা। তাকে প্রকাশ্যে খুব কমই দেখা যেতো। হিটলার চাইতেন না যে, তাদের সম্পর্কের উপাখ্যান জানাজানি হোক। তিনি মনে করতেন, বিয়ে না করা কোনো মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানাজানি হলে জার্মান মহিলাদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে। এজন্য উভয়ের মৃত্যুর আগে কেউ তাদের রোমান্টিক জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানতো না।

'ইনসাইড দ্য থার্ড রাইখ' গ্রন্থে নাৎসী জার্মানীর সমরমন্ত্রী আলবার্ট স্পীয়ার হিটলার ও ইভা ব্রাউনের সম্পর্ক নিয়ে এক মন্তব্যে লিখেছেন,' দলের পুরনো সহকর্মীরা

হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে ইভাকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়া হতো। তবে কেবিনেট মন্ত্রী পর্যায়ে থার্ড রাইখের কোনো কর্মকর্তা সাক্ষাৎ করতে এলে টেবিল থেকে তিনি উধাও হয়ে যেতেন।' স্পীয়ার আরো লিখেছেন, 'হিটলার ইভাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃত কঠোর গণ্ডির মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন। আমি কখনো কখনো তার কক্ষে যেতাম। তার কক্ষ ছিল হিটলারের শয়নকক্ষের পাশে। তিনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন, সামান্য হাঁটাহাঁটি করার জন্যও তিনি কক্ষের বাইরে যেতেন না। ধীরে ধীরে আমি এ অসুখী মহিলার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ি।'

১৯২৯ সালে হিটলারের সঙ্গে নাৎসী দলের বেতনভুক ফটোগ্রাফার হেইনরিচ হফনারের একজন ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ইভার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। হফনারই তাকে হিটলারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে ইভা হিটলারের পকেটে একটি প্রেমপত্র ঢুকিয়ে ফেলেন। হিটলার ইভা ব্রাউনের সঙ্গে পরিচিত হন নিজের ছদ্মনাম 'হের উলফ' নামে। ১৯২০-এর দশকে নিরাপত্তাজনিত কারণে হিটলার তার আসল নাম বদলে ফেলে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম দেখাতেই হিটলারের পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী শক্তিতে বিমুগ্ধ হন ইভা। সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। ইভা তার বন্ধু মহলে বলে বেড়াতেন যে, তিনি প্রেমে পড়েছেন এমন এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে যিনি মাথায় ফেল্ট হ্যাট পরেন এবং যার রয়েছে অদ্ভুত গোঁফ।

হিটলার ও ইভা উভয়ের পরিবার ছিল তাদের সম্পর্কের ঘোরতর বিরোধী। তাই তারা তাদের সম্পর্কের কথা গোপন রাখেন। রাজনৈতিক ও নৈতিক কারণে তাদের সম্পর্কের প্রতি ছিল ইভার পিতার আপত্তি। অন্যদিকে, হিটলারের বৈমাত্রেয় বোন এঞ্জেলা রাউবল ইভাকে সমাজের একজন নিম্ন শ্রেণীর মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবতে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯৩১ সালে এঞ্জেলার কন্যা গেলি রাউবলের আত্মহত্যার পর ইভার সঙ্গে হিটলারের ঘন ঘন সাক্ষাৎ হতে থাকে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, মামা হিটলারের সঙ্গে ইভার সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হয়ে গেলি আত্মহত্যা করেন। আবার অন্যরা বলছেন যে, হিটলারই গেলিকে হত্যা করিয়েছেন। কোনো কোনো সূত্র দাবি করছে যে, সৎ বোন এঞ্জেলার মেয়ে গেলির সঙ্গে হিটলারের সম্পর্ক ছিল।

ইভার সঙ্গে দীর্ঘদিন মন দেয়া-নেয়ার পর ১৯৪০ সালে হিটলার তার ঘনিষ্ঠজনদের বিষয়টি জানান। তখন থেকেই ইভা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করতে থাকেন। হিটলার ও ইভাকে মাঝে মাঝে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানেও দেখা যেতো। তবে দেখে বুঝার উপায় ছিল না যে, একজন আরেক জনকে চেনেন। প্রথম পরিচয়ের পর দু'বছর পর্যন্ত হিটলার ও ইভার সম্পর্ক কেমন ছিল, এসময় তাদের আদৌ দেখা হতো কিনা তা জানা যায়নি। ১৯৩২ সাল থেকে ইভা আমৃত্যু হিটলারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি পূর্ব প্রুশিয়ায় ওবারসালজবার্গে বারঘোফে হিটলারের অবকাশযাপন কেন্দ্রে উঠেন। পরে সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে সেখান থেকে তিনি বার্লিনে হিটলারের বাংকারে গিয়ে উঠেন। কিন্তু কখনো তিনি বাইরের কারো সামনে আসেননি। বাইরে থেকে কেউ এলে হিটলার তাকে তার একান্ত কক্ষে পাঠিয়ে দিতেন। কেউ তার জীবনে এসেছে-এ কথা তিনি

সরাসরি স্বীকার না করলেও আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ না করে থাকতে পারতেন না। তাকে প্রায়ই বলতে শোনা গেছে, 'একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির বরাবরই উচিত একজন নির্বোধ ও সেকেলে মহিলাকে পছন্দ করা।' কোনো কোনো সময় ইভার সামনেও তিনি এ উক্তি করতেন। নিজের প্রতি হিটলারের এ অসম্মানজনক ধারণা সত্ত্বেও তিনি তাকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসতেন। হিটলারকে তিনি কৌতুক করে জার্মান ভাষায় 'উলফ' (Wulf) অর্থাৎ বাঘ বলে আখ্যায়িত করতেন।

এডলফ হিটলারের প্রেমিকা ও জীবনের শেষ মুহূর্তের সঙ্গিনী ইভা ব্রাউন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলো ইভার কেটেছে আলস্যে ও অবসরে। এসময় তিনি ব্যায়াম করে ও রোমাঞ্চকর উপন্যাস পড়ে সময় কাটাতেন। হিটলারের ইনার সার্কেলের সঙ্গে তার বৈঠকের আয়োজনে সহায়তা করতেন। নগ্নস্নানের প্রতি তার আসক্তির কথা শুনে হিটলার ক্ষেপে গিয়েছিলেন। ছবি তোলার প্রতি ছিল ইভা ব্রাউনের প্রচণ্ড আগ্রহ। ঘনিষ্ঠজনরা তাকে 'রোলেইফ্লেক্স বালিকা' বলে সম্বোধন করতো। রোলেইফ্লেক্স ছিল তখনকার দিনে একটি জনপ্রিয় ক্যামেরার নাম। ইভা ব্রাউন ছবি তুলে নিজেই ডার্করুম প্রসেসিং সম্পন্ন করতেন। পরবর্তীকালে হিটলারের যেসব স্থির ও মুভি ছবি উদ্ধার করা হয় সেগুলোর বেশীর ভাগই ইভার হাতে তোলা।

১৯৪৩ সালে ইভার বোন গ্রেটলের সঙ্গে হিটলারের সহযোগী হারমেন ফেজেলিয়ানের বিয়ে হয়। লেঃ জেনারেল ফেজেলিয়ান ছিলেন জার্মান বিমান বাহিনী প্রধান ফিল্ড মার্শাল হেইনরিচ হিমলারের লিয়াজোঁ অফিসার। সরকারী অনুষ্ঠানে ইভাকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দানে হিটলার এ বিয়েকে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে অন্য এক মহিলাকে নিয়ে সুইডেন পালিয়ে

যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ফেজেলিয়ান ধরা পড়েন। এ অপরাধের জন্য হিটলার ব্যক্তিগতভাবে তাকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। ইভা ব্রাউন ইচ্ছা করে তার ভগ্নিপতিকে রক্ষায় এগিয়ে আসেননি।

১৯৪৪ সালের ২০ জুলাই হিটলার এক হত্যা চেষ্টা থেকে রক্ষা পান। তার প্রাণনাশের চক্রান্তের কথা জানতে পেরে ইভা ভীষণ কষ্ট পান। তিনি তার কাছে আবেগময় ভাষায় একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি বলেন, 'আপনাকে যেদিন প্রথম দেখেছি সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি শুধু জীবনে নয়, মরণেও আপনাকে অনুসরণ করবো। আমি শুধু আপনার ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে আছি।' এ চিঠিতে হিটলারের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার যে ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন সেটা তার প্রথম ইচ্ছা ছিল না। তার আগে আরো দু'বার তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ইভা ব্রাউন কেন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তা পরিষ্কার নয়। তবে অনুমান করা হয় যে,অভিনেত্রী রেনেট মুলারের মতো সুন্দরী নারীদের সঙ্গে হিটলারের দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকায় অভিমানে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। ইভা চাইতেন হিটলার তাকে সময় দিক। কিন্তু তিনি তার প্রতি মনযোগ না দিয়ে রাজনীতিতে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ায় ইভা ব্যথিত হন। যন্ত্রণা সইতে না পেরে তিনি ১৯৩২ সালে নিজেকে নিজেই গুলী করেন। অল্পের জন্য রক্ষা পান। তার ৩ বছর তিনি অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ইভা তার প্রেমকে এভাবে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করলেও হিটলার তা করতে পারেননি। তবে তিনি তার নিজের মতো করে ইভাকে ভালোবাসতেন। আত্মহত্যার চেষ্টা করায় ইভার প্রতি হিটলার আরো দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি মিউনিখের শহরতলী ওয়াসারবারগারস্ট্রাসিতে তাকে একটি ভিলা ক্রয় করে দেন। আরো দেন একটি মার্সিডিজ ও গাড়ী চালক। বিরাট ভিলায় ইভা ছিলেন নিঃসঙ্গ। তাই হিটলার তার কোনো আত্মীয়কে বসবাসের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসার জন্য তাকে পরামর্শ দেন। এ পরামর্শে তিনি তার আপন খালাতো বোন গার্ট্রড ওয়াইসেকারকে খবর দিয়ে নিয়ে আসেন। ওয়াইসেকার ছিলেন বয়সে ইভার চেয়ে ১২ বছরের ছোট। বয়সের ব্যবধান তাদের ঘনিষ্ঠতায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। বয়ঃসন্ধিকালে ওয়াইসেকারকে প্রথম ব্রা পরতে দিয়েছিলেন ইভাই। ১৯৪৪ সালে ট্রেনে চেপে মিউনিখে এসে পৌছুলে শুধু ইভা নয়, দু'জন এসএস অফিসারও ওয়াইসেকারকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন। ভিলায় এসে পৌছানো মাত্র ইভা তাকে তার জুতো পরিবর্তন করতে বলেন। এ সময় একজন গৃহ ভৃত্য একটি ঝুড়িতে ইভার নানা ডিজাইনের জুতো নিয়ে এসে হাজির হয়। জার্মান থার্ড রাইখে মহিলাদের ধূমপান, মদ্যপান ও প্রসাধনী ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। ইভা ব্রাউন ও ওয়াইসেকার দু'জনই এ তিনটি নিষিদ্ধ কাজ করতেন।

ওয়াইসেকার হিটলারের টি হাউসে একটি রেডিও খুঁজে পান। তিনি গোপনে নিয়মিত জার্মান ভাষায় রেডিওতে বিবিসি প্রচারিত সংবাদ শুনে তা ইভাকে অবহিত করতেন। বিবিসি প্রচারিত সংবাদ শুনে ইভা বুঝতে পারেন যে, জার্মানী যুদ্ধে হেরে

যাচ্ছে। এদিকে, ইভার ভিলায়ও মিত্রবাহিনীর বোমা পড়ে। এতে তিনি ভয় পেয়ে যান। ভয়ে তিনি তার কিছু অলংকার ওয়াইসেকারকে দিয়ে দেন। কেন জানি তার মনে হতো তার অলংকার পরার প্রয়োজন নাও হতে পারে। প্রতি দু'দিন অন্তর হিটলার ইভা ব্রাউনকে টেলিফোন করতেন। সময় মতো টেলিফোন না এলে তিনি ছটফট করতেন। মনে হতো যেন হিটলারের কাছ থেকে টেলিফোন পাওয়াটাই তার কাছে সবকিছু।

১৯৩৮ সালের ২ মে হিটলার যে উইল করেন তাতে সে কথা প্রকাশ পায়। তিনি তার উইলে যাদের নাম উল্লেখ করেন তাদের শীর্ষে ছিল প্রেয়সী ইভার নাম। হিটলার তার উইলে বলেছিলেন, কোনো কারণে তার মৃত্যু হলে ইভা আমৃত্যু বছরে ৬ শ' বৃটিশ পাউন্ডের সমপরিমাণ অর্থ সহায়তা পাবেন।

১৯৪৫ সালের এপ্রিলে ইভা হিটলারের চরম দুঃসময়ে বার্লিনে ফুয়েরার বাংকারে এসে উঠেন। হিটলার তাকে বাংকার ত্যাগ করে অন্যত্র সরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এ নির্দেশ অমান্য করে বলেছিলেন, হিটলারের প্রতি পৃথিবীর শেষ বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলেন তিনি। ২৯ এপ্রিল হিটলার এক অনাড়ম্বর সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইভাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তাকে ফ্রাউলিন ব্রাউনের পরিবর্তে ফ্রাউ হিটলার বলে সম্বোধন করতে স্টাফদের নির্দেশ দেয়া হয়। বিয়ের এক রাত পরেই সায়ানাইড পানে ইভা আত্মহত্যা করেন। শত্রুর হাতে ধরা পড়ে লাঞ্ছিত জীবনের নিষ্ঠুর পরিণতি এড়িয়ে যেতে তারা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন। ইভা ও হিটলার দু'জনেই বিষ পান করেন। তবে হিটলার তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার জন্য ৭ দশমিক ৬৫ ক্যালিভারের ওয়ালথার পিস্তল ঠেকিয়ে নিজের কপালে গুলী করেন। রুশ সৈন্যরা পৌছানোর আগে বেশ কয়েকজন নাৎসী কর্মকর্তা তাদের স্যুটে প্রবেশ করেন। সেখানে তাদের মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হিটলারের ইচ্ছানুযায়ী তার ও ইভার লাশ গ্যাসোলিন দিয়ে চ্যান্সেলারীর বাগানে পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা নেয়া হয়। পোড়ানোর কাজ সম্পন্ন না হতে রুশ সৈন্যরা লাশের সন্ধান পেয়ে যায়। বার্লিন ত্যাগের সময় রুশ সৈন্যরা সঙ্গে করে তাদের লাশ নিয়ে যায়। লাশগুলো দিনের বেলা বহন করা হতো এবং রাতে সৈন্যরা যেখানে তাবু ফেলতো সেখানে লাশ দু'টি কবর দেয়া হতো। সাবেক পূর্ব জার্মানীর ম্যাগডেবার্গে রুশ গোয়েন্দা সংস্থার সদর দপ্তরে পৌছানো নাগাদ রুশ সৈন্যরা প্রতিদিন ভোরে হিটলার ও ইভার লাশ কবর থেকে উত্তোলন করতো। ম্যাগডেবার্গে তাদের লাশ ২৫ বছর সমাহিত ছিল। কিন্তু ১৯৭০ সালে হিটলার ও ইভার লাশ স্থায়ীভাবে পুড়িয়ে ফেলা হয়। পরে তাদের লাশের ছাই-ভস্ম ছিটিয়ে দেয়া হয় এলবি নদীতে।

ইভা ব্রাউনের পরিবার যুদ্ধ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সে সময় তার পিতা একটি হাসপাতালে কাজ করতেন। এপ্রিলে তিনি তার পিতার কাছে কয়েক ট্রাঙ্ক বোঝাই জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইভার মা ফ্রান্সিসকা ১৯৭৬ সালের জানুয়ারীতে ব্যাভেরিয়ার রোহপোল্ডিয়ে এক পুরনো খামার বাড়ীতে ৯৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে একটি বড়মাপের প্রেম ঝরে পড়ে। ইভা ব্রাউন হিটলারকে কতটুকু ভালোবাসতেন এবং তার প্রতি ইভার ধারণা কত উচু ছিল তা তার উক্তি থেকেই বুঝা যায়। ইভা মন্তব্য করেছিলেন, যদি এমন হয় যে, ১০ হাজার লোকের জীবনের বিনিময়ে হিটলারকে রক্ষা করা সম্ভব তাহলে তাই উত্তম। ভালোবাসা সত্যি অন্ধ! হিটলার তাকে সহমরণে যেতে নিষেধ করছিলেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। ইচ্ছে করলে তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন। হিটলারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তার জন্য একটি মূলধন। তিনি হিটলারের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তার স্মৃতিচারণমূলক বই লিখে অঢেল অর্থোপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এ সংকীর্ণতার পরিচয় দেননি। যেখানে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ হিটলারকে ঘৃণা করেছে, শত্রু ভেবেছে সেখানে তিনি তাকে ভেবেছেন হৃদয়ের একান্ত মানুষ হিসেবে।

নুরেমবার্গ ট্রায়াল

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল একটি দৃষ্টান্ত। তার আগে আর কখনো কোনো আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয়নি। নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে কেবল পরাজিত নাৎসীদের বিচার হওয়ায় এটা বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিজয়ীরা যুদ্ধের আরেকটি পক্ষ হলেও তারা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জার্মানী পরাজিত না হলে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সোভিয়েতদের বিচার করা হতো মস্কোয় এবং ইংরেজদের লন্ডনে।

আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করার অর্থ এই ছিল না যে, ন্যায়বিচারের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে। বরং এ বিচার ছিল আরেকটি অবিচার। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর সঙ্গে বিজয়ী শক্তি যে আচরণ ও অন্যায় করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও দেশটির সঙ্গে একই আচরণ করা হয়। পরাজিত হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মানী তার প্রতি অন্যায়ের কিছুটা হলেও জবাব দিতে পেরেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে জবাব দিতে পারেনি।

যে মুহূর্তে বৃটিশ বিচারক নুরেমবার্গে নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছিলেন ঠিক তখন বৃটিশ সরকার নিজেও বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছিল। ভারতবর্ষ ও গ্রীসসহ দেশে দেশে তারা শক্তি প্রয়োগে স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করছিল। যুদ্ধের অন্যান্য প্রতিপক্ষের মতো বৃটিশ শিল্পপতি ও বৃহৎ পুঁজির মালিক যারা যুদ্ধে লাভবান হয়েছিলেন তারা তাদের অনিবার্য পরিণতি থেকে রক্ষা পান। বৃটিশ হিয়ারস্ট প্রেসের (সাম্রাজ্য) সঙ্গে নাৎসী যুদ্ধাপরাধী রোজেনার্গের সম্পর্ক এবং বৃটেনের ক্ষমতাসীন শ্রেণীর সঙ্গে তার যোগাযোগ সংক্রান্ত একটি বিবৃতি সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে পেশ করা হলে তা অগ্রাহ্য করা হয়। নুরেমবার্গ আদালত কক্ষে যখন নাৎসী জার্মানীর অনুসৃত বর্ণবাদী নীতি এবং ইহুদী নিধনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হচ্ছিল তখন মার্কিনীরা ফিলিপাইনে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করছিল এবং আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোয় চলছিল ঠ্যাঙ্গারে আইন। কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে বৃটিশ ও আমেরিকানরা অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লাভাকিয়া দখলে হিটলারকে সমর্থন দিয়েছিল। কমিউনিস্ট বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করতে বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা করেছে। কিন্তু যখনি হিটলার তার সামরিক শক্তিকে বৃটিশ ও আমেরিকানদের সমপর্যায়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখনি জার্মানীর প্রতি তারা তাদের নীতি

পরিবর্তন করে। বৃটিশ ও আমেরিকানদের চোখে হিটলারের এটাই ছিল মারাত্মক অন্যায় যে, তিনি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। একইভাবে নাৎসীদের আগ্রাসী নীতির সমালোচনায় সোচ্চার হওয়ার সময় ফরাসীরা আলজেরিয়া ও ইন্দোচীনে আগ্রাসী শাসন অব্যাহত রেখেছিল। তারা ইন্দোচীন বা ভিয়েতনামে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নও তাদের পাইকারী বহিষ্কার নীতির আওতায় ১কোটি জার্মানকে তাদের পৈত্রিক ভিটা থেকে উচ্ছেদ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি করে। পূর্ব ইউরোপকে ভাগাভাগি করে নিতে স্টালিন হিটলারের সঙ্গে এ চুক্তি করেন। জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের এ চুক্তি ছিল সকল জাতির স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে লেনিনের অনুসৃত নীতির পরিপন্থী। নুরেমবার্গ আদালতে শুনানিকালে এ সত্য প্রকাশিত হয় যে, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র ও বেসারাবিয়ায় নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করার জন্যই এ চুক্তি করা হয়েছিল। স্টালিন তুরস্ককে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বৈরি হয়ে উঠতে না দেয়ার ব্যাপারে সম্মত হন এবং দার্দানেলিস প্রণালী দিয়ে বৃটিশ ও ফরাসী যুদ্ধজাহাজকে চলাচলের অনুমতি না দিতেও একমত হন। কিন্তু পরে তিনি বেমালুম এসব সত্য এড়িয়ে যান।

প্রথম মহাযুদ্ধে লেনিন ছিলেন গোপন কূটনীতির ঘোরতর বিরোধী। শ্রমিক ও কৃষকদের নেতৃত্বে বিপ্লব সম্পন্ন হলে বলশেভিকরা তৎক্ষণাৎ জার আমলের মোহাফেজখানা খুলে দেয় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের আপত্তির মুখে সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু নুরেমবার্গ আদালতে জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনাক্রমণ চুক্তি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে সোভিয়েত কৌসুলি আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'এ চুক্তিকে এ মামলার একটি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ এ আদালত জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধের তদন্ত করছে, মিত্রশক্তির পররাষ্ট্রনীতি নয়।'

স্টালিন পোল্যান্ডে জার্মানীর দখলদারিত্ব মেনে নিয়েছিলেন। পোল্যান্ড অভিযানের সংবাদ পেয়ে তিনি জার্মানীকে অভিনন্দন জানিয়ে নাৎসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের কাছে একটি টেলিগ্রাম বার্তা পাঠিয়েছিলেন। আদালতে এ ঘটনা উত্থাপন করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নে ঐ সময় যারা ক্ষমতায় ছিলেন তাদের জন্য বিব্রতকর হতে পারে এমন কোনো তথ্য নুরেমবার্গ আদালত থেকে প্রকাশ করা হয়নি।

৩ শ' দিনব্যাপী নুরেমবার্গ আদালতে বিচারে তারাই ছিলেন বিচারক যারা ছিলেন নাৎসীদের মতোই যুদ্ধাপরাধী। বিশ্বে ভবিষ্যতে শান্তির ভিত রচনা নয়, নিজেদের অপরাধ আড়াল করার জন্যই তারা নাৎসীদের বিচার করছিলেন। নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল স্বার্থক হতো যদি অভিযুক্ত নাৎসীদের মতো অভিযোগকারী বৃটিশ, আমেরিকান ও রুশ যুদ্ধাপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করা যেতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হলোকাস্টে জড়িত নাৎসীদের দু'টি পৃথক বিচারের সাধারণ নাম নুরেমবার্গ ট্রায়াল বা নুরেমবার্গ বিচার। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত জার্মানীর

নুরেমবার্গ শহরে নুরেমবার্গ প্যালেস অব জাস্টিসে এ বিচার অনুষ্ঠিত হয়। এসব বিচারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিচার ছিল আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত বা আইএমটি'তে মূল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। এ আদালতে নাৎসী জার্মানীর ২৪ জন গুরুত্বপূর্ণ নেতার বিচার করা হয়। ১৯৪৫ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ১ অক্টোবর পর্যন্ত এ বিচার চলে। আমেরিকান নুরেমবার্গ সামরিক ট্রাইব্যুনালে (এএমটি) কন্ট্রোল কাউন্সিল আইনের আওতায় অপেক্ষাকৃত লঘু যুদ্ধাপরাধীদের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিচার করা হয়।

১৯৪৫ সাল নাগাদ মিত্রবাহিনীর বিজয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় ইহুদীদের সমর্থক বিভিন্ন গ্রুপ ও বিদেশের মাটিতে গঠিত প্রবাসী সরকারগুলো নাৎসী জার্মানীর প্রতিশোধের আশংকায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। সহিংসতার বিস্তার রোধে জাতিসংঘ যুদ্ধাপরাধ কমিশন (ইউএনডব্লিউসিসি) গঠন করা হয়। এ কমিশন সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধীদের একটি তালিকা তৈরি করতে থাকে। তবে যুদ্ধ বন্দীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের আশংকায় মিত্রবাহিনী নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে ব্যর্থ হয়।

মার্কিন অর্থমন্ত্রী হেনরি মোরগেনথু জুনিয়র জার্মানীকে পুরোপুরি নাৎসীশূন্য করার একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এ পরিকল্পনা মোরগেনথু পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এ পরিকল্পনায় ভার্সাই চুক্তির অনুরূপ নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের দেশ থেকে বহিষ্কার, বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং অর্থনৈতিক শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করা হয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট উভয়ে এ প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে কুইবেক সম্মেলনে তারা এ পরিকল্পনা অনুমোদন করার চেষ্টা চালান। অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দানের ঘোষণা দেয়। মোরগেনথু পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ফাঁস হয়ে গেলে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়। জনগণের প্রবল আপত্তি আঁচ করতে পেরে রুজভেল্ট এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি এ পরিকল্পনায় সমর্থন আদায়ে আর অগ্রসর হননি। মোরগেনথু পরিকল্পনার অপমৃত্যু হলে নাৎসী নেতৃত্বের বিচারে অন্য একটি বিকল্প খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি স্টিমসন ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগন যৌথভাবে 'ইউরোপীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার' শীর্ষক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ১৯৪৫ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যু হলে ট্রুম্যান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। নয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান একটি বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়ার প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন দিতে থাকেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে বেশ ক'টি বৈঠকের পর নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিস্তারিত চূড়ান্ত করা হয়। ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৪৫ সালের ২০ নভেম্বর নুরেমবার্গ শহরে এ বিচার শুরু হবে।

১৯৪৩ সালে তেহরান, ১৯৪৫ সালে প্রথমে ইয়াল্টা ও পরে পটসডাম সম্মেলনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিনটি বৃহৎ শক্তি-যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেন যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দানে একমত হয়। ফ্রান্সকেও এ ট্রাইব্যুনালে স্থান দেয়া হয়। ১৯৪৫ সালের ৮আগস্ট ঘোষিত লন্ডন সনদের ভিত্তিতে এ বিচারের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। লন্ডন সনদে এ বিচার ইউরোপীয় অক্ষ দেশগুলোর

মূল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এ সনদে এটাও উল্লেখ করা হয় যে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুদ্ধাপরাধের বিচার করা হবে না। নুরেমবার্গে প্রায় ২শ' জার্মান যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হয় এবং বিদ্যমান সামরিক আইনে আরো ১ হাজার ৬ শ' যুদ্ধাপরাধীর বিচার হয়। জার্মানীর আত্মসমর্পণের দলিলে বর্ণিত শতাবলী ছিল এ আদালতের এক্তিয়ারের আইনগত ভিত্তি। আত্মসমর্পণ করায় জার্মানীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এ্যালায়েড কন্ট্রোল কাউন্সিলের কাছে ন্যস্ত হয়। জার্মানীর উপর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় এ কাউন্সিল আন্তর্জাতিক ও যুদ্ধের আইন লংঘনকারীদের শাস্তি ছিল দানের ক্ষমতা। কিন্তু ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের শাস্তিদানের ক্ষমতা এ আদালতের ছিল না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন চেয়েছিল, বৃটেনে নাৎসীদের বিচার করা হোক। তবে যে ক'টি কারণে বিচারের জন্য নুরেমবার্গকে বেছে নেয়া হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল (১) নুরেমবার্গ ছিল আমেরিকার নিয়ন্ত্রণাধীন সেক্টরে। তখন জার্মানী ছিল ৪ ভাগে বিভক্ত। (২) দ্য প্যালেস অব জাস্টিসের আয়তন ছিল সুপরিসর। তাছাড়া যুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর বেপরোয়া বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও নুরেমবার্গ ছিল অক্ষত। অন্যদিকে, দ্য প্যালেস অব জাস্টিস কমপ্লেক্সে একটি বিরাট কারাগারও ছিল। (৩) নুরেমবার্গ ছিল নাৎসী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচী ও সমাবেশের একটি শহর। তাই এ শহরে বিচারের একটি প্রতীকী রাজনৈতিক মূল্য ছিল।

এটা স্বীকার করে নেয়া হয় যে, বার্লিন হবে আইএমটি'র স্থায়ী আবাস এবং নুরেমবার্গে প্রথম বিচার অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু দু'টি পরাশক্তির মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় পরবর্তীতে আর কোনো বিচার হয়নি। নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের বিচারকরা ছিলেন জন পার্কার, ফ্রান্সিস বিডল, আলেক্সান্ডার ভোলচকোভ, আইয়োনা নিবিৎচেনকো, জিওফ্রে লরেন্স ও নরম্যান বিরকেত। নুরেমবার্গ ট্রায়ালে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান কৌসুলি ছিলেন রবার্ট এইচ, জ্যাকসন (মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি), বৃটেনের পক্ষে হার্টলি শক্রস, সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে জেনারেল আর এ, রোডেনকো এবং ফ্রান্সের পক্ষে ফ্রাঙ্কো দ্য মেহুন ও অগাস্টি শাম্পি টিয়ার দ্য রিবেস।

বিবাদীগণের আপীল করার সুযোগ ছিল না। তাছাড়া বিচারক নিয়োগে তাদের আপত্তি করাও সম্ভব ছিল না। এসব ত্রুটি ও অসঙ্গতি থাকায় বিভিন্ন গ্রুপ ও ব্যক্তি এ ট্রাইব্যুনাল গঠনে বৈধতার প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, বিজয়ী শক্তি বিচারক নিয়োগ করায় এ ট্রাইব্যুনাল নিরপেক্ষ ছিল না এবং প্রকৃত বিবেচনায় এটিকে আদালত হিসেবে গণ্য করা যায় না। নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ,এল, গুডহার্ট লিখেছেন, 'তত্ত্বগতভাবে এসব যুক্তি শুনতে খুব শ্রুতিমধুর হলেও এতে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিরোধিতাকারীরা বলছেন, এ আদালত নাকি প্রতিটি দেশের প্রশাসনিক আইনের পরিপন্থী। যদি তাই হতো তাহলে কোনো দেশে কোনো

গুপ্তচরের বিচার করা যেতো না। গুপ্তচরের মামলা বরাবরই শত্রু দেশের প্রতিনিধিত্বকারী বিচারকরা নিষ্পত্তি করে থাকেন। তবে এখনো কেউ এ মামলায় নিরপেক্ষ বিচারক নিয়োগের দাবি করেননি। তবে হ্যাঁ, বন্দীদের এ দাবি করার অধিকার রয়েছে যে, বিচারক তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করবেন। তবে তার মানে এই নয় যে, বিচারকরা নিরপেক্ষ হবেন। লর্ড রাইট যথার্থভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, এ ট্রাইব্যুনালে যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা সাধারণ ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ একজন সিঁধেল চোর এ দাবি করতে পারে না যে, সৎ লোকদের একটি জুরি তার বিচার করবে।'

আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালতের নিরপেক্ষতা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল তা একেবারে অমূলক ছিল না। ১৯৩৬-৩৮ সালে নুরেমবার্গ ট্রায়ালে নিয়োজিত প্রধান সোভিয়েত বিচারক নিকিৎচেনকো স্টালিনের শো ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে নুরেমবার্গ ট্রায়ালের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। পূর্বে কৃত অপরাধের ভিত্তিতে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। কোনো নির্দিষ্ট দেশের নিজস্ব আইনে এসব অভিযোগ আনা হয়নি। বিবাদী পক্ষের কোনো আইনজীবী ছিল না। আদালতে একচেটিয়া ছিল বিজয়ী মিত্রশক্তির প্রতিনিধিত্ব। আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন সংক্রান্ত সনদের ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, এ আদালত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণে টেকনিক্যাল রীতিনীতি মানতে বাধ্য নয়। এতে আরো বলা হয়, এ আদালত রায় দানে যতদূর সম্ভব নিজস্ব বিচার বুদ্ধি ও নন-টেকনিক্যাল পদ্ধতি অনুসরণ করবে এবং প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করলে যে কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবে।

নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হলেও মিত্রদেশগুলোর সৈন্যদের যুদ্ধাপরাধের কোনো বিচার করা হয়নি। এসব যুদ্ধাপরাধের মধ্যে ছিল লাকোনিয়া ঘটনার মতো রেড ক্রসের পতাকাবাহী জার্মান জাহাজে হামলা এবং জার্মান যুদ্ধবন্দীদের উপর নির্যাতন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, প্রতিটি সভ্য দেশের সশস্ত্র বাহিনী তাদের আওতাধীন প্রতিটি বাহিনীকে সামরিক আচরণ বিধির আওতায় কোন্ কাজটি করা যাবে এবং কোন্ কাজটি করা যাবে না- তার একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। সামরিক আচরণ বিধির মধ্যে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে তার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক চুক্তি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা এবং যুদ্ধের প্রচলিত রীতিনীতি। উদাহরণস্বরূপ, অটো স্করজেনির বিচারে তার পক্ষে যুক্তি-তর্কের ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালের ১ অক্টোবর মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত ফিল্ড ম্যানুয়েল এবং দ্য আমেরিকান সোলজার্স হ্যান্ডবুক। সশস্ত্র বাহিনীর কোনো সদস্য তাদের নিজেদের সামরিক আচরণ বিধি অমান্য করলে তাকে সামরিক আদালতের মুখোমুখি হতে হবে। সামরিক আচরণ বিধি লংঘনের দায়ে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের সামরিক আদালতের মুখোমুখি হওয়ার নজির রয়েছে। যেমন- বিসকারি গণহত্যার বিচারে।

১৯৪৫ সালের ১৮ অক্টোবর বার্লিনে সুপ্রীম কোর্ট ভবনে আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু হয়। সোভিয়েত বিচারক নিকিৎচেনকো প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ২৪ জন মূল যুদ্ধাপরাধী এবং ৬ টি জার্মান সংগঠন (নাৎসী পার্টির

নেতৃত্ব, এসএস, এসভি, দ্য গেস্টাপো, এসএ এবং জার্মান সেনাবাহিনীর হাই কমান্ড) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে বিচার শুরু হয়। যেসব অপরাধে অভিযোগ গঠন করা হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল (১) শান্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত, (২) আগ্রাসী যুদ্ধের পরিকল্পনা, সূচনা ও শুরু, (৩) যুদ্ধাপরাধ এবং (৪) মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

যে ২৪ জনের বিচার এবং শাস্তি দেয়া হয় তারা হলেন (১) মার্টিন বোরম্যান, মৃত্যুদণ্ড। তবে তিনি বিচার চলাকালে অনুপস্থিত ছিলেন। (২) কার্ল ডোয়েনিটস, শাস্তি -১০ বছরের কারাদণ্ড। তিনি ছিলেন জার্মান ইউ-বোট বহরের অধিনায়ক। হিটলারের মৃত্যুর পর তিনি স্বল্পকালের জন্য প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। (৩) হ্যান্স ফ্রাঙ্ক, শাস্তি- মৃত্যুদণ্ড। বিচারকালে তিনি কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হন। (৪) উইলহেম ফ্রিক, শাস্তি-মৃত্যুদণ্ড। (৫) হ্যান্স ফ্রিৎজ, তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়। গোয়েবলসের পরিবর্তে তাকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। (৬) ওয়াল্টার ফাঙ্ক, শাস্তি -যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১৯৫৭ সালের ১৬ মে স্বাস্থ্যগত কারণে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। (৭) হেরম্যান গোয়েরিং, শাস্তি- মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আগের দিন রাতে তিনি আত্মহত্যা করেন। তিনি ছিলেন জার্মান বিমান বাহিনী লুফটওয়াফের কমান্ডার। (৮) রুডলফ হোয়েস, শাস্তি- যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তিনি ১৯৪১ সালে স্কটল্যান্ডে পালিয়ে যান। (১০) আলফ্রেড জোডল, শাস্তি- মৃত্যুদণ্ড। (১১) আর্নেস্ট কার্লটেনব্রুনার, শাস্তি- মৃত্যুদণ্ড। তিনি ছিলেন এসএস'র সর্বোচ্চ জীবিত কর্মকর্তা। (১২) উইলহেম কিটেল, শাস্তি-মৃত্যুদণ্ড। তিনি ছিলেন হিটলারের অন্যতম সহযোগী ও ফিল্ড মার্শাল। (১৩) গুস্ত াভ ক্রুপ ভন বোহলেন, শাস্তি- জানা যায়নি। তবে স্বাস্থ্যগত কারণে বিচারের অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। (১৪) রবার্ট লে, শাস্তি-জানা যায়নি। ১৯৪৫ সালের ২৫ অক্টোবর তিনি আত্মহত্যা করেন। (১৫) কন্সটান্টিন ভন নিউরাথ, শাস্তি- ১৫ বছরের কারাদণ্ড। (১৬) এরিক রিডার, শাস্তি- যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১৯৫৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তাকে স্বাস্থ্যগত কারণে মুক্তি দেয়া হয়। (১৭) জোয়াসিম ভন রিবেনট্রপ, শাস্তি- মৃত। তিনি ছিলেন জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী। (১৮) আলফ্রেড রোসেনবার্গ, শাস্তি- মৃত। তিনি ছিলেন বর্ণবাদী তত্ত্বের উদগাতা। (১৯) ফ্রিৎজ সাউকেল, মৃত। (২০) হাজালমার সাচাট, শাস্তি -খালাস। (২১) বালডুর ভন সিরাচ, শাস্তি-২০ বছরের কারাদণ্ড। তিনি ছিলেন হিটলারজুগেণ্ড নামে আধা মিলিশিয়া বাহিনীর প্রধান। (২২) আর্থার সেইচ ইনকোয়াট, শাস্তি- মৃত। (২৩) আলবার্ট স্পীয়ার, শাস্তি-২০ বছরের কারাদণ্ড। তিনি ছিলেন জার্মানীর সমরমন্ত্রী। বিচার কালে তিনি অনুতপ্ত হন। (২৪) জুলিয়াস স্ট্রেইচার, শাস্তি- মৃত। তিনি ছিলেন ইহুদীদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি এবং তাদের হত্যাকাণ্ডের উস্কানিদাতা।

২৪ জন শীর্ষ জার্মান যুদ্ধবন্দীর মধ্যে ২১ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাদের মধ্যে ১২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হেরম্যান গোয়েরিং আত্মহত্যা করেন এবং মার্টিন বোরম্যান ছিলেন নিখোঁজ। ১৯৪৬ সালের ১৬ অক্টোবর দণ্ডিতদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। নিম্ন ও উচ্চপদস্থ সব মিলিয়ে মোট ২৪ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ১২৮ জনকে পাঠানো হয় কারাগারে এবং ৩৫জনকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়।

ব্যক্তির কোন্ কোন্ কর্মকাণ্ড যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য হবে নুরেমবার্গ বিচারের নীতিমালায় বা প্রিন্সিপলস অব নুরেমবার্গ-এ তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। বিচার প্রক্রিয়ায় এ নীতিমালা তৈরি সম্পন্ন হয়। অসুস্থ থাকায় কোনো কোনো সন্দেহভাজন নাৎসী যুদ্ধাপরাধীর তাৎক্ষণিক বিচার করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে তাদের বিচার করা হয়। জার্মান চিকিৎসকদের একটি টীমের মতামতের উপর ভবিষ্যতে তাদের বিচার নির্ভর করতো। এজন্য এ বিচারকে বলা হতো 'ডক্টর্স ট্রায়াল' বা চিকিৎসকদের বিচার।

সকল নাৎসী নেতার বিচার করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে অনেকেই স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমান। শত শত নাৎসী আমেরিকায়ও পালিয়ে গিয়েছিলেন। বিদেশে পালিয়ে গিয়ে পরিচয় গোপন রেখে এসব নাৎসী বসবাস করতে থাকেন। নুরেমবার্গ আদালতে বিচার শেষ হওয়ার পর অনেকের খোঁজ পাওয়া যায় এবং তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৯৬২ সালে পোল্যান্ডে বিচারে অসউইচ বন্দী শিবিরের কমান্ড্যান্ট হেরম্যান হেসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এডলফ আইখম্যানকে আর্জেন্টিনায় খুঁজে পাওয়া যায়। একই বছর ইসরাইলে বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। অধিকাংশ নাৎসী যুদ্ধাপরাধী তাদের অপরাধ স্বীকার করেছেন। তবে একইসঙ্গে তারা একথাও বলেছেন যে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তারা এসব অপরাধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ইহুদী রাষ্ট্র গঠনে হলোকাস্টের আজগুবি গল্প

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে হলোকাস্ট বা তথাকথিত ইহুদী গণহত্যা নামে খ্যাত একটি শব্দের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এ শব্দটি আর কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না। গ্রীক শব্দ Holokauston থেকে ইংরেজী Holocaust শব্দটির উৎপত্তি। গ্রীক শব্দটির প্রথম অংশ Holo এর অর্থ হচ্ছে পুরোপুরি এবং পরের অংশটুকু Kauston এর অর্থ হচ্ছে ঝলসানো উপঢৌকন অথবা দেবতার মনতুষ্টির জন্য পুরোপুরি ঝলসানো উপঢৌকন। প্রাচীন রোমান ও গ্রীক ধর্মীয় রীতিতে মর্ত্য এবং পরকালের দেবতাদের সন্তুষ্টি অর্জনে রাতে কালো রংয়ের পুরোপুরি ঝলসানো পশু উপঢৌকন দেয়া হতো। পরে তওরাতে অনুরূপ উপঢৌকন বা কোরবানী দেয়ার তাগিদ দেয়া হয়। তওরাতে বলা আছে, রাষ্ট্র গঠনের জন্য ৬০ লাখ ইহুদীকে কোরবানী হতে হবে। তওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী ইহুদীরা জীবন কোরবানী দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাদের সামনে কখনো সে সুযোগ আসেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাদেরকে ঈপ্সিত সুযোগ এনে দেয়। হিটলারের ইহুদী বিরোধী নীতির মধ্যে ইহুদীরা তাদের স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা দেখতে পায়। ইহুদীদের এ মানসিকতা থেকেই হলোকাস্টের জন্ম।

ঐতিহাসিক রবার্ট বি, গোল্ডম্যান লিখেছেন, হলোকাস্ট ছাড়া ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব ছিল না। ইহুদী রাষ্ট্র গঠনে হলোকাস্টের অনিবার্যতা সম্পর্কে গোল্ডম্যানের এ মন্তব্য খুবই যথার্থ। কথিত হলোকাস্টের জন্য জার্মানীকে দায়ী করা হয় এবং ইহুদীদের জন্য ৬ হাজার ৮শ' কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। ক্ষতিপূরণের এ অর্থ দিয়েই ইহুদীরা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে নিজেদের জন্য রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয়। তাছাড়া তারা পাশ্চাত্যের শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সহানুভূতি ও সমর্থন লাভেও সফল হয়। কথিত হলোকাস্ট রোধে ব্যর্থতার জন্য মার্কিন ও বৃটিশ সরকারকে অভিযুক্ত করা হয়। এ অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পরবর্তী কয়েক দশকে মার্কিন সরকার ইহুদীদের ৩ লাখ কোটি ডলার অর্থ সহায়তা দিয়েছে।

হলোকাস্টে কত লোক নিহত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও ইহুদী ও তাদের সমর্থকরা জোর গলায় দাবি করছে যে, ৬০ লাখ ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছে। হলোকাস্টের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পোল্যান্ডের অসউইচ শ্রম শিবির। এখানে নাকি ৪০ লাখ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয়। অন্যায়ভাবে একজন ইহুদীকে হত্যা করা হয়ে থাকলেও তা নিন্দনীয় এবং কোনো যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু একদল ইহুদী রয়েছে যারা এ সংখ্যাকে বেদবাক্য জ্ঞান করে। ৬০ লাখ ইহুদী নিহত হওয়ার

ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করলে তাকে হিটলারের দালাল বলে আখ্যায়িত করা হয়। শুধু তাই নয়, সন্দেহ পোষণকারীদের উপর হামলাও হয়। একটি চরমপন্থী ইহুদী গ্রুপ এসব হামলা চালিয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ৬০ লাখ নয়, ১ লাখ ৩৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার লোক মারা গেছে। মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ইহুদীদের মতো অন্যান্য ধর্মের লোকও ছিল। এসব লোক অনাহার ও রোগব্যাধিতে মারা যায়। গ্যাস চেম্বারে বন্দী ইহুদীদের ঢুকিয়ে হত্যা করার দাবি ছিল আষাঢ়ে গল্প। গ্যাস চেম্বার বলতে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। সোভিয়েত নেতা স্টালিনের প্রত্যক্ষ নির্দেশে জার্মানদের পরিত্যক্ত অসউইচ শ্রম শিবিরে গ্যাস চেম্বার তৈরি করা হয়। নাৎসীদের বিরুদ্ধে বিশ্বকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যই স্টালিন এ চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অসউইচসহ অন্যান্য জার্মান বন্দী শিবিরে লোকজন অনাহারে মারা যায়।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের রিপোর্ট তার জাজ্বল্য প্রমাণ। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, হলোকাস্টে কথিত নিহত ইহুদীদের সংখ্যা রাজনৈতিক কারণে বাড়িয়ে বলা হয়। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় পাশ্চাত্যের শক্তিশালী দেশগুলোর সহানুভূতি আকর্ষণে হলোকাস্টে নিহতদের সংখ্যা বাড়িয়ে উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েকদিন আগে ১৮ এপ্রিল নিউইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্টে কোনো সূত্র বা উৎসের উল্লেখ না করে বলা হয়, পোল্যান্ডের অসউইচ শ্রম শিবিরে ৪০ লাখ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয়। কয়েক দশক পর্যন্ত কেউ এ সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। কিন্তু ১৯৯৫ সালে অসউইচ মুক্ত হওয়ার ৫০তম বার্ষিকীতে খোদ নিউইয়র্ক টাইমস এবং ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত দু'টি পৃথক রিপোর্টে বলা হয়, পোল্যান্ডের অসউইচ শ্রম শিবিরে ৪০ লাখ নয়, ১০ লাখ কিংবা তার চেয়ে কম লোক নিহত হয়। অবশ্য সর্বপ্রথম ৯০ লাখ ইহুদী নিহত হওয়ার দাবি করা হয়েছিল। এ সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে। ইংরেজ লেখক ভিভিয়ান বার্ড 'অসউইচঃ দ্য ফাইনাল কাউন্ট' নামে ১০৯ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, অসউইচে ৯০ লাখ নয়, ৭৩ হাজার ১৩৭ জন বন্দী শ্রমিক মারা গেছে। মৃতদের মধ্যে ইহুদী ছিল ৩৮ হাজার ৩১ জন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক ঘটনার মতো হলোকাস্টে ইহুদীদের কথিত গণহত্যার ঘটনাও গভীর রহস্যময়। সত্যি কি হলোকাস্ট বলে কোনো ঘটনা ঘটেছিল? এ প্রশ্নে অনেক ঐতিহাসিক, গবেষক ও লেখক ঘুরপাক খেয়েছেন। সত্যের নাগাল পাওয়ার জন্য তারা অক্লান্তভাবে গবেষণা করেছেন। তাদের একজন হলেন রিচার্ড হার্ডউড। মার্কিন ঐতিহাসিক ও গবেষক রিচার্ড হার্ডউড সমকালীন বই-পুস্তক, ঐতিহাসিক প্রমাণ, পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ও নুরেমবার্গ আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রভৃতির ভিত্তিতে একটি বই লিখেছেন। তার বইয়ের নাম হচ্ছে Did six million really die? অর্থাৎ সত্যি কি ৬০ লাখ নিহত হয়েছিল? ১৯৯৯ সালের ২৫ এপ্রিল জুডেলসাইট জগ্রাম নামে একটি ওয়েব সাইটে তার বইয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক

হার্ডউড তার আলোচিত বইয়ে উল্লেখ করেছেন, হলোকাস্টে গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের হত্যা করার অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা। তিনি তার বইয়ে জোর দিয়ে বলেছেন, হিটলার কোনো ইহুদীকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একই কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক আর্নো মেয়ার। মেয়ার তার Why did Heaven's not darken? অর্থাৎ 'স্বর্গ কেন অন্ধকার হয়নি?' শিরোনামে এক বইয়ে বলেছেন, গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের হত্যা করার অভিযোগ সঠিক নয় এবং এ ধরনের অভিযোগ গ্রহণযোগ্যও নয়। তিনি বলেছেন, অসউইচসসহ অন্যান্য শ্রম শিবিরে মৃত্যুবরণকারীদের অধিকাংশ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। ১৯৯৮ সালে গ্যাস চেম্বার ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ফ্রেড এ, লিউচটার প্রণীত রিপোর্টে প্রমাণ করা হয়েছে যে, অসউইচে এ যাবৎকাল গ্যাস চেম্বার হিসাবে যা প্রদর্শন করা হচ্ছে সে ধরনের গ্যাস চেম্বার কখনো সেখানে ছিল না এবং এ ধরনের গ্যাস চেম্বার কখনো ব্যবহার করা হয়নি।

ইহুদীদের মৃতদেহ দিয়ে জার্মানরা স্যুপ তৈরি করেছিল বলে যে অভিযোগ করা হয় তা ছিল একটি যুদ্ধকালীন প্রচারণা মাত্র। ইসরাইলের অধিকাংশ ইহুদী ঐতিহাসিক এ ধরনের ঘটনাকে অবাস্তব বলে স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, জার্মান অধিকৃত পোল্যান্ডের অসউইচ শ্রম শিবিরের আশপাশে উন্নতমানের সিনথেটিক রাবার, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদনকারী নাৎসী জার্মানীর ৪০টি বৃহত্তম ও অত্যাধুনিক শিল্প কারখানাও ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরো সময়ে সেখানে কখনো মিত্রবাহিনী বোমাবর্ষণ করেনি। কেন মিত্রবাহিনী সেখানে বোমাবর্ষণ করেনি তার কোনো যুক্তিসঙ্গত জবাব নেই। সেখানে বোমাবর্ষণ করা হলে এ শ্রম শিবির ধ্বংস হয়ে যেতো এবং বন্দী ইহুদীরা মুক্তি পেতো। বৃটিশ বিমান মাত্র একবার অসউইচে বোমাবর্ষণ করেছিল। বোমাবর্ষণের জন্য বৃটিশ সরকার যুদ্ধের পর ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। বৃটিশ সরকার অসউইচে বোমাবর্ষণকে একটি 'দুর্ঘটনা' হিসেবে আখ্যায়িত করে। শত শত মার্কিন ও বৃটিশ বিমান প্রতিটি জার্মান শহর ও বেসামরিক জনপদে বেপরোয়াভাবে বোমাবর্ষণ করলেও অসউইচে বোমাবর্ষণ করেনি। যুদ্ধ থেমে যাবার পর অসউইচ বন্দী শিবিরে বোমাবর্ষণ না করার জন্য মার্কিন সরকার ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। অভিযোগ উঠে যে, বড় বড় আমেরিকান কোম্পানীগুলোর সম্পদ রক্ষার জন্যই মার্কিন বিমান অসউইচে বোমাবর্ষণ করেনি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অসউইচ কমপ্লেক্সে শিল্প-কারখানার অর্ধেক মালিকানা ছিল আমেরিকান কোম্পানীর। হিটলার সরকার কখনো মার্কিন কোম্পানীগুলোর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেনি।

অসউইচ শ্রম শিবির ছিল ইহুদীদের নির্মূল করার একটি বধ্যভূমি- আমেরিকান ও বৃটিশদের এ প্রচারণাকে শানিত করার জন্য সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন জার্মানদের দানবীয় শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। জার্মানদের বিরুদ্ধে রুশদের ক্ষোভের পেছনে ধর্মীয় মনোভাবও কাজ করেছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সংঘটিত বলশেভিক বিপ্লবের অধিকাংশ নেতা ছিলেন ইহুদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ

হওয়ার পর এসব নেতার অনেকেই ছিলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। স্টালিন নিজেও ছিলেন অর্ধ ইহুদী। তাই তারা ইহুদী বিরোধী জার্মানদের মাথায় মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়ে দেন। মিথ্যা হলেও বার বার প্রচার করা হচ্ছিল যে, হিটলার ও তার সহযোগীরা জার্মান নিয়ন্ত্রিত শ্রম শিবিরগুলোতে ৬০ লাখ ইহুদীকে পরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে হত্যা করেছিলেন।

অসউইচ শ্রম শিবিরে ৪০ লাখ ইহুদীকে হত্যা করার দাবি মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব হলে ৬০ লাখ ইহুদী হত্যা করার দাবিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ৪০ লাখ ইহুদীকে যে হত্যা করা হয়নি সে ব্যাপারে অসউইচের বারকেনিউ জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর ও রাষ্ট্রীয় মোহাফেজখানার পরিচালক ড. ফ্রান্সিজেক পাইপারের সাক্ষ্য সর্বাগ্রে বিবেচনার দাবি রাখে। ২০০৫ সালের ২১ জানুয়ারী ভিডিওতে ধারনকৃত এক বিরল সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের হত্যা করার অভিযোগ একটি প্রতারণা। তিনি বলেন, প্রতি বছর হাজার হাজার লোককে অসউইচ শ্রম শিবিরে 'ক্রেমা ওয়ান' নামে নরহত্যার যে গ্যাস চেম্বার দেখানো হয় সেটি নকল এবং জোসেফ স্টালিনের সরাসরি নির্দেশে এ গ্যাস চেম্বার তৈরি করা হয়। তিনি আরো জানান, ১৩ লাখ লোককে অসউইচে আটক রাখা হয়েছিল এবং আটককৃতদের মধ্যে ২ লাখ ২৩ হাজার লোক জীবিত ছিল। মৃতদের মধ্যে ৯ লাখ ৬০ হাজার ছিল ইহুদী, ৭০-৭৫ হাজার পোল, ২৩ হাজার জিপসি ও ১৫ হাজার সোভিয়েত সৈন্য। ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি তরুণ ইহুদী তদন্তকারী ডেভিড কোল ড. পাইপারের এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ইহুদী তরুণ ডেভিড কোল অধিকাংশ আমেরিকানের মতো শৈশব থেকেই জেনে আসছিল যে, অসউইচে গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং ৪০ লাখ ইহুদীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার উপাখ্যান সঠিক ও নির্ভুল। কিন্তু সরকারীভাবে অসউইচ বন্দী শিবিরে নিহতদের সংখ্যা ১১ লাখ বলে উল্লেখ করায় এবং লিউচটার রিপোর্টে গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের হত্যা করার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় কোলের মনোভাব পাল্টে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিজয়ী মিত্রশক্তি নুরেমবার্গ সামরিক আদালতে অসউইচে ৪০ লাখ ইহুদীকে হত্যা করার জন্য জার্মানদের অভিযুক্ত করে। সোভিয়েত সরকারের একটি কমিশনের রিপোর্টে ইহুদীদের হত্যা করার এ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। এ রিপোর্ট পরবর্তীকালে বিনা চ্যালেঞ্জে গ্রহণ করা হয় এবং আমেরিকার বড় বড় দৈনিক ও ম্যাগাজিনগুলোতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকে। এক পর্যায়ে তা কমে এসে দাঁড়ায় সাড়ে ৪ লাখে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসকে অসউইচসহ সকল জার্মান বন্দী শিবির পরিদর্শনের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রেড ক্রস কোথাও গণহত্যার কোনো প্রমাণ দেখতে পায়নি। তখন ইউরোপে বসবাসকারী ৩০ লাখ ইহুদীর বেশীর ভাগই ছিল মুক্ত। ১৯৪৪ সালের মার্চ নাগাদ জার্মান কর্তৃপক্ষ ইহুদীদের ফিলিস্তিন, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে অভিবাসন করার অনুমতি দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মান বন্দী শিবিরে জার্মানদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক রেড

ক্রস তিন ভলিউমের একটি রিপোর্ট তৈরি করে এবং ১৯৪৮ সালে জেনেভায় এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সূত্রের ভিত্তিতে রেড ক্রস অত্যন্ত সততার সঙ্গে এ রিপোর্ট তৈরি করে। রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে, প্রথমদিকে জার্মানরা নিরাপত্তার অজুহাতে বন্দীদের সঙ্গে রেড ক্রসকে সাক্ষাত করতে দিতে অস্বীকার করে। তবে ১৯৪২সালের শেষদিকে রেডক্রস জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে। রেড ক্রস রিপোর্টের তৃতীয় ভলিউমের ৭৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়, ১৯৪২সালের আগস্ট থেকে জার্মানীর বড় বড় বন্দী শিবিরগুলোতে খাদ্য বিতরণে রেড ক্রসকে অনুমতি দেয়া হয় এবং ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে পরবর্তীকালে অন্যান্য সকল শিবির ও কারাগারে রেড ক্রসকে খাদ্য বিতরণের সুযোগ দেয়া হয়। এ সুযোগ পেয়ে রেড ক্রস শিগগির শিবিরের কমান্ড্যান্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং একটি খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী চালু করে। এ কর্মসূচী ১৯৪৫ সালের শেষ মাসগুলোতেও অব্যাহত ছিল। রেড ক্রসের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচীকে অভিনন্দন জানিয়ে ইহুদী বন্দীরা রেড ক্রসের কাছে প্রচুর চিঠি পাঠিয়েছিল। রেড ক্রসের রিপোর্টে যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে জার্মান বন্দী শিবিরে ইহুদী বন্দীদের মৃত্যুর সঠিক কারণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টের তৃতীয় ভলিউমের ৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়, মিত্রবাহিনীর হামলার মুখে যুদ্ধের চূড়ান্ত দিনগুলোতে জার্মানীতে চরম বিশৃংখল পরিস্থিতিতে এসব বন্দী শিবিরে কোনো খাদ্য সরবরাহ ছিল না এবং অনাহারে অধিকাংশ বন্দী মৃত্যু মুখে পতিত হতে থাকে। এতে জার্মান সরকার ভীত হয়ে ১৯৪৫ সালের ১ফেব্রুয়ারী রেড ক্রসকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালের মার্চে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির চেয়ারম্যান ও এসএস জেনারেল কার্লটেনব্রুনারের মধ্যে আলোচনায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, তখন থেকে রেড ক্রস ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করবে। প্রতিটি শিবিরে রেড ক্রসের একজন করে প্রতিনিধি অবস্থানের বিষয়ে উভয়ের মধ্যে ঐকমত্য হয়। তিনটি ভলিউমে তৈরি রিপোর্টে এটাও জোর দিয়ে বলা হয়, আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের প্রতিনিধিরা অক্ষশক্তি নিয়ন্ত্রিত ইউরোপের কোনো শিবিরে ইহুদীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার কোনো প্রমাণ খুঁজে পাননি। রিপোর্টের প্রথম ভলিউমের ২০৪ নং পৃষ্ঠায় ইহুদীদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়, বন্দী শিবিরের ইহুদী ডাক্তারদের জ্বরের চিকিৎসায় পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। ফলে ১৯৪৫ সালে বন্দী শিবিরগুলোতে মহামারী আকারে জ্বর দেখা দিলে তাদের সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এই ছিল ইহুদীদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। কিন্তু এ সত্যতা অস্বীকার করে বার বার দাবি করা হতে থাকে যে, শাওয়ার বা গোসলখানায় পানি ছাড়ার কলের ছদ্মাবরণে গ্যাস চেম্বারে ইহুদী গণহত্যা পরিচালনা করা হয়। রিপোর্টের তৃতীয় ভলিউমের ৫৯৪ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়,' রেড ক্রস প্রতিনিধিরা শুধু কাপড়-চোপড় ধোয়ার জায়গা নয়, সকল গোসলখানা ও শাওয়ার পরিদর্শন করেছেন। কোথাও নোংরা কিংবা অপরিচ্ছন্নতা দেখলে পেলে রেড ক্রস প্রতিনিধিরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তারা কর্তৃপক্ষকে এগুলো সম্প্রসারণ অথবা মেরামতের নির্দেশ দিতেন।'

রেড ক্রসের পরিদর্শন টীম প্রায়ই অসউইচ শ্রম শিবির পরিদর্শন করতো। বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে একান্তে কথা বলার জন্য রেড ক্রস প্রতিনিধিদের অনুমতি দেয়া হতো। শিবির ও রেড ক্রস প্রতিনিধিরা যত্নের সঙ্গে খাদ্য ক্যালোরির পরিমাণ পরীক্ষা করতেন। অসউইচ শ্রম শিবিরের ম্যাটারনিটি ওয়ার্ডে ৩ হাজার শিশুর জন্ম রেকর্ড করা হয়। জার্মান নিয়ন্ত্রিত অসউইচে একটি শিশুরও মৃত্যুর রেকর্ড নেই। তবে এখানে ও অন্যান্য শিবিরে এ সুষ্ঠু পরিবেশের অবনতি ঘটে যুদ্ধের শেষ দিকে মিত্রবাহিনীর অবিরাম বোমাবর্ষণে জার্মানীর রেল ও পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে। মহামারি আকারে জ্বর ছড়িয়ে পড়ায় হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়। মৃত লোকদের সমাহিত করা হতো। কিন্তু ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত হওয়ায় জার্মান স্টাফরা সংক্রমণের শিকার হয়। মহামারি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যারা মারা যায় তাদের মধ্যে শিবিরের কমান্ড্যান্টের স্ত্রীও ছিল। জরুরী পরিস্থিতিতে মৃতদেহের সৎকারে বিকল্প হিসেবে চুল্লী তৈরি করা হয়। শিবিরের বন্দী শ্রমিকরাই এসব চুল্লী তৈরি করেছিল। চুল্লীতে আশপাশের মৃত পোলদের লাশও পোড়ানো হতো। শিবিরের ডাক বাক্স সপ্তাহে দু'বার খালি করা হতো। বন্দীদের কাছে চিঠি আসতো। বন্দীরাও বাইরে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে নিয়মিত চিঠি লিখতো। কাউকে গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করার মতো ঘটনা ঘটলে বন্দীদের বাইরে চিঠি লিখার অনুমতি দেয়া হতো না। একথা প্রত্যেকেই জানে যে, ১৯৪১ সালে জার্মান অধিকৃত পোল্যান্ডে ৬০ লাখ ইহুদী ছিল না। আমেরিকান জিউইশ ইয়ার বুকে তাদের সংখ্যা ৩৩ লাখ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অধিকাংশ ইহুদী পাশ্চাত্য, স্পেন অথবা ইংল্যান্ডে পলায়ন করে। তথাকথিত 'শোয়া' কালে (হীব্রু শব্দ যার অর্থ দুর্যোগ) হিটলার ট্রাকের সঙ্গে অবশিষ্ট ১০ লাখ ইহুদীকে বিনিময় করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। একথাও সবাই জানে যে, যাকলোন বি নামে কোনো বিষের অস্তিত্ব ছিল না। অথচ নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে জার্মান ড. ক্রনো টেসকে অসউইচ শ্রম শিবিরে বিষ সরবরাহ করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, নাৎসীরা গ্যাস চেম্বারে বিষ ব্যবহার করে একসঙ্গে ১ থেকে ২ হাজার লোককে হত্যা করে। ড. ক্রনো ছিলেন একটি কোম্পানীর অংশীদার। তার কোম্পানী উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যাকলোন বি ক্রয় করে সেগুলো অসউইচ শ্রম শিবিরের কর্তৃপক্ষের কাছে সরবরাহ করতো। এটি ছিল কীটনাশক ওষুধ। 'যাকলোন বি, অসউইচ এন্ড দা ট্রায়াল অব ড. ক্রনো' শিরোনামে পরলোকগত প্রখ্যাত মার্কিন রসায়নবিদ উইলিয়াম লিভসের লেখা একটি নিবন্ধে প্রমাণ করা হয়, যাকলোন বি মনুষ্য শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং ছিল উপকারী। অসউইচ শ্রম শিবিরে আটক বন্দী এবং এ শিবির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত এসএস সদস্যদের উকুন মুক্ত রাখতে, তাদের কাপড়-চোপড় ও শয্যার স্থান ধোয়ামোছা করতে যাকলোন বি ব্যবহার করা হতো। রসায়নবিদ লিভসে নুরেমবার্গ আদালতে ড. ক্রনোর বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো পরীক্ষা দেখেছেন যে, সেগুলো ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ত্রুটিপূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নিরপরাধ ড. ক্রনোকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। কি দুর্ভাগ্য ড. ক্রনোর!

ইউরোপের সকল ইহুদীকে বন্দী করা হয়নি। কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে তারা ছিল মুক্ত। ইউরোপে বসবাসকারী ৩০ লাখ ইহুদীর বেশীর ভাগ যে শুধু মুক্ত ছিল তাই নয়, পুরো যুদ্ধকালে তাদের অভিবাসন ছিল অব্যাহত। কোথাও কোথাও যুদ্ধের পর জার্মান অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে ইহুদীদের অভিবাসনের অনুমতি দেয়া হয়। যেমনটি ঘটেছিল পোল্যান্ড দখলের আগে পোলিশ ইহুদীদের ফ্রান্সে অভিবাসন করার সুযোগ দান। রেড ক্রস রিপোর্টের প্রথম ভলিউমের ৬৪৫ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়, ফ্রান্সে অবস্থানরত পোলিশ ইহুদীরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পায় এবং জার্মান দখলদার কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আমেরিকান নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর কন্স্যুলেট ইহুদীদের যে ৩ হাজার পাসপোর্ট ইস্যু করেছিল জার্মান কর্তৃপক্ষ সেগুলোর বৈধতা স্বীকার করে নিতে রাজি হয়।'

আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ট্রেসিং সার্ভিসের কাছে রক্ষিত দলিলপত্রে জানা যায় যে, অসউইচ শ্রম শিবিরে ১ লাখ ৩৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেসিং সার্ভিসের সংরক্ষিত দলিলপত্রের মধ্যে মৃতদের তালিকাসহ সকল বন্দীর দৈনিক দু'বার নাম ডাকার পরিসংখ্যান রয়েছে। অসউইচ বন্দী শিবিরে রক্ষিত মৃত লোকদের তালিকা থেকে ১ লাখ ৩৫ হাজার বন্দীর মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া যায়। মৃত লোকদের তালিকা তৈরি করা হয় যুদ্ধকালে জার্মান বন্দী শিবিরে। যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে সোভিয়েতরা এসব তালিকা উদ্ধার করলেও তারা সেগুলো প্রকাশ করেনি। এসব তালিকা জাতীয় মোহাফেজখানায় গোপন করে রাখা হয়। ১৯৮৯ সালে রেড ক্রসের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এসব গোপন তালিকা হস্তান্তর করে। অসউইচ শ্রম শিবিরে মৃত ব্যক্তিদের সংরক্ষিত তালিকায় ৬৯ হাজার লোকের মৃত্যুর সার্টিফিকেট রয়েছে। মৃতদের মধ্যে ৩০ হাজার ছিল ইহুদী। যুদ্ধকালে বিভিন্ন বন্দী শিবিরে সংরক্ষিত তালিকা থেকে জানা যায়, জার্মান বন্দী শিবিরে ৪ থেকে ৫ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, অসউইচ শ্রম শিবিরের নাম ফলকে ক্রমান্বয়ে মৃতের সংখ্যা কমছে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত রক্ষিত নাম ফলকে নিহতের সংখ্যা ছিল ৪০ লাখ। পরে দ্বিতীয় বার সেখানে যে নামফলক তৈরি করা হয় তাতে নিহতদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়ে ১৫ লাখে এসে দাঁড়ায়।

হলোকাস্ট গবেষণা সংক্রান্ত সাইমন বিসেন্থাল সেন্টারের ডীন ও ক্যালিফোর্নিয়ার রিপাবলিকান গভর্নর বলিউডের একসময়ের সাড়া জাগানো অভিনেতা আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের উপদেষ্টা রাব্বি মারভিন হেয়ার বলেছেন, ডাকাউ বন্দী শিবিরে কোনো গ্যাস চেম্বার ছিল না। অন্যদিকে, অসউইচ রাষ্ট্রীয় মোহাফেজখানা ৪০ লাখ আদম সন্তান নিহত হওয়ার অর্ধ শতাব্দী পুরনো দাবি সংশোধন করে বলছে যে, ১০ লাখ লোক নিহত হয়েছে। তবে অসউইচ মোহাফেজখানার এ দাবির স্বপক্ষেও কোনো প্রমাণ নেই। অসউইচ জাদুঘরে পাথরে খোদাই করে ৪০ লাখ লোকের নাম লিখা ছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে লাখ লাখ পর্যটক এসব নাম দেখেছে। পরে ২০০৫ সালে জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে জাদুঘর থেকে এ নামফলক অপসারণ করা হয়।

শ্রমিকদের নতুন করে ১০ লাখ লোকের নাম লিখার নির্দেশ দেয়া হয়। তার মানে হচ্ছে, অসউইচ কমপ্লেক্সে ৪৫ বছর ৩০ লাখ ভুয়া নাম পাথরে খোদাই করে রাখা হয়েছিল। নতুন করে আবার ইতিহাস লিখতে হচ্ছে। ধীরে ধীরে সত্য তার নিজের জায়গা করে নিচ্ছে।

জার্মান বন্দী শিবিরগুলো মুক্ত হওয়ার পর আমেরিকান ও বৃটিশরা ডাকাউ, বুচেনওয়াল্ড ও বারজেন-বালসেন বন্দী শিবিরের লোমহর্ষক ছবি তোলে। এসব ছবি বিশ্ববাসী দীর্ঘদিন দেখেছে। যুদ্ধের শেষ মাসগুলোতে সোভিয়েত বাহিনী পূর্ব দিক থেকে জার্মানীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। বৃটিশ ও আমেরিকান বিমানগুলো বিরামহীন গতিতে বোমাবর্ষণ করে জার্মানীর সব শহর ও জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিচ্ছিল। তাদের বোমাবর্ষণে পরিবহন, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা ও পয়ঃপ্রণালী পরিসেবা ভেঙ্গে পড়ে। এটাই ছিল বোমাবর্ষণের লক্ষ্য। মিত্রবাহিনীর এ বর্বর হামলাকে মোঙ্গল হামলার পর ইউরোপে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সোভিয়েত অগ্রাভিযানে লাখ লাখ শরণার্থী জার্মানীতে পালিয়ে আসে। পূর্বাঞ্চলীয় শিবিরগুলো থেকে পালিয়ে আসা বন্দীতে জার্মান নিয়ন্ত্রিত অবশিষ্ট শিবিরগুলো বোঝাই হয়ে উঠে। ফলে ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে শিবিরে বন্দীদের পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। মহামারী আকারে জ্বর, টাইফয়েড,আমাশয় ও ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। মিত্রবাহিনী জার্মান বিরোধী অপপ্রচার চালিয়ে এ মানবিক দুর্যোগকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে স্বার্থকভাবে ব্যবহার করে। স্বাভাবিক রোগে মৃতদের ছবি তুলে প্রচার করা হয় যে, গ্যাস চেম্বারে এদের হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। বুচেনওয়াল্ড, ডাকাউ ও বারজেন-বালসেন বন্দী শিবির থেকে হাজার হাজার সুস্থ বন্দীকে উদ্ধার করা হয়। মৃতদের ছবি তোলার সময় তারাও শিবিরেই অবস্থান করছিল। গৃহীত আলোকচিত্রে তাদেরকে শিবিরের রাস্তায় হাঁটাহাটি করতে এবং কথাবার্তা বলতে দেখা গেছে। বন্দীরা ছিল উৎফুল্ল এবং তারা তাদের ত্রাণকর্তাদের স্বাগত জানাতে মাথার ক্যাপ শূন্যে ছুঁড়ে মারে।

হলোকাস্টে নিহত ইহুদীদের স্মরণে ইসরাইলে নির্মিত স্মৃতিসৌধ ইয়াদ ভাসেমের মোহাফেজখানার পরিচালক স্যামুয়েল ক্রাকোভস্কি বলেছেন, কেবলমাত্র ইয়াদ ভাসেমেই ইহুদীদের বিরুদ্ধে জার্মান নৃশংসতার ১০ সহস্রাধিক 'সাক্ষী' ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে। তিনি পোলিশ কর্তৃপক্ষের তরফে প্রকাশিত নয়া পরিসংখ্যানকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করে বলেন, শিবিরের নাৎসী কমান্ডার ক্যাপ্টেন রুডলফ হোয়েসের মুখ ফসকে ৪০ লাখ সংখ্যাটি বের হওয়ার পর অনেকেই তা লুফে নেয় এবং অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করে।

এভিলিন লী চেনি ছিলেন জার্মানীর মাউথাউসেন শ্রম শিবিরের একজন সাবেক বাসিন্দা। মাউথাউসেন শ্রম শিবিরের উপর গবেষণা কাজ চালাতে গিয়ে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, ১৯৪৫ সালের মে মাসে মুক্তির সময় ওই শিবিরে ৬৪ হাজার বন্দী ছিল। ১৯৮৩ সালে ইউএসএ টুডে'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মাউথাউসেন তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন,' আমি ছিলাম ওই শিবিরের দেড় লাখ

বন্দীর ৩৪ জন জীবিতদের একজন।' গ্যাস চেম্বারে বন্দীদের হত্যা করার অভিযোগ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, 'এটা একটা জঘন্য মিথ্যা।' এনসাইক্লোপিডিয়া জুডাইকার মতে, মাউথাউসেন শ্রম শিবিরে কমপক্ষে ২ লাখ ১২ হাজার বাসিন্দা জীবিত ছিল। সাইমন বিসেন্থাল ছিলেন এ শিবিরের আরেকজন সাবেক বন্দী। ১৯৭৫ সালে একবার এবং ১৯৯৩ সালে আরো একবার প্রকাশ্যে তিনি স্বীকার করেছেন, জার্মান ভূখণ্ডে কোনো গ্যাস চেম্বার ছিল না। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এটাও বলেছেন, বুচেনওয়াল্ড, ডাকাউ এবং জার্মানীর মূল ভূখণ্ডে অন্যান্য বন্দী শিবিরগুলো বধ্যভূমি ছিল বলে যুদ্ধ-পরবর্তী নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল ও পরবর্তীকালে যে দাবি করা হয় সেগুলো সঠিক নয়। থিয়েস ক্রিস্টোফারসেনও একই কথা বলেছেন। ক্রিস্টোফারসেন ছিলেন একজন কৃষিবিদ ও বিজ্ঞানী। যুদ্ধকালে তাকে সিনথেটিক রাবার উৎপাদনের গবেষণা চালাতে অসউইচ শ্রম শিবিরে পাঠানো হয়। তবে বন্দী হিসেবে নয়। তিনি বন্দীদের প্রাত্যহিক জীবন দেখেছেন। তাদের পাশাপাশি তিনি অবস্থান করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি অসউইচ শ্রম শিবিরে গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের হত্যা করার কথা শুনতে পেয়ে বিস্মিত হন। মিথ্যাচারের প্রতিবাদে একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি 'দি অসউইচ লাই' বা অসউইচ মিথ্যাচার শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখতে বাধ্য হন। ১৯৭৩ সালে জার্মানীতে তার এ নিবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হলে অনেকের চোখ কপালে উঠে।

অন্যদিকে, ইহুদী হলোকাস্ট সম্পর্কে মিথ্যা দাবিদারদের একজন হলেন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী এলি ভিসেল। ১৯৫৬ সালে এডিশ নামে একটি দৈনিকে নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ প্রকাশকালে তিনি দাবি করেন যে, জার্মান বন্দী শিবিরে ইহুদীদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হতো। এ মিথ্যাচারই ছিল হলোকাস্ট শব্দের উৎপত্তি। পরবর্তীকালে কোনো ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেননি যে, ইহুদীদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হতো। ফুটন্ত পানি এবং বৈদ্যুতিক শক দিয়ে ইহুদীদের হত্যা করার অলীক কাহিনীও একসময় উধাও হয়ে যায়। পরে বহাল থেকে যায় কেবল গ্যাস ব্যবহার করে হত্যা করার মিথ্যাচার। গ্যাস প্রয়োগে ইহুদীদের হত্যা করার মিথ্যাচার প্রচার করেছিল আমেরিকানরা এবং ট্রেবলিঙ্কাসহ আরো কয়েকটি বন্দী শিবিরে ফুটন্ত পানিতে হত্যাকাণ্ড চালানোর মিথ্যাচার প্রচার করেছিল পোলরা। একইভাবে সোভিয়েতরা প্রচার করেছিল বৈদ্যুতিক শক দিয়ে হত্যার কাহিনী। ইহুদীদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার মিথ্যাচারের জন্ম কিভাবে হয়েছিল তা অস্পষ্ট। জার্মান শ্রম শিবিরের সাবেক বাসিন্দা এলি ভিসেল এডিশে প্রকাশিত তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে 'নাইট' নামে আত্মজীবনীমূলক একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, অসউইচ শ্রম শিবিরে বয়স্কদের জন্য একটি এবং শিশুদের জন্য আরেকটি ফুটন্ত পানির খাদ ছিল। তিনি সকল বন্দীকে দৈনিক তিন বার শাওয়ারে গোসল করার জন্য জার্মানদের নির্দেশ দেয়ার অভিযোগও করেছিলেন।

কত মিথ্যা কথাই না বলেছিলেন ভিসেল! তার উক্তি মিথ্যা প্রমাণ করা মোটেও কষ্টকর নয়। তিনি ও তার পিতা উভয়েই ছিলেন জার্মান বন্দী শিবিরের বাসিন্দা। যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে তাদের সামনে বিকল্প ছিল দু'টি। এক, পশ্চাদপরণকারী 'ঘাতক'

জার্মানদের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া। দুই, 'মুক্তিদাতা' সোভিয়েত সৈন্যদের অপেক্ষায় শিবিরে অবস্থান করা। কিন্তু পিতা ও পুত্র উভয়ে তাদের আটককারী জার্মানদের সঙ্গেই পালিয়ে যান।

বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টেও জার্মান বন্দী শিবিরে কথিত গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের হত্যা করার দাবি অসার বলে প্রমাণিত হয়। টরেন্টো স্টারে প্রকাশিত এক রিপোর্টে ১৯৪২ সালে অসউইচে আটক মারিয়া ভানহারওয়ারডেন নামে এক ইহুদী মহিলা বলেন, একজন জিপসি মহিলা তাকে জানান যে, বন্দী শিবিরে পৌঁছা মাত্র তাদের সকলকে শাওয়ারে গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করা হবে। ট্রেন থেকে নামার পর মারিয়া ও অন্যান্যদের শাওয়ারে গোসল করার নির্দেশ দেয়া হয়। তখন জিপসি মহিলার কথা অনুযায়ী মারিয়া বিশ্বাস করতে থাকেন যে, তার মৃত্যু অবধারিত। নির্দেশ অনুযায়ী তিনি গোসল করতে যান। কিন্তু শাওয়ারের মুখ দিয়ে গ্যাস বের হওয়ার পরিবর্তে কেবল পানি ঝরতে থাকে। বন্দীদশা থেকে মুক্ত হওয়ার ৪৩ বছর পর ১৯৮৮ সালে টরেন্টো ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে সাক্ষ্যদানকালে তিনি তার এ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন।

অভিযোগ করা হয় যে, ১৯৪৪ সালে অসউইচে জার্মান শ্রম শিবিরে গ্যাস চেম্বারে প্রতিদিন ২৫ হাজার বন্দীকে হত্যা করা হতো। এ অভিযোগ ছিল বানোয়াট। ইহুদী মহিলা মারিয়া ফ্রাঙ্কের সাক্ষ্যে তা প্রমাণিত হয়। 'ভয়েসেস ফ্রম দ্য হলোকাস্ট' অর্থাৎ হলোকাস্টে নিহতদের জবানবন্দি নামে একটি বইয়ে মারিয়া ফ্রাঙ্কের সাক্ষ্য স্থান পায়। তিনি তার সাক্ষ্যে অসউইচ শ্রম শিবিরে গ্যাস চেম্বারের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২০০৪ সালের ৭ জুলাই প্রকাশিত কার্লোস ডব্লিউ পোর্টার 'মেড ইন রাশিয়া' অর্থাৎ রাশিয়ায় তৈরি শিরোনামে একটি নিবন্ধে লিখেছেন, 'রহস্য হচ্ছে এটাই যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে আজগুবি অভিযোগ চাপিয়ে দিয়ে প্রকৃত ঘাতকরা তাদের অপরাধ আড়াল করতে সক্ষম হয়।' তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, 'নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে ৬০ লাখ ইহুদী হত্যার অভিযোগসহ আরো কত অভিযোগে জার্মানদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল সে ইতিহাস ক'জন জানে?' তিনি বলেন, 'অসউইচ শ্রম শিবিরের কাছে আণবিক বোমা মেরে ২০ হাজার ইহুদীকে উড়িয়ে দেয়া, সাচেনহাউজেন বন্দী শিবিরে এক মাসে প্যাডেল চালিত মস্তক বিদীর্ণকারী এক ধরনের যন্ত্র দিয়ে ৮ লাখ ৪০ হাজার রুশ যুদ্ধবন্দীকে হত্যা, পরে রুশদের মৃতদেহ ভ্রাম্যমান চুল্লীতে দাহ করে ফেলা, ইহুদীদের হত্যা করে তাদের মৃতদেহ দিয়ে স্যুপ, হাতব্যাগ, হাতের দস্তানা, ঘোড়ার জীন, ট্রাউজার, পায়ের স্যান্ডেল তৈরি করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।' তিনি আরো উল্লেখ করেন, 'বগলের নীচের চুল থেকে শুরু করে নোংরা আন্ডারপ্যান্ট কেড়ে নিতে যুদ্ধবন্দী ও শ্রম শিবিরের শ্রমিকদের হত্যা করার অভিযোগও জার্মানদের বিরুদ্ধে আনা হয়।'

আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্যই হলোকাস্টের আজগুবি গল্প তৈরি করা হয়। মার্কিন অধ্যাপক নরম্যান ফিঙ্কেলস্টেইন তার 'দা হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি' শিরোনামে এক নিবন্ধে মিথ্যাচার ও উদগ্র লালসা পূরণে হলোকাস্টকে ব্যবহার করার জন্য ইহুদীদের অভিযুক্ত করেছেন। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন, হলোকাস্টের

নিষ্ঠুর শিল্পায়ন ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীবিরোধী মনোভাবের পুনরুজ্জীবনকে উৎসাহিত করছে। ওয়ারশর ইহুদী পল্লী ও শ্রম শিবিরের এক জীবিত ব্যক্তির সন্তান অধ্যাপক ফিঙ্কেলস্টেইন আরো বলেছেন, 'আমি আমার পরিবারের উপর নির্যাতনের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু 'অসহায়' হলোকাস্ট ভিক্টমদের নামে ইউরোপের কাছ থেকে অর্থ উপার্জনের উদ্যোগে তাদের আত্মদানের নৈতিক মযার্দা নীচে নেমে যায় এবং এ ধরনের অর্থোপার্জন জুয়ার আসর থেকে অর্থোপার্জনের শামিল। 'হোয়াই ইজ দা হলোকাস্ট ইম্পোর্ট্যান্ট' নামে একটি পুস্তকে উইলিস এ, কার্ট মন্তব্য করেছেন, ইসরাইলের জন্য জার্মান ও আমেরিকান করদাতাদের শত শত কোটি ডলার হাতিয়ে নেয়া ছাড়াও তেলআবিবের সুবিধাজনক পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করতে হলোকাস্টকে একটি অত্যন্ত কার্যকর রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

যুদ্ধকালে নির্দোষ ইহুদীদের শ্রম শিবিরে পাঠানোই ছিল মানবিক সমস্যার মূল কারণ। শ্রম শিবিরে পাঠানো না হলে মহামারি তাদেরকে কখনো স্পর্শ করতে পারতো না এবং তাদের মৃত্যু নিয়ে কারো নোংরা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের সুযোগও হতো না। এজন্য হিটলার অবশ্যই দায়ী। তবে এটাও মনে রাখা উচিত, ইহুদীদের জন্য যারা অশ্রুবর্ষণ করেন তাদের অপরাধের মাত্রা হিটলারের চেয়ে কম নয় বরং বেশী। পোল্যান্ডসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ দখল করে নিরাপত্তার স্বার্থে হিটলার ইহুদীদের বাধ্যতামূলক শ্রম শিবিরে নির্বাসনে পাঠানোর যে অমানবিক নীতি অনুসরণ করেছিলেন সেক্ষেত্রে সোভিয়েতরা ছিল তার আদর্শ। সোভিয়েত ইউনিয়ন গুলাগ শ্রম শিবিরে লাখ লাখ লোককে নির্বাসনে না পাঠালে এ ধরনের নীতি অনুসরণে অন্যান্যরা উৎসাহিত হতো কিনা সন্দেহ। নাৎসী জার্মানরা পরিচালনা করেছে মাত্র কয়েক ডজন শ্রম শিবির। অন্যদিকে, সোভিয়েত কমিউনিস্টরা পরিচালনা করেছে ৪৭৬ টি। এসব শিবিরে কতজন মারা গেছে তার কোনো লেখাজোখা নেই। ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা ছিল স্টালিনের অত্যন্ত পছন্দ। ১৯২৯ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট বিরোধী ১ কোটি ৮০ লাখ লোককে নির্বাসনে পাঠানো হয়। সাইবেরিয়ার মৃত্যুকূপ থেকে তাদের কেউ ফিরে আসেনি। অন্যদিকে, ইহুদী কার্ল মার্কসের মস্তিষ্ক প্রসূত মতবাদ কমিউনিজম কায়েমে মার্কসবাদীদের হাতে বিশ্বে ২০কোটি মানুষ খুন হয়েছে। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি এবং জার্মানীর ড্রেসডেনে মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণও ছিল মানবতার বিরুদ্ধে একটি জঘণ্য অপরাধ। নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া উচিত ছিল। তাহলে কারো প্রশ্ন থাকতো না।

হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষের পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে কোনো আলোচনায় হিটলারকে প্রচণ্ড ইহুদী বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যেন তখনকার বিশ্বে তিনিই ছিলেন একমাত্র ইহুদী বিরোধী এবং তার আমলে জার্মানী ছাড়া আর কোথাও ইহুদী বিরোধী মানসিকতা ছিল না। এ রকম ধারণা মোটেও সঠিক নয়। সমকালীন ও তার পূর্ববর্তী ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে, শুধু নাৎসী আমলে জার্মানী নয়, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিককালের প্রতিটি স্তরে ইউরোপ ও আরব অঞ্চলসহ পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও ভূখণ্ডে ইহুদী বিদ্বেষ সক্রিয় ছিল এবং এখনো তা ক্রিয়াশীল। হিটলার ব্যক্তিগতভাবে খ্রীস্টান হলেও তার ইহুদী বিরোধী মানসিকতার জন্য ধর্মীয় মনোভাব দায়ী নয়। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ভালোবাসাই ছিল তার ইহুদী বিরোধী মানসিকতার জন্য দায়ী।

প্রথম মহাযুদ্ধের একজন সৈনিক হিসেবে তিনি যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় মেনে নিতে পারেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশগ্রহণ করায় যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে টেনে এনেছিল ইহুদীরাই। ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণায় ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। বেলফোর ঘোষণার আগে বৃটিশ সরকার ও ইহুদী ধনকুবের স্যার রথচাইও একটি দ্বিপক্ষীয় সমঝোতায় পৌঁছায়। যুদ্ধে আর্থিক টানাটানি শুরু হলে বৃটিশ সরকার রথচাইল্ডের কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায়। রথচাইল্ড রাজি হন। তবে শর্ত দেন যে, যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে আনতে হবে। বৃটিশ সরকার কথা দেয়। রথচাইল্ডকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে বৃটিশ সরকার মার্কিন সরকারকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে প্ররোচিত করতে থাকে। বৃটিশদের প্ররোচনায় যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় জার্মানী কোণঠাসা হতে থাকে। বিপর্যয়ের মুখে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহের মূলে ছিল ইহুদী অফিসাররা। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বিশ্বের প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় মিত্র দেশগুলোর পক্ষ নেয়ায় কাইজারের জার্মানী পরাজিত হয়। চারদিকে হাহাকার রব উঠে। ঘরে ঘরে বিলাপ,হতাশা। শুরু হয় যুদ্ধে পরাজয়ের হিসাব- নিকাশ। তখন ইহুদী ছাড়া জার্মানরা আর কাউকে দায়ী করতে পারছিল না। হিটলারের হিসাবও ছিল একই। তিনি জাতির মনোভাবের অনুকূলে অবস্থান নেন এবং ইহুদী বিরোধী নাৎসী দলে যোগদান করেন। তখনকার জার্মানী ও ইউরোপে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তার পক্ষে ইহুদী বিরোধী হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। আলোচনা করলে দেখা যাবে, ইহুদীদের প্রতি হিটলার যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন সেগুলো ছিল অতি পুরনো এবং ইউরোপের দেশে দেশে প্রচলিত। সে সময় ইউরোপে এমন কোনো দেশ ছিল না যেখানে ইহুদীরা লাঞ্ছিত হয়নি।

মধ্য যুগে ইহুদী বিদ্বেষের মূলে ছিল ধর্ম। যীশু খ্রীস্টের হত্যাকান্ডের জন্য ইউরোপের রোমান ক্যাথলিকরা সমষ্টিগতভাবে ইহুদীদের দায়ী করতো। 'বোস্টন কলেজ গাইড টু প্যাসন' নামে একটি ধর্মীয় পুস্তকে বলা হয়, 'সময়ের পরিক্রমায় খ্রীস্টানরা এ সত্য অনুধাবন করে যে, গোটা ইহুদী জাতি যীশুর হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী।' এ পুস্তকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যীশুর হত্যাকাণ্ডের সময় যেসব ইহুদী শেষ নৈশভোজে উপস্থিত ছিল এবং পরবর্তীতে ইহুদী ধর্মে যাদের জন্ম হয়েছে সম্মিলিতভাবে সবাই যীশু খ্রীস্টের হত্যাকাণ্ডের জন্য সমানভাবে দায়ী। ধর্মের এ চেতনা থেকেই রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে ইহুদী বিদ্বেষ জন্ম নেয়। এ চেতনা থেকেই তারা তাদের হত্যা করেছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে ১৯শ' বছর এ ধর্মীয় ধারণা বিদ্যমান ছিল। পঞ্চম পোপ পল ১৯৬৪ সালে যীশু খ্রীস্টের হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে ইহুদীদের অব্যাহতি দিয়ে একটি ধর্মীয় ডিক্রি জারি করেন। তারপর থেকে ইহুদীরা নিরাপদ হয়। কিন্তু তার আগে তারা কোথাও নিরাপদ ছিল না।

প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও হেলেনিক সভ্যতায়ও ইহুদী বিদ্বেষের অস্তিত্ব ছিল। ইহুদীদের গ্রীক সভ্যতার মূল ধারায় ফিরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু ইহুদীরা নিজেরাই এ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। ইহুদীদের ধর্মীয় আচার-আচরণ বিদ্যমান ও প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির পরিপন্থী বলে গণ্য হওয়ায় তারা এক ঘরে যায়। ইচ্ছানুযায়ী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে ইহুদীরা পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করতে চাইতো। সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের ভাগ্য বরাবরই শাসকদের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। ৪৩৮ সালে দ্বিতীয় থিওডসিয়াস দ্বিতীয় আচরণবিধিতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে একমাত্র বৈধ ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদী বিদ্বেষ আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এক শতাব্দী পরে জাস্টিনীয় আচরণবিধিতে ইহুদীদের বহু অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে চার্চ পরিষদ ইহুদীদের উপর আরো কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপ করে। ক্যাথলিক মহিলাদের উপর নির্দেশ জারি করা হয় যে, কোনো ইহুদী খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত না হলে তাকে বিয়ে করা যাবে না। আরো নির্দেশ জারি করা হয়, ইহুদীরা খ্রীস্টান উপপত্নী রাখতে পারবে না। ৫৮৯ সালে ক্যাথলিক গ্রীসে তৃতীয় টলেডো পরিষদ শক্তি প্রয়োগে খ্রীস্টান ও ইহুদী দম্পতির সন্তানদের খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার নির্দেশ দেয়। এ নির্দেশ কার্যকর হলে হাজার হাজার ইহুদী হয়তো পালিয়ে যায় নয়তো খ্রীস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়।

ইহুদীরা খ্রীস্টানদের তাদের জাতশত্রু বলে মনে করতো। একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা করতো। তবে সংখ্যালঘু হিসেবে ইহুদীদের সুযোগ ছিল সীমিত। তাই তারা চক্রান্ত ও নাশকতার আশ্রয় নিতো। চতুর্দশ শতাব্দীতে প্লেগে ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ (৩ কোটি ৪০ লাখ) লোক মারা যায়। প্লেগের উৎসের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরা পড়ে যে, ইহুদীরাই প্লেগের জীবাণু ছড়িয়েছে। আজিমেত নামে এক ইহুদী স্বীকারোক্তি করে যে, জেনেভার কাছে চেম্বারির রাবাই পেইরেত তাকে ভেনিস, টুলু ও অন্যান্য এলাকার কূপে প্লেগের জীবাণু ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তার স্বীকারোক্তির পর ১৩৪৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী স্ট্রাসবুর্গে ইহুদীদের জীবন্ত পুড়িয়ে

হত্যা করা হয়। (সূত্র, জিউশঃ দ্য এসেন্স এন্ড ক্যারেক্টার অব এ পিপলঃ বাই আর্থার হারৎবার্গ এন্ড এ্যারন হার্ট–পৃষ্ঠা ঃ ৮৪)

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, শাসক ও চার্চ মাঝে মাঝে অধিকাংশ পেশায় ইহুদীদের নিযুক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতো। সামাজিকভাবে নিকৃষ্ট পেশা অবলম্বনে তাদের বাধ্য করা হতো। যেমন- কর ও ভাড়া আদায় এবং অর্থলগ্নি। ক্যাথলিক ধর্মে তখন এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, সুদের বিনিময়ে অর্থলগ্নি করা পাপ। ক্যাথলিকরা বিধিনিষেধের এ বেড়াজালে আটকে পড়ায় ইহুদীরা একচেটিয়া অর্থলগ্নি করার সুযোগ পায়। ঋণদাতাদের সবাই ছিল ইহুদী এবং ঋণগ্রহীতারা খ্রীস্টান। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঋণ সংক্রান্ত বিরোধে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। জোর করে কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করায় খ্রীস্টানরা ভাবতে শুরু করে যে, ইহুদীরা তাদের উপার্জন কেড়ে নিচ্ছে।

দ্বাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত খ্রীস্টানরা বিশ্বাস করতো, ইহুদীরা ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারী। তারা আরো বিশ্বাস করতো, শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করে তারা ঐন্দ্রজালিক শক্তি অর্জন করেছে। যীশু খ্রীস্টের নৈশভোজের সঙ্গে মস্করা করতে ইহুদীরা খ্রীস্টান শিশুদের রক্তপান করতো। কৈশোরে পদার্পণ করেনি এমন বয়সের শিশুদের অপহরণ করে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার উপর নির্যাতন চালানো হতো। কখনো কখনো ইহুদী গীর্জা বা সিনাগগের সামনেও খ্রীস্টান শিশুদের রক্ত পান করা হতো। এ দৃশ্য দেখার জন্য লোকজন সমবেত হতো। প্রথমেই শিশুটির বিচারে একটি ভুয়া আদালত বসানো হতো। হাত পা বেঁধে শিশুটিকে আদালতের সামনে হাজির করা হতো। আদালত শিশুটির মৃত্যুদণ্ডের রায় দিতো। শিশুটির মাথায় কন্টক মুকুট পরিয়ে কাঠের ক্রুশে তার দু'হাত বিদ্ধ করা হতো। ক্রুশ উত্তোলন করা হলে শিশুটির ক্ষত স্থান থেকে ফোটায় ফোটায় রক্তে গড়িয়ে পড়তো এবং এসব রক্ত কোনো পাত্র বা গ্লাসে সংগ্রহ করা হতো। পরে হৃদপিণ্ড বরাবর বর্শা, তরবারী অথবা ছোরা মেরে শিশুটিকে হত্যা করা হতো। ক্রুশ থেকে শিশুর মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে কোথাও লুকিয়ে ফেলা হতো অথবা মাটি চাপা দেয়া হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাশের উপর যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করা হতো।

ইহুদীরা কত খ্রীস্টান শিশুকে হত্যা করে তাদের রক্তপান করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তবে কয়েকটি ঘটনা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছে। একটি ঘটনা হচ্ছে ১১৪৪ সালে ইংল্যান্ডের নরউইচের উইলিয়ামকে অপহরণের ঘটনা। একজন খ্রীস্টান পাদ্রী সাক্ষ্য দেন যে, ইহুদী যাজকদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে তাকে হত্যা করা হয়। ইহুদীদের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের শিকার উইলিয়ামকে খ্রীস্টানরা শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে এবং তাকে নরউইচের যাজক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আরেকজন ইংরেজ বালক লিটল সেন্ট হিউ অব লিংকনের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ জানা যায়, ক্রুশ থেকে তার লাশ সরিয়ে রক্ত সংগ্রহের জন্য একটি টেবিলের উপর রাখা হয়। শুধু তাই নয়, তার পেট চিরে নাড়িভুড়ি বের করে ফেলা হয়। ১২৫৫ সালের ৩১ জুলাই লিটল সেন্ট হিউ নিখোঁজ হয় এবং ২৯ আগস্ট একটি কূপে তার মৃতদেহ পাওয়া

যায়। স্থানীয় ইহুদী কোপিন তাকে হত্যা করার কথা স্বীকার করে। কোপিন তার স্বীকারোক্তিতে জানায়, প্রতি বছর ইহুদীদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী একটি খ্রীস্টান বালককে ক্রুশবিদ্ধ করতে হয়। সেন্ট হিউর হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে কোপিনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ১৪৭৫ সালের ২১ মার্চ ইতালীর ট্রেন্টো শহরে আড়াই বছরের শিশু সাইমন নিখোঁজ হয়। সন্দেহ হওয়ায় ইহুদীদের গ্রেফতার করা হলে ১৭ জন দোষ স্বীকার করে। হত্যার দায়িত্ব স্বীকার করায় তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। হত্যাকারীরা জানায় যে, রক্ত সংগ্রহের জন্য সাইমনের লাশ একটি বিরাট বাটিতে রাখা হয়। শিশু সাইমন নির্মমভাবে নিহত হওয়ায় ইহুদীদের উপর প্রতিশোধমূলক হামলা চালানো হয়। তাকে যাজকের মর্যাদায় আসীন করা হয় এবং ১৫৮৮ সালে পোপ সিক্সটাস তাকে পুণ্যাত্মা হিসেবে ঘোষণা করেন।

মধ্য যুগে ইহুদীদের উপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দী নাগাদ সে সব নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। খ্রীস্টান বসতির বাইরে পৃথক জায়গায় ইহুদীদের বসবাস করার অনুমতি দেয়া হতো। তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ করে রাখা হতো। সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার তাদের ছিল না। নিজেদের গ্যাটো বা নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে শহরে এসে বসতি স্থাপন করতে চাইলে তাদের উপর বৈষম্যমূলক করারোপ করা হতো। তাদের পৃথক পোশাক পরতে বাধ্য করা হতো। ১২১৫ সালে ফোর্থ ল্যাটারান কাউন্সিল প্রথম এ মর্মে নির্দেশ দেয় যে, ইহুদীদের এমন পোশাক পরতে হবে যাতে বুঝা যায় যে, তারা ইহুদী। নির্দেশ দেয়া হয়, পোশাক হতে হবে রঙ্গীন কাপড়ের এবং তা হবে গোলাকার অথবা বর্গাকৃতির। তাতে তারকা থাকতে হবে এবং মাথায় হ্যাট পরতে হবে। নতুবা পরণে আলখেল্লা থাকতে হবে। ইহুদীরা তাদের পৃথক সামাজিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় ব্যাজ পরতো। তবে কেউ কেউ রাজাদের উৎকোচ দিয়ে ব্যাজ পরা এড়িয়ে যেতো। প্রথম তিনটি ক্রুসেডের সহগামী ক্রুসেডাররা জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করে। ট্রেভিস, স্পিয়ার, মেইন্স ও কোলনের মতো কয়েকটি শহরে বসবাসকারী ইহুদী সম্প্রদায় প্রথম ক্রুসেডে পুরোপুরি ধ্বংস হয়। মুসলমানদের প্রতি ক্রুসেডারদের ক্রোধ ছিল যতটুকু ইহুদীদের প্রতিও ছিল ঠিক ততটুকু। যদিও প্রথম ক্রুসেডে বিশপ এবং দ্বিতীয় ক্রুসেডে পোপ ইহুদীদের উপর হামলা রোধের চেষ্টা করেছিলেন। উভয় ক্রুসেডই ছিল ইউরোপে ইহুদীদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিপর্যয়কর। ক্রুসেডারদের আবেগে সাড়া দিয়ে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ইহুদী বিরোধী ডিক্রি জারি করায় ইউরোপ থেকে পাইকারীভাবে ইহুদী বিতাড়ন শুরু হয়।

১১৮২ সালে ফিলিপ অগাস্টাস ইহুদীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে প্যারিস থেকে তাদের বহিষ্কার করেন। পরে ১২৫৪ সালে চতুর্থ লুই, ১৩২২ সালে চতুর্থ চার্লস, ১৩৫৯ সালে ৫ম চার্লস এবং ১৩৯৪ সালে ৬ষ্ঠ চার্লস গোটা ফ্রান্স থেকে তাদের বহিষ্কার করেন। ওয়েলস বিজয়ে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ইহুদী অর্থলগ্নিকারীদের উপর কর আরোপ করেন। ইহুদীরা কর প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করলে রাজাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগে তাদের অভিযুক্ত করা হয়। শুটি ক'টি পেশায়

সীমাবদ্ধ ইহুদীরা দেখতে পেলো, রাজা এডওয়ার্ড অর্থলগ্নিতে তাদের বিশেষ সুবিধা বিলুপ্ত করে দিচ্ছেন, তাদের চলাচল ও কর্মকাণ্ড সীমিত করে ফেলছেন এবং হলুদ কাপড় পরতে বাধ্য করছেন। তারপরের ইতিহাস আরো ভয়াবহ। ইহুদী পরিবার প্রধানদের গ্রেফতার করা হয়। লন্ডন টাওয়ারে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৩শ' জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। অন্যদের নিজ নিজ বাড়ীঘরে হত্যা করা হয়। ১২৯০ সালে ইংল্যান্ড থেকে সকল ইহুদী নির্মূলের ঢেউয়ে হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা কিংবা পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়। অবশিষ্টরা পালিয়ে যাওয়ায় ইংল্যান্ড সাড়ে তিন শ' বছর ইহুদী শূন্য ছিল। তবে ১৬৫৫ সালে রাজা অলিভার ক্রমওয়েল ইহুদী নিধনের এ নীতি পরিত্যাগ করায় আবার ইংল্যান্ডে তাদের আনাগোনা শুরু হয়।

স্পেনেও ইহুদীদের অবস্থা ছিল তথৈবচ। ১৪৯২ সালে আরাগনের দ্বিতীয় ফার্দিনান্দ ও কাস্টিলির ইসাবেলা স্পেন থেকে ইহুদীদের বিতাড়নে সাধারণ ডিক্রি জারি করায় বহু সেফার্দি (স্পেন ও পর্তুগালে বসবাসকারী ইহুদী) ইহুদী অটোমান সাম্রাজ্য ও ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে পালিয়ে যায়। ১৭৪৪ সালে প্রুশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডরিক ব্রেসলাউয়ে (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পোল্যান্ডের লোয়ার সাইলেশিয়ার রাজধানী) ১০টি 'সংরক্ষিত' পরিবারে ইহুদীদের বসবাস সীমাবদ্ধ করেন এবং অন্যান্য প্রুশীয় শহরে অনুরূপ চর্চা উৎসাহিত করেন। ১৭৫০ সালে তিনি সংরক্ষিত ইহুদী পরিবারগুলোকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকতে অথবা বিকল্প হিসেবে বার্লিন ত্যাগের নির্দেশ দেন। একই বছর অস্ট্রিয়া মারিয়া থেরেসার আর্চডাচেস (জার্মান মারিয়া ও পরে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী) ইহুদীদের বোহেমিয়া ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু শিগগির তিনি তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটান এই শর্তে যে, ইহুদীদের প্রতি ১০ বছর পুনরায় বসবাসের অনুমতির জন্য অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এ ধরনের অর্থ আদায় 'মাঙ্কি-গেল্ড' বা রানীর অর্থ হিসেবে পরিচিত। ১৭৫২ সালে তিনি প্রতিটি ইহুদী পরিবারে একটি করে পুত্র সন্তান লাভ সীমিত করেন। ১৭৮২ সালে দ্বিতীয় জোসেফ তার রাজ্যে এসব নিবর্তনমূলক চর্চার অধিকাংশ বিলুপ্ত করেন এই শর্তে যে, সরকারী দলিলপত্রে হিব্রু ও জার্মানীতে প্রচলিত ইহুদীদের ভাষা রহিত করা হবে এবং বিচার বিভাগীয় স্বায়ত্বশাসন বাতিল বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয় জোসেফের এসব উদ্যোগ সম্পর্কে জার্মান ইহুদী দার্শনিক মোজেস মেন্ডেলসন মন্তব্য করেছেন, এ ধরনের সহিষ্ণুতা প্রকাশ্য নির্বতনের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক ছিল।

অগাস্টানিয়ান ধর্মযাজক ও প্রখ্যাত ধর্ম সংস্কারক মার্টিন লুথার তার 'অন দ্য জিউশ এন্ড দেয়ার লাইজ' নামে পুস্তকে ইহুদীদের মিথ্যাচারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। উল্লেখিত পুস্তকে ইহুদীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের জন্য তাকে ইহুদী বিদ্বেষী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। মার্টিন লুথার তার পুস্তকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, তাদেরকে স্থায়ীভাবে উৎপীড়ন অথবা বহিষ্কারের সুপারিশ করেন। ইহুদীদের প্রতি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করায় মার্টিন লুথারের সমালোচনা করে পল জনসন ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত তার 'এ হিস্টি অব দ্য জিউশ' নামে পুস্তকের ২৪২ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'মার্টিন লুথারের লেখা বই হচ্ছে আধুনিক ইহুদী বিদ্বেষের উপর প্রথম বই এবং এটাকে

হলোকাস্টের পথে একটি বিরাট ধাপ হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।' মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে মার্টিন লুথার তার শেষ ধর্মোপদেশে বলেছিলেন, 'আমরা তাদের (ইহুদীদের) খ্রীস্টের ভালোবাসা দিয়ে বরণ করতে চাই এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করি যেন তারা ধর্মান্তরিত হয় এবং ঈশ্বরকে গ্রহণ করে। (উয়েমার সংস্করণ, ভলিউম ৫১, পৃষ্ঠা নং-১৯৫)।

লুথারের ইহুদী বিষয়ক মন্তব্যকে অনেকে মধ্যযুগে ইহুদী বিদ্বেষের একটি ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখেছেন। ইহুদী ধর্ম ও ইহুদীদের বিরোধিতা করার প্রবণতা পরিত্যাগের বিরামহীন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলোতে ক্যাথলিক চার্চে কট্টর ইহুদী বিরোধীরাই নেতৃত্বে আসতেন। সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইহুদীদের মুক্তি দেয়ার পর ৭ম পোপ পায়াস (১৮০০-১৮২৩) রোমে দেয়াল নির্মাণ করে গ্যাটোতে ইহুদীদের পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করেন। ১৮৪৬-৭৮ সালে সর্বশেষ রোম শাসনকারী পোপ ৯ম পায়াসের মেয়াদকালেও ইহুদীরা গ্যাটোতে সীমাবদ্ধ ছিল। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ক্যাথলিক চার্চভুক্ত ছিলেন কিনা এটা স্পষ্ট না হলে ইহুদী বংশোদ্ভূত কেউ খ্রীস্টান জেসুইটে প্রার্থী হতে পারতো না। ১৯৪৬ সাল নাগাদ এ নিয়ম চালু ছিল। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ডেভিড কার্টজাব 'দ্য পোপস অ্যাগেইনস্ট দ্য জিউশ' নামে পুস্তকে মন্তব্য করেছেন, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চ নির্দোষ ইহুদী বিরোধিতাকে সমর্থন করতো। তিনি বলেন, 'নির্দোষ ইহুদী বিরোধিতা থেকে ইহুদী বিদ্বেষের জন্ম নিয়েছে।' নির্দোষ ইহুদী বিরোধিতায় বিশ্বাসীরা সংবাদপত্র, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদ কুক্ষিগতকরণে ইহুদী চক্রান্তের সমালোচনা করতেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে এ চিন্তা খুব প্রবল হয়ে উঠে যে, ইহুদীরা সেমিটিক জনগোষ্ঠীর একটি উপদল মাত্র। অধিকাংশ ইউরোপীয় আরো মনে করতো, সেমিটিক জনগোষ্ঠী আর্য অথবা ইন্দো-ইউরোপীয়দের থেকে পৃথক। সুতরাং ইহুদীদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সংমিশ্রণ ঘটতে পারে না। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, তখন ইউরোপে ধর্মীয় নয়, বংশগত বিচারে ইহুদীদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হতো। জার্মানীর বেশ কয়েকজন লেখক ইহুদীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গেলে তাদেরকে 'ফিলিস্তিনী' হিসেবে উল্লেখ করতেন। ইউরোপের যেসব দেশে ইহুদীদের বসবাস ছিল সেসব দেশে তাদেরকে একটি পৃথক জাতি কিংবা বহিরাগত হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বলশেভিক বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় ইহুদীদের অবস্থা ছিল খুবই করুন। রুশ জার দ্বিতীয় আলেক্সান্ডারকে হত্যার অভিযোগে ইহুদীদের অভিযুক্ত করা হয় এবং ১৮৮১ সালে দক্ষিণ রাশিয়ার ১৬৬ টি শহরে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গায় হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা, ইহুদী নারীদের ধর্ষণ এবং তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। নয়া জার তৃতীয় আলেজান্ডার দাঙ্গার জন্য ইহুদীদের দায়ী করেন এবং তাদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেন। ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত রাশিয়ায় দাঙ্গা চলতে থাকে। ১৯০৩-১৯০৬ সালে আরো বৃহত্তর দাঙ্গায় ২ হাজার ইহুদী নিহত এবং বহু আহত হয়। ১৯১৪-২১ সালে রাশিয়া ও ইউক্রেনে ৮৮৭টি দাঙ্গায় আড়াই লাখ ইহুদী নিহত হয়। এসব

দাঙ্গার মধ্যে অন্তত একটির পেছনে রুশ ওখরানার সমর্থন ছিল। ১৯০৩ সালে কিশিনেভে দাঙ্গার প্রথম ৩ দিন রুশ পুলিশ ও সেনাবাহিনী ছিল উদাসীন। এসময়ের মধ্যে গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী ইহুদীদের উপর বিধিনিষেধ জারি করে 'মে লজ' (১৮৮২ সালের ১৫ মে জার তৃতীয় আলেক্সান্ডারের ঘোষিত অস্থায়ী বিধিনিষেধ) নামে একটি আইন কার্যকর হয়। উচ্চ শিক্ষা ও কয়েকটি পেশায় ইহুদীদের ক্ষেত্রে কঠোর কোটা আরোপ করা হয়। নিবর্তনমূলক আইন কার্যকর হওয়ার এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলতে থাকায় ইহুদীদের গণহারে অভিবাসন শুরু হয়। ১৯২০ সাল নাগাদ ২০ লাখের বেশী রুশ ইহুদী যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিস্তিনে অভিবাসন করে। ইহুদীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকায় রাশিয়ায় ইহুদী বিদ্বেষ তীব্রতর হয়ে উঠে। সে দেশে জার আমলে গুপ্ত পুলিশের এক গোপন রিপোর্টে (দা প্রটোকল অব দ্যা এল্ডার্স অব জায়ন) বলা হয়, ইহুদীরা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার চক্রান্ত করছে। বলশেভিক বিপ্লবে ইন্ধন যোগানোর জন্য ইহুদীদের দোষারোপ করা হয়। বলশেভিকদের অনেকেই জন্মগতভাবে ইহুদী হলেও তারা ইহুদীবাদ ও জায়নবাদকে উৎখাত করতে চেয়েছেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে তারা ইয়েভসেকৎসিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪-এর দশকের শেষদিকে সাবেক সোভিয়েত কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ ইয়েভসেকৎসিয়াসহ সকল ইহুদী সংগঠন নির্মূল করে ফেলেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পোল্যান্ড, আর্জেন্টিনা ও অন্যান্য দেশে ইহুদী বিরোধী দাঙ্গা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালেও দাঙ্গা হয়। রুমানিয়ায় দাঙ্গায় নিহত হয় ১৪ হাজার ও পোল্যান্ডে ৩৮০ জন। ১৯৪৬ সালে ইউরোপে শেষ ইহুদী বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

১২৬৪ সালে পোল্যান্ডের পঞ্চম বোলেসলাউস ইহুদীদের বসবাস এবং তাদের সুরক্ষার জন্য একটি সনদ প্রণয়ন করেন এই আশায় যাতে ইহুদী বসতি পোলিশ অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। ১২৪৪ সালে অস্ট্রিয়ার রাজা ইহুদীদের জন্য যে 'সনদ ঘোষণা করেছিলেন তার সঙ্গে অর্থলগ্নিতে উৎসাহদানকারী এ সনদের হেরফের ছিল খুব সামান্য। ষোড়শ শতাব্দীতে পোল্যান্ড ইউরোপীয় ইহুদীদের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং দেশটি ইউরোপে ইহুদীদের প্রতি সবচেয়ে সহনশীল দেশ হিসেবে গণ্য হয়। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে এ সহনশীলতা ইহুদী বিরোধী মনোভাব উস্কে দেয়। প্রতি-সংস্কারের বলিষ্ঠ সমর্থক সুইডিশ হাউস অব ভাসার রাজা তৃতীয় সিগমন্ড পোলিশ সিংহাসনে আরোহন করে ওয়ারশ কনফেডারেশনের নীতিমালা এবং পোলিশ-লিথুয়ানীয় কমনওয়েলথে স্বীকৃত ইহুদীদের প্রতি সহিষ্ণুতাকে অবজ্ঞা করতে থাকেন। টালমুদসহ (ইহুদী ধর্মের আইন-কানুন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা) অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশনায় ক্যাথলিক ধর্মের সমালোচনা করায় ১৬২৮ সালে রাজা তৃতীয় সিগমন্ড ক্রোধান্বিত হন। ১৬৫০ সালে পোলিশ-লিথুয়ানিয়ায় সুইডিশ আগ্রাসন এবং কোসাক বিদ্রোহে এ কমনওয়েলথের ১ কোটি লোক হয় ধ্বংস নয়তো পালিয়ে যায়। ১৬৪৮-৫৫ সালে পোল্যান্ডের অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে ইউক্রেনীয়দের নেতৃত্বে দাঙ্গা-হাঙ্গামাকালে প্রায় ১ লাখ ইহুদীকে হত্যা করা হয়। পোলিশ ও রুথেনীয় কৃষকরাও ইহুদীদের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। ১৬৯৬ সালে একজন পোলিশকে হত্যার ঘটনায়

ক্ষিপ্ত হয়ে একদল জনতা পোল্যান্ডের পোসিনে বসবাসকারী ইহুদীদের গণহত্যার হুমকি দেয়। এ পরিস্থিতিতে একজন পোলিশ মহিলা হত্যাকাণ্ডের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ইহুদীদের রক্ষা করেন। ১৭১৬ সালে পোলিশ ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। ১৭২৩ সালে গদানস্কের বিশপ শত শত ইহুদী হত্যায় প্ররোচনা। ১৭৪৯ সালের ২৪ মে ওয়ালেনতিন পোটোকি নামে ইহুদী ধর্মে ধর্মান্তরিত এক সম্ভ্রান্ত পোলিশকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের পূর্ববর্তী বছরগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। কার্লস কাফলিন ও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ইহুদীদের নিন্দা করেছিলেন এবং হেনরি ফোর্ড তার দৈনিকে 'দ্য প্রটোকল অব দ্যা এল্ডার্স অব জায়ন' পুনর্মুদ্রণ করেন। ১৯১৯-৫০-এর দশক পর্যন্ত ইহুদী ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান ভর্তি রোধে হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, কর্নেল, বোস্টন ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা রকম শর্ত জুড়ে দেয়া হয়।

এমন কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে কম-বেশী ইহুদী বিরোধিতা ছিল না। অতীত কালের ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্যি তেমনি সত্যি বিংশ শতাব্দীর ক্ষেত্রেও। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে নাৎসী জার্মানীকে এককভাবে ইহুদী বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। ইহুদী বিদ্বেষী রীতি-নীতি অনুসরণের জন্য হিটলার ব্যক্তিগতভাবে যতটা দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী তদানীন্তন ইউরোপ ও আমেরিকা। পরবর্তীতে পরিস্থিতি যাই হোক, একসময় সবাই জার্মানীর ইহুদী বিরোধিতাকে মেনে নিয়েছিল। ১৯৩৫ সালে জার্মানীতে নুরেমবার্গ লজ নামে পরিচিত ইহুদী বিরোধী আইন প্রণীত হয়। ১৯৩৮ সালে এভিয়ান সম্মেলনে ৩০টি দেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করলেও তাদের কেউ ইহুদীদের প্রতি হিটলারের অনুসৃত নীতির সমালোচনা করেননি এবং জার্মানী থেকে ইহুদীদের পালিয়ে যাবার পক্ষেও মতামত দেননি। তাতে কি একথা প্রমাণিত হয় না যে, নাৎসী জার্মানীতে চালু ইহুদী বিরোধী নীতিতে এ অভিশপ্ত জাতির প্রতি সার্বজনীন নীতির প্রতিফলন ঘটেছিল?

ইহুদী ষড়যন্ত্র

এ যুগের প্রায় সকলেই জানে এবং বিশ্বাস করে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর চ্যান্সেলর এডলফ হিটলার ৬০ লাখ ইহুদীকে হত্যা করেছেন। পোল্যান্ডের অসউইচ বন্দী শিবিরে গ্যাস চেম্বারে নিহত ইহুদীদের জন্য অশ্রুপাত করা হয়। কিন্তু কেন হিটলার ইহুদীদের হত্যা করেছিলেন? হিটলারের হাতে নিহত ইহুদীদের সংখ্যাই বা কত? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল কিভাবে? এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে দেখা যাবে হিটলারের হাতে ইহুদী নিধনের জন্য ইহুদীরাই দায়ী। শুধু তাই নয়, হিটলারের হাতে নিহত ইহুদীদের সংখ্যা যত উল্লেখ করা হয়, প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম। প্রচারণার স্বার্থে বিশ্ববাসীকে মিথ্যা কথা শোনানো হচ্ছে। জার্মানী থেকে ইহুদীদের ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে স্থানান্তর করার গভীর চক্রান্ত বাস্তবায়নে এ প্রচারণা চালানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাও করা হয় এ উদ্দেশ্যে।

জার্মানীর বিরুদ্ধে ইহুদীদের যুদ্ধ ঘোষণা থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ইহুদীদের যুদ্ধ ঘোষণার আগে হিটলার কখনো তাদের প্রতি বৈরি ছিলেন না। জার্মান সরকারর জ্ঞাতসারে কোথাও ইহুদীদের উপর নিপীড়ন চালানো হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্য এককভাবে যে ঘটনাকে দায়ী করা হয়, তা হচ্ছে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইহুদীদের যুদ্ধ ঘোষণা। এডলফ হিটলার ক্ষমতায় আসতে না আসতেই ইন্টারন্যাশনাল জিউইশ কম্যুনিটি জার্মানীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৩৩ সালের ২৪ মার্চ লন্ডনের দ্য ডেইলি এক্সপ্রেস-এ জার্মানীর বিরুদ্ধে ইহুদীদের যুদ্ধ ঘোষণার আহ্বান সম্বলিত একটি নিবন্ধে হিটলারের নেতৃত্বাধীন সরকার উৎখাতে জার্মানীর নাজুক অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়ার উদ্দেশ্যে জার্মান পণ্য বর্জনের ডাক দেয়া হয়। নিবন্ধের শিরোনাম ছিল' ইহুদীরা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। দুনিয়ার ইহুদী এক হও। জার্মান পণ্য বর্জন কর। ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করো' ইত্যাদি।

ইহুদীদের যুদ্ধ ঘোষণার পরই জার্মানী তাদের উপর পাল্টা আঘাত হানে। বিশ্ববাসীর সামনে সত্য কথা প্রকাশ করলে এটাই প্রকাশ করতে হতো যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম গোলাটি জার্মানীর থার্ড রাইখ নায়, ছুঁড়েছিল ইহুদীরাই। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন নিউইয়র্কের এটর্নি স্যামুয়েল ইউনটার্মায়ার ছিলেন তাদের অন্যতম। স্যামুয়েল ইউনটার্মায়ার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকে ক্রুসেড বলে অভিহিত করেছিলেন। জার্মানীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ইহুদী নেতৃত্বের যুদ্ধ ঘোষণায় নাৎসীদের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাই কেবল উজ্জীবিত হয়নি, হিটলার সরকার ও জায়নবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠে। আন্তর্জাতিক জায়নবাদী আন্দোলন মনে করতো যে,

ইহুদী ও জার্মানীর মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ব্যাপকহারে ইহুদী অভিবাসন ঘটবে।

আজকের দিনে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে এডলফ হিটলার চ্যান্সেলর নিযুক্ত হলে জার্মান সরকার নিজ দেশে ইহুদীদের বন্দী শিবিরে পাঠানোসহ তাদের উপর জুলুম শুরু করে। তবে একথা ঠিক হিটলার ক্ষমতায় আসার পর জার্মানীতে ইহুদীদের উপর কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন সহিংসতা হয়েছে। কিন্তু তাতে সরকারের সম্মতি ছিল না। জার্মান সরকার ইহুদীদের উপর সহিংসতাকে উৎসাহিত করেনি। সত্যি কথা হচ্ছে, জার্মানীসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে ইহুদীবিরোধী মনোভাব নতুন কিছু ছিল না। এমনকি ইহুদীবিরোধী ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করছেন, ইউরোপের ইতিহাসে বরাবরই কম-বেশি ইহুদীবিরোধী মনোভাবের অস্তিত্ব ছিল। কোনোভাবেই ১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকে হিটলার জার্মানীর অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন না। সশস্ত্র বাহিনীর উপরও তার পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি ছিলেন একটি জোট সরকারের শক্তিশালী অংশীদার মাত্র। ব্যক্তিগতভাবে সরকার থেকে তিনি ছিলেন অনেক দূরে। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও জার্মানীর বাইরের ইহুদী নেতৃবৃন্দ প্রচার করছিলেন, জার্মানীর নয়া সরকার পরিকল্পিতভাবে ইহুদীবিরোধী সহিংসতা উস্কে দিচ্ছে। 'ভেরেইন' নামে পরিচিত জার্মান জিউইশ অ্যাসোসিয়েশনও এ অভিযোগ সমর্থন করতে পারেনি। হিটলার সরকার এ হুমকিপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত নয়—একথা উল্লেখ করে ভেরেইন এক বিবৃতিতে জানায়, 'আমরা একথা বিশ্বাস করি না যে, আমাদের সহযোগী জার্মান নাগরিকগণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়িতে নিজেদের লিপ্ত হতে দেবেন।' জার্মান ভেরেইনের এ অভিমত ব্যক্ত করা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের ইহুদী নেতৃবৃন্দ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, হিটলার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা অপরিহার্য।

১৯৩৩ সালের ১২ মার্চ আমেরিকান জিউইশ কংগ্রেস ২৬ মার্চ মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে একটি বিশাল প্রতিবাদ বিক্ষোভের ডাক দেয়। একই সময়ে প্রবীণ ইহুদী সৈন্যদের কমান্ডার-ইন-চীফ জার্মান পণ্য বর্জনে আমেরিকানদের প্রতি আহ্বান জানান। ২৩ হাজার ইহুদী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। নর্থ জার্মান লয়েড ও হামবুর্গ-আমেরিকান শিপিং লাইন্সের বাইরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। নিউইয়র্ক সিটিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাটে জার্মান পণ্য বর্জন শুরু হয়।

১৯৩৩ সালে ২৪ মার্চ লন্ডনের ডেইলি এক্সপ্রেসের এক নিবন্ধে বলা হয়, ইহুদীরা ইতোমধ্যেই জার্মানী ও তার সরকারকে বয়কটে তাদের আন্দোলন শুরু করেছে। ডেইলি এক্সপ্রেসে প্রকাশিত নিবন্ধে গণবিক্ষোভ প্রদর্শনে বিশ্বব্যাপী ইহুদীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়, 'বিশ্বের সকল ইহুদী জার্মানীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক যুদ্ধ ঘোষণায় ঐক্যবদ্ধ। নয়া জার্মানীর প্রতীক হিসেবে স্বস্তিকার আবির্ভাব হচ্ছে ইহুদীদের পুরনো যুদ্ধের প্রতীককে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করা। নিজ দেশের জনগণের উপর নিপীড়নকারী জার্মান উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ১ কোটি ৪০ লাখ ইহুদী যেন একটি মানুষের অভিন্ন সত্তার মতো ঐক্যবদ্ধ। হিটলারের লোকজনের বিরুদ্ধে পবিত্র ক্রুসেডে যোগদানে ইহুদী পাইকারি

দোকানদার তার বাড়ি, ব্যাংকার তার স্টক এক্সচেঞ্জ, বণিক তার ব্যবসা এবং ভিক্ষুক তার পর্ণ কুটির পরিত্যাগ করবে।'

ডেইলি এক্সপ্রেসের নিবন্ধে আরো বলা হয়, লন্ডন, প্যারি, ওয়ারশ ও নিউইয়র্কে জার্মানী বর্তমানে তার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কলকারখানায় আন্তর্জাতিক বয়কটের মোকাবিলা করছে। ইহুদী ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক ক্রুসেডে যোগদানে ঐক্যবদ্ধ। প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শনে বিশ্বব্যাপী প্রস্তুতি চলছে-একথা উল্লেখ করে নিবন্ধে আরো বলা হয়, প্রাচীন ও ঐক্যবদ্ধ ইসরাইল জাতি তার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আধুনিক ও নয়া অস্ত্রশস্ত্র লাভ করছে।

ডেইলি এক্সপ্রেসে প্রকাশিত এ নিবন্ধকে সত্যিকার অর্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম গোলাবর্ষণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। একই ভাষায় ইহুদী পত্রিকা নাশ্চা রেচ মন্তব্য করে, 'ইহুদী সম্প্রদায়ের সকলকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যে কোনো সভা-সমাবেশ ও সম্মেলনে এ যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষে জনমত গঠন করতে হবে। এভাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমাদের স্বার্থকে আদর্শগতভাবে প্রাণবন্ত করে তুলবে, যা জার্মানীকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজন।' ২৬ মার্চ জার্মান জায়োনিস্ট এসোসিয়েশন নাৎসীদের (ন্যাশনাল সোসালিস্ট) বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জায়নবাদীদের অভিযোগকে প্রচারণা হিসেবে আখ্যায়িত করে একটি টেলিগ্রাম বের করে। ইহুদীদের হুমকিতে হিটলার সরকার আতঙ্কিত হয়ে জার্মানীর ভেতর ও বাইরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নিরসনের উদ্যোগ নেয়।

জায়নবাদীরা প্রথমে নাৎসী সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। পরে তারা দেখতে পায় একমাত্র ইহুদীবিরোধী হিটলারই জার্মান ইহুদীদের জায়নবাদের দিকে ঠেলে দিতে পারেন। এটাই ছিল তথাকথিত 'ট্রান্সফার এগ্রিমেন্ট' বা স্থানান্তর চুক্তির ভ্রূণ। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে জার্মান ইহুদীদের স্থানান্তরের লক্ষ্যে নাৎসী সরকার ও জায়নবাদী ইহুদীদের মধ্যে এ চুক্তি হয়। ইহুদী ঐতিহাসিক ওয়াল্টার ল্যাকার ও অন্যান্যদের মতে, জার্মান ইহুদীরা একথা বিশ্বাস করতো না যে, ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে অভিবাসনই ইহুদী সমস্যার একমাত্র সমাধান। অধিকাংশ জার্মান ইহুদী জায়নবাদীদের তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যে স্থানান্তরের মাধ্যমে ইহুদী সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসায় হিটলার জায়নবাদীদের রক্ষা করেছিলেন এবং তাদের সহযোগিতা দিয়েছিলেন। ইহুদী ঐতিহাসিক এডউইন ব্ল্যাক দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছেন, অধিকাংশ ইহুদী ফিলিস্তিনে পালিয়ে যেতে চায়নি। কিন্তু নাৎসী জার্মানীতে জায়নবাদী আন্দোলনের প্রভাবে ইহুদীরা জার্মানী থেকে ফিলিস্তিনে পালিয়ে যাবার একটি সম্ভাবনা দেখতে পায়। অন্য কথায়, ট্রান্সফার এগ্রিমেন্ট নামে খ্যাত চুক্তিতে এ সুযোগ দেখা দেয়। এ এগ্রিমেন্টে কেবলমাত্র ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদীদের পুঁজি প্রত্যাহারের অনুমতি দেয়া হয়। কোনো ইহুদী লেভেন্টে যেতে চাইলে কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রে সে জার্মানী ত্যাগ করতে পারতো। ট্রান্সফার এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দেয়। চুক্তিতে শর্ত ছিল বর্তমান ইসরাইলের হাইফা নগরী অথবা অন্য কোথাও এসে পৌঁছানোর পর একজন অভিবাসীকে এক হাজার পাউন্ড

স্টার্লিং পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু অর্থনৈতিক টানাপড়েনে বিপর্যস্ত জার্মানীতে নগদ অর্থের সংস্থান করা ছিল দুরূহ। নিউইয়র্ক ও আমস্টারডামের ইহুদীরা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল- একথা সত্যি। কিন্তু জার্মানীর সহায়তাই তারা টিকে থাকতে চেয়েছে। জায়নবাদীরা এক পর্যায়ে দেখতে পায় ফিলিস্তিনে তাদের অর্থনৈতিক ভাগ্য জার্মান অর্থনীতির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এ উপলব্ধি থেকে জার্মান ইহুদীরা ফিলিস্তিনে তাদের সম্পদ প্রত্যাহারের স্বার্থে জার্মানীকে বয়কট করার উদ্যোগ নস্যাতে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়। ইহুদী হুমকি মোকাবিলায় জার্মানীর জবাব ছিল আত্মরক্ষামূলক, আক্রমণাত্মক নয়। এ সত্য সঠিকভাবে তুলে ধরা হলে অনাকাঙ্ক্ষিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলো সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতো। ইহুদীদের যুদ্ধ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় হিটলার কেন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা বুঝতে হলে জার্মানীর তখনকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও জানার প্রয়োজন রয়েছে।

১৯৩৩ সালে জার্মানীর অর্থনীতি ছিল বিধ্বস্ত। ৬০ লাখ জার্মান তরুণ ছিল বেকার। প্রায় ৩০ লাখ জার্মান সরকারী সহায়তার উপর নির্ভরশীল ছিল। অতিমাত্রায় মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী প্রচার মাধ্যমে জার্মান বিরোধী প্রচারণা জার্মানীর শত্রু বিশেষ করে পোলিশ ও তাদের সামরিক কমান্ডের আত্মবিশ্বাসকে জোরদার করছিল। ইহুদীরা জার্মানীর বিরুদ্ধে যে অর্থনৈতিক যুদ্ধের ডাক দিয়েছিল, তা কোনো কল্পনাবিলাস ছিল না। এ অর্থনৈতিক যুদ্ধ ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সত্তা হিসেবে জার্মানীর অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার একটি সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত ষড়যন্ত্র। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার জন্য জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ইহুদীদের লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে জার্মানীকে দেউলিয়া করে দেয়া, যাতে সে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণে অক্ষম হয় এবং সে সামরিকভাবে নপুংষক হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক বয়কটে জার্মানী পঙ্গু হয়ে যায়। এডউইন ব্ল্যাকের মতো ইহুদী পণ্ডিতগণও স্বীকার করেছেন, বয়কটের পরিণামে জার্মানীর রপ্তানির পরিমাণ ১০ শতাংশ হ্রাস পায়। এসময় বিদেশী ব্যাংকগুলোতে জার্মান সম্পদ আটকের জন্য অনেকে দাবি তোলে। এডউইন ব্ল্যাক তার 'ট্রান্সফার এগ্রিমেন্ট—দ্য আনটল্ড স্টোরি অব দ্য প্যাক্ট বিটুইন থার্ড রাইখ অ্যান্ড জিউইশ প্যালেস্টাইন' শীর্ষক গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাতারা জোর গলায় জার্মানীর নৃশংসতার নিন্দা করতেন। বর্তমান ইসরাইলী নেতৃত্বও একইভাবে নাৎসী জার্মানীর নিন্দায় মুখর। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস ভিন্ন। নাৎসী জার্মানীর সহযোগিতাই ইসরাইলী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছে। মিথ্যাচারের মধ্য দিয়েই ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। একই মিথ্যাচার করা হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা নিয়ে। এ যুদ্ধের জন্য নাৎসী হিটলার যতটুকু দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী অভিশপ্ত ইহুদীরা। ইহুদী হলোকাস্টকে যেভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা হয় প্রকৃত ইতিহাস তা নয়। প্রচারণার স্বার্থে ইহুদী হত্যাকাণ্ডকে বাড়িয়ে প্রচার করা হয়।

চীন-জাপান যুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগে এবং যুদ্ধকালে চীনের পূর্বাঞ্চলে জাপানের সর্বাত্মক সামরিক অভিযানের স্মৃতি এখনো চীনাদের পীড়া দেয়। তাদের পক্ষে এ স্মৃতি ভুলে যাওয়া কঠিন। ২০০৫ সালের আগস্টে জাপানের এক আদালত রায় দিয়েছে যে, চীনে জাপানী সৈন্যদের নৃশংসতা কোনো কল্পকাহিনী নয়। জাপানের রাজকীয় বাহিনীর দু'জন সাবেক লেফটেন্যান্টের নৃশংসতার পক্ষে রায় দিয়ে বিচারক এ মন্তব্য করেন। অভিযুক্ত দু'জন লেফটেন্যান্ট ১শ' চীনা বন্দী সৈন্যের মাথা কার আগে কে কাটবে সে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। ১৯৩৭-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চীনের পূর্বাঞ্চলে জাপানী দখলদারিত্বকালে যে যুদ্ধ হয় তাকে চীন-জাপান দ্বিতীয় যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ যুদ্ধকালে কত বীভৎস ঘটনা ঘটেছে তার হিসাব কে রাখে!

১৯৪৫ সালে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চীনে জাপানের দখলদারিত্বের অবসান ঘটে। চীনের উপকূলীয় পূর্বাঞ্চল দখলের আগে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়। ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া দখল ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার অন্যতম কারণ। চীন-জাপানের মধ্যকার যুদ্ধকে চীনারা বলে 'জাপান বিরোধী চীনা গণ প্রতিরোধ যুদ্ধ', 'জাপান বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ' 'প্রতিরোধ যুদ্ধ' অথবা '৮ বছরের প্রতিরোধ যুদ্ধ' ইত্যাদি। অন্যদিকে, জাপানে এ যুদ্ধ 'সি অপারেশন' 'দ্য চাইনিজ ইনভেশন' অথবা 'জাপানীজ-চাইনিজ ওয়ার' হিসেবে পরিচিত। এশিয়ার মূল ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে জাপানীদের একটি মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে চীন দখলের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন 'চীনা ঘটনাবলী' হিসেবে পরিচিত। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী আগ্রাসনকে 'মুকাদেন ঘটনা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এসব 'ঘটনা'র শেষ ঘটনাকে 'লুগাউচিয়াও' অথবা 'মার্কো পোলো ব্রিজ ইনসিডেন্ট' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ১৯৩৭ সালের ৭ জুলাই লুগাউ ব্রিজ ঘটনা বা মার্কো পলো ব্রিজ ঘটনাকে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের প্রারম্ভ বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে, সমসাময়িক চীনা ঐতিহাসিকগণ ১৯৩১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর 'মুকদেন ঘটনা'কে যুদ্ধের শুরু হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। মুকদেন ঘটনার পর জাপানের গুয়ানদং আর্মি মাঞ্চুরিয়া দখল করে এবং ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারীতে মাঞ্চুকু রাজ্যে একটি পুতুল সরকার কায়েম করে। জাপান মাঞ্চুকুর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দানে চীনের উপর চাপ দেয়। ১৯৩৭ সালে লুগাউ ব্রিজে যুদ্ধের পর জাপান সাংহাই, নানজিং ও উত্তরাঞ্চলীয় শাংচি দখল করে। এ যুদ্ধে প্রায় ২ লাখ জাপানী সৈন্য ও উল্লেখযোগ্য ভাড়াটিয়া চীনা সৈন্য অংশগ্রহণ করে। চীনা ঐতিহাসিকরা দাবি করছেন যে, নানজিংয়ের পতনের পর

স্বাক্ষর দানের ৬ দিনের মাথায় মার্কিন সৈন্যরা কোরীয় উপদ্বীপে অবতরণ করে। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সোভিয়েতরা হোক্কাইডোতে কখনো হামলা চালায়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের 'অপারেশন আগস্ট স্টর্ম' পরিচালনা এবং জাপানের হনশু দ্বীপের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা নিক্ষেপের ঘটনা জাপানীদের আত্মসমর্পণ না করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য করে। বিশ্বের দু'টি পরাশক্তি একযোগে হামলা চালালে জাপান মাথা নত করে। জাপানীরা দ্বীধাহীন কণ্ঠে জানিয়ে দেয়, হোম আইল্যান্ড রক্ষা করার আশাও তাদের নেই। কোনো কোনো সোভিয়েত ঐতিহাসিক ও জাপানী সূত্র উল্লেখ করছে যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের চেয়ে মাঞ্চুরিয়ার পতন এবং চীনে পূর্ণ বিপর্যয়ের আসন্ন হুমকি জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। তবে এটা সত্যি, জাপানীরা কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে চলে যাবার আগে পুঁজিবাদী আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণে আগ্রহী ছিল।

জাপানে সোভিয়েত সামরিক অভিযানে উভয়পক্ষের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে একপক্ষের সঙ্গে অন্য পক্ষের হিসাব মিলে না। সোভিয়েতদের হিসাব মতে, নিহত জাপানী সৈন্য সংখ্যা ৮৩ হাজার ৭৩৭ এবং যুদ্ধবন্দী ৫ লাখ ৯৪ হাজার। তবে জাপানীরা দাবি করছে যে, তাদের নিহত সৈন্য সংখ্যা ২১ হাজার। একইভাবে জাপানীদের হিসাব মতে, নিহত সোভিয়েত সৈন্য সংখ্যা হলো ২০ হাজার এবং আহত ৫০ হাজার। অন্যদিকে, সোভিয়েতদের হিসাব মতে, তাদের সৈন্য নিহত হয়েছে ৮ হাজার ২১৯ এবং আহত হয়েছে ২২ হাজার ২৬৪ জন।

সোভিয়েত দখলীকৃত মাঞ্চুরিয়া তদানীন্তন চীনের কুওমিনটাং সরকারের বিরুদ্ধে মাও সে তুংয়ের কমিউনিস্ট বাহিনীর একটি মূল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরবর্তী ৪ বছর চীনে গৃহযুদ্ধে তাকে বিজয়ী হতে সহায়তা করেছে। মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক অভিযানে বিজয়ী হওয়ায় পশ্চিমা মিত্ররা সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চীনে ঘাঁটি গাড়তে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। চীনে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করলে মিত্রবাহিনী তাদের কাছে বিজিত ভূখণ্ড হস্তান্তর করে। ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় তাকে শাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ উপহার দেয়া হয়। পোর্ট আর্থার এবং গুরুত্বপূর্ণ রেল যোগাযোগসহ দাইরেনের উপর তাদের স্বার্থ স্বীকার করে নেয়া হয়। ১৯৫৫ সালে দাইরেন গণচীনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে শাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ আজো সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান উত্তরসূরি রাশিয়ার দখলে। ১৯৫৬ সালে মস্কো ও টোকিওর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হলেও হোক্কাইডো দ্বীপের কাছাকাছি 'নর্দান টেরিটোরিজ' ফেরত দেয়া নাগাদ জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে অস্বীকৃতি জানায়।

কোরীয় উপদ্বীপে তৎকালীন দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্ব পরবর্তীতে বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম দেয় এবং কোরিয়াকে বিভক্ত করে রাখে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় উত্তর কোরিয়ায় কমিউনিজম এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা ও ইঙ্গনে দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতন্ত্র কায়েম হয়। উত্তর কোরিয়া থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার করা হলেও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আজো মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়নি।

হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ

জাপানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে মার্কিন সামরিক বাহিনী ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। আণবিক বোমা নিক্ষেপে তাৎক্ষণিক নিহত হয় ১ লাখ ২০ হাজার লোক এবং পরে প্রাণ হারায় তার দ্বিগুণ। আণবিক বোমা নিক্ষেপের পর ১৫ আগস্ট জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের ঘটনা এ বোমা ব্যবহারে ইতিহাসে প্রথম ও একমাত্র ঘটনা। প্রতি বছর ৬ আগস্ট হিরোশিমা ও ৯ আগস্ট নাগাসাকি দিবস পালিত হয়। ৬ আগস্ট সকাল ৮ টা ১৫ মিনিটে হিরোশিমায় পৃথিবীর প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মহাপ্রলয় থেকে একটি ঘড়ি রক্ষা পায়। সে ঘড়ির কাটা ৮ টা ১৫ মিনিটে এসে থেমে রয়েছে।

আণবিক বোমা ব্যবহারের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা শুরু থেকেই তুমুল বির্তকের জন্ম দিয়েছে। মার্কিনীরা এ অভিমত পোষণ করতো যে, আণবিক বোমা নিক্ষেপ করায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নয়তো জাপানে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পিত অভিযানে উভয়পক্ষে আরো প্রচুর লোক হতাহত হতো। অন্যদিকে, জাপানীদের অভিমত, এ বোমা ব্যবহার করা ছিল অপ্রয়োজনীয়। আণবিক বোমার হাত থেকে যারা বেঁচে রয়েছে তাদেরকে বলা হয় 'হিবাকুশা'। এটি একটি জাপানী শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত লোক। আণবিক বোমার ভয়াবহতা জাপানকে বিশ্ব থেকে এ অস্ত্র নির্মূলে উদ্বুদ্ধ করে।

'ম্যানহাটন প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্পে যুক্তরাষ্ট্র গোপনে হিরোশিমায় ব্যবহৃত দ্বিতীয় এবং নাগাসাকিতে ব্যবহৃত তৃতীয় আণবিক বোমাটি তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্রকে এ দু'টি আণবিক বোমা তৈরিতে যুক্তরাজ্য ও কানাডা সহায়তা করে। আমেরিকা ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে 'ট্রিনিটি' ছদ্মনামে প্রথম আণবিক বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটায়। এ বোমা পরীক্ষার ছদ্মনাম ছিল দ্য গ্যাজেট। ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র না হওয়ায় বোমাটির এ ধরনের নামকরণ করা হয়। আণবিক বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সাড়ে তিন বছরে প্রায় ৩ লাখ লোক নিহত হয়। অর্ধেক লোক নিহত হয় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। ধ্বংস এবং আরো ধ্বংসের ভীতি সৃষ্টি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্রুত নিষ্পত্তি টানাই ছিল আণবিক বোমা নিক্ষেপে নির্দেশ দানে ট্রুম্যানের আনুষ্ঠানিক যুক্তি। হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপের পর প্রেসিডেন্ট

ট্রুম্যান নিম্নোক্ত বিবৃতি দেন : 'জাপানী জনগণকে চরম ধ্বংস থেকে রক্ষায় ২৬ জুলাই পটসড্যাম চরমপত্র দেয়া হয়। তাদের নেতৃবৃন্দ তাৎক্ষণিক এ চরমপত্র প্রত্যাখান করেন। তখন হুমকি দেয়া হয়েছিল যে, তারা আমাদের শর্তে রাজি না হলে তাদের উপর এমন বোমা নিক্ষেপ করা হবে যা পৃথিবী কখনো দেখেনি।'

১৯৪৫ সালের ১০-১১ মে লস অ্যালামোসের টার্গেট কমিটি নিম্নোক্ত টার্গেটগুলো বোমাবর্ষণের জন্য বাছাই করে : কিয়োটো, হিরোশিমা, ইয়োকোহোমা, কোকুরা অস্ত্রাগার, নিগাতা এবং সম্রাটের প্রাসাদ। রবার্ট জাংকের ভাষায়, হিরোশিমা, নিগাতা ও কাকুরা ছাড়া সংক্ষিপ্ত তালিকায় বোমা নিক্ষেপের জন্য অন্যান্য যেসব টার্গেট নির্বাচন করা হয় সেগুলোর বাইরে কিয়োটো ছিল জাপানের মন্দিরের শহর। এ ভয়াবহ সংবাদ শুনে জাপান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এডউইন ও' রেইচার সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে তার চীফ মেজর আলফ্রেড ম্যাককোরম্যাকের অফিসে ছুটে যান। অধ্যাপক এডউইনের কাছ থেকে এ ভয়াবহ সংবাদ পেয়ে নিউইয়র্কের মানবতাবাদী মেজর আলফ্রেড ম্যাককোরম্যাক আবেগে কেঁদে ফেলেন এবং টার্গেট লিস্ট থেকে কিয়োটোর নাম বাদ দিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেনরি এল. স্টিমসনকে রাজি করান।

হিরোশিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণের দৃশ্য

১৯৮৬ সালে অধ্যাপক এডউইন রেইচার তার 'মাই লাইফ বিটুইন জাপান এন্ড আমেরিকা' নামে পুস্তকের ১০১ পৃষ্ঠায় এ ঘটনা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এ ধরনের সুযোগ পেলে সম্ভবত আমি তাই করতাম। কিন্তু তার এক বিন্দুও সত্যি নয়। আমার বন্ধু কিয়োটোর দোশিশার ওটিস ক্যারি যথার্থভাবে প্রমাণ করেছেন যে,

কিয়োটোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার কৃতিত্ব একক্ভাবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হ্যানরি এল. স্টিমসনের। প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্টিমসন কিয়োটো নগরীকে চিনতেন। কয়েক দশক আগে সেখানে মধুচন্দ্রিমা উদযাপনের পর থেকে তিনি শহরটির ভূয়সী প্রশংসা করতেন।'

রিচার্ড রোডস এ বক্তব্য আংশিকভাবে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, জেনারেল লেসলি গ্রোভের প্রস্তাব উপেক্ষা করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্টিমসন কিয়োটোতে আণবিক বোমা নিক্ষেপে অস্বীকার করেন।

এই সেই অভিশপ্ত মার্কিন বোমারু বিমান এনোলা গে যা জাপানের হিরোশিমায় বিশ্বে প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে

বোমাবর্ষণকালে হিরোশিমার উল্লেখযোগ্য শিল্প ও সামরিক গুরুত্ব ছিল। হিরোশিমার কাছাকাছি কয়েকটি সামরিক স্থাপনা ছিল। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পঞ্চম ডিভিশনের সদর দপ্তর এবং ফিল্ড মার্শাল হাতার নেতৃত্বাধীন সেকেন্ড জেনারেল আর্মি হেডকোয়ার্টার্স। হাতার নেতৃত্বাধীন এ আর্মি হেডকোয়ার্টার্স পুরো দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপানের প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতো। হিরোশিমা ছিল জাপানী সামরিক বাহিনীর একটি প্রধান সরবরাহ ও লজিস্টিক ঘাঁটি। শহরটি ছিল একটি যোগাযোগ ও মজুদ কেন্দ্র এবং সৈন্যদের সমবেত হওয়ার স্থান। মিত্রবাহিনীর পূর্ববর্তী বোমা হামলায় শহরটি ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ায় আণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতা নিরূপণের একটি উপযুক্ত স্থান হিসেবে এটিকে বেছে নেয়া হয়। শহরটিকে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। মহিলা, শিশু এবং সামরিক অফিস ও সামরিক কলকারখানায় কর্মরত কোরীয়দের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয় এবং যে কোনো আগ্রাসন মোকাবিলায় তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শহরের কেন্দ্রস্থলে ছিল কংক্রীটের তৈরি শক্তিশালী ভবন। তাছাড়া ছিল

হাল্কা ভবন। শহরের কেন্দ্রস্থলের বাইরের জায়গাটি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের দোকানে ঠাসা। শহরতলীতে ছিল কয়েকটি বৃহদায়তনের শিল্প কারখানা। জাপানীদের ঘরবাড়ি ছিল কাঠের তৈরি। তবে ছাদ ছিল টাইলসের। বেশ ক'টি শিল্প কারখানার কাঠামো ছিল কাঠের। সবদিক থেকে শহরটি ছিল আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার মতো।

যুদ্ধের শুরুতে হিরোশিমার লোকসংখ্যা ৩ লাখ ৮০ হাজার অতিক্রম করেছিল। কিন্তু জাপান সরকারের নির্দেশে লোকজনকে পর্যায়ক্রমে অন্যত্র স্থানান্তর করায় আণবিক বোমাবর্ষণের আগে শহরের লোকসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। আণবিক বোমা হামলার সময় শহরের লোকসংখ্যা ছিল আনুমানিক ২ লাখ ৫৫ হাজার। জাপানীদের সংরক্ষিত তালিকা অনুযায়ী হিরোশিমার লোকসংখ্যার এ হিসাব পাওয়া যায়। তবে এ সংখ্যার মধ্যে শহরে যেসব অতিরিক্ত শ্রমিক ও সৈন্য আনা হয়েছিল তারা সম্ভবত অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আণবিক হামলার লক্ষ্যবস্তু। বিমানে জাপান থেকে আনুমানিক ৬ ঘন্টা দূরে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় টিনিয়ান বিমান ঘাঁটি থেকে এনোলা গে উড্ডয়ন করে। টিনিয়ান হচ্ছে গুয়াম থেকে কয়েক শ' মাইল উত্তরে নর্থান মেরিয়ানাসের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। লক্ষ্যবস্তুর উপরে আগে থেকে ঘন মেঘের আস্তরণ থাকায় ৬ আগস্ট বোমাবর্ষণের তারিখ ঠিক করা হয়। বিমান উড্ডয়নের সময় আবহাওয়া ছিল চমৎকার। ক্রু ও যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে কাজ করছিল। নেভির ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পারসন্স উড্ডয়নের পর বিমানটিকে আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করেন। উড্ডয়নকালে ঝুঁকি হ্রাসে বিমানে আণবিক বোমা তোলা হয়নি। পরিকল্পনা-মাফিক হামলা চালানো হয়। বোমাটির ওজন ছিল ৬০ কেজি বা ১৩০ পাউন্ড।

বোমাবর্ষণের এক ঘন্টা আগে জাপানী পূর্ব সতর্কীকরণ রাডারে দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপান অভিমুখে কয়েকটি আমেরিকান বিমান এগিয়ে আসার দৃশ্য ধরা পড়ে। সতর্কতা ঘোষণা করা হয় এবং অনেকগুলো শহরে রেডিও সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। হিরোশিমাও ছিল তাদের একটি। অনেক উঁচু দিয়ে বিমানগুলো জাপান উপকূলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। প্রায় ৮ টার দিকে হিরোশিমার রাডার অপারেটর নিশ্চিত হয়, খুব অল্প সংখ্যক সম্ভবত দুই থেকে তিনটি বিমান এগিয়ে আসছে। বিমানের সংখ্যা এত কম হওয়ায় সতর্কতা তুলে নেয়া হয়। যে তিনটি বিমান এগিয়ে আসছিল তাদের একটি ছিল 'এনোলা গে'। এ বোমারু বিমানটি আণবিক বোমা বহন করছিল। বিমানের কমান্ডার ছিলেন কর্নেল পল টিবেটস। ১৯৪৫ সালের ৫ আগস্ট টিবেটস আনুষ্ঠানিকভাবে ৪৪-৮৬২৯২ নম্বরের বোমারু বিমানকে 'এনোলা গে' নামকরণ করেন। এনোলা গে ছিল তার মায়ের নাম। তার নানার একটি প্রিয় উপন্যাসের নায়িকার নাম ছিল এনোলা গে। টিবেটসের নানা উপন্যাসের নায়িকার নামানুসারে তার মেয়ের নাম রেখেছিলেন এনোলা গে। জাপান উপকূলের দিকে এগিয়ে আসা আরেকটি বিমানের নাম ছিল 'দা গ্লেট আর্টিস্ট'। এটি ছিল একটি রেকর্ডিং ও তথ্যসংগ্রহকারী বিমান। তৃতীয় বিমানটির নাম ছিল 'নেস্যাসারি ইভিল'। নেস্যাসারি ইভিল ছিল একটি ফটোগ্রাফিক বিমান। স্বাভাবিক রেডিও সতর্কতার মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়, বি-২৯ বোমারু

বিমান দেখা গেলে তাদেরকে শেল্টারে আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দেয়া হবে। ৮ টা ১৫ মিনিটে বি-২৯ এনোলা গে হিরোশিমার ঠিক কেন্দ্রস্থলে 'লিটল বয়' নামে বিশ্বের প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। বিমানটি চালাচ্ছিলেন কর্নেল পল টিবেটস। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে বোমাটির সময় লেগেছিল প্রায় এক মিনিট। ভূপৃষ্ঠ থেকে ২ হাজার ফুট উঁচুতে ১৩ কিলোটিন শক্তিতে 'লিটল বয়' বিস্ফোরিত হয়। যেখানে বোমাটি বিস্ফোরিত হয় সে জায়গাটিকে বলা হয় 'এ-বোম ডোম।' বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ৮০ হাজার বেসামরিক লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। হিরোশিমায় আণবিক বোমাবর্ষণ কত ভয়ংকর ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। বোমাবর্ষণের পর পর বিমানটি একটি তীব্র আলোতে পূর্ণ হয়ে যায়। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছেন না। নীরব নিথর। এভাবে কেটে যায় কয়েক মুহূর্ত। প্রথমে মুখ খোলেন কো-পাইলট রবার্ট লুই। তিনি বোমাবর্ষণকারী কর্নেল পল টিবেটসের পিঠে একটি ধাক্কা দিয়ে বললেন, ঐদিকে তাকাও, ঐদিকে তাকাও। তিনি ধাক্কা দেয়ায় টিবেটস পেছন ফিরে হিরোশিমার দিকে তাকান। তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন একটি ছাতার মতো ভয়ংকর ঘন মেঘে শহরটি ঢাকা পড়ে গেছে। শহরটি ফুটছে। ঝলসে যাচ্ছে। রবার্ট লুই আণবিক বোমার বিদারণের স্বাদ পাচ্ছিলেন। তার কাছে এ স্বাদ সীসার মতো মনে হচ্ছিল। কোলাহলপূর্ণ সমৃদ্ধ একটি শহর ধ্বংস্তূপে পরিণত হওয়ার দৃশ্য দেখে আপন মনে তিনি বলে উঠলেন, 'হায় ঈশ্বর আমরা একি করলাম!'

জাপানী ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের টোকিও কন্ট্রোল অপারেটর আকস্মিকভাবে হিরোশিমা স্টেশনের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে বলে বুঝতে পারলেন। তিনি অন্য একটি টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে পুনরায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়। প্রায় ২০ মিনিট পর টোকিও রেইলরোড টেলিগ্রাফ কেন্দ্র উপলব্ধি করতে পারলো যে, হিরোশিমার ঠিক উত্তরে মূল টেলিগ্রাফ লাইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। শহরের ১০ মাইলের মধ্যে কয়েকটি ছোট্ট রেলগাড়ী থামে এবং হিরোশিমায় বিস্ফোরণের বিভ্রান্তিকর খবর প্রচার করে। এসব রিপোর্ট জাপানী জেনারেল স্টাফের হেডকোয়ার্টার্সে পাঠানো হয়। সামরিক হেডকোয়ার্টার্স হিরোশিমায় আর্মি কন্ট্রোল স্টেশনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা চালায়। শহরের পুরো নিস্তব্ধতায় হেডকোয়ার্টার্স হতবাক হয়ে পড়ে। হেডকোয়ার্টার্সে কর্মরত সামরিক অফিসারগণ বিশ্বাস করতেন, হিরোশিমায় শত্রুদের বড় ধরনের কোনো হামলা হতে পারে না। তারা আরো জানতেন, হিরোশিমায় বিস্ফোরণ ঘটার মতো বিশাল কোনো বিস্ফোরক মজুদ নেই। এ পরিস্থিতিতে জাপানী জেনারেল স্টাফের একজন তরুণ অফিসারকে অবিলম্বে হিরোশিমায় অবতরণ করে সেখানকার ক্ষয়ক্ষতির বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নিয়ে টোকিওতে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়। হেডকোয়ার্টার্সে সাধারণভাবে ধারণা করা হতো, হিরোশিমায় গুরুতর কোনো ঘটনা ঘটেনি। যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো গুজব। স্টাফ অফিসার বিমান বন্দরে ছুটে যান এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়ে যেতে থাকেন। তিন ঘন্টা উড্ডয়ন করে তিনি হিরোশিমার ১শ' মাইলের মধ্যে পৌঁছে যান। ততটুকু দূর থেকে এ অফিসার ও তার পাইলট হিরোশিমার আকাশে একটি ঘন মেঘের বিশাল কুণ্ডলী দেখতে পেলেন।

সেদিনের উজ্জ্বল দুপুরে হিরোশিমা তখনো জ্বলছিল। তাদেরকে বহনকারী বিমানটি শহরে পৌঁছে আকাশে চক্কর দিতে লাগলো। এসময় তারা যা দেখছিলেন তা ছিল অবিশ্বাস্য। ভূমিতে একটি বিরাট গর্ত, অবশিষ্ট ঘরবাড়ী জ্বলছে, ধোয়ার একটি বিশাল কুণ্ডলীতে গোটা শহর আচ্ছাদিত। তারা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবতরণ করেন এবং টোকিওতে ফিরে আসার পরই স্টাফ অফিসার ত্রাণ সংগ্রহে নেমে পড়েন।

টোকিও কর্তৃপক্ষ হিরোশিমাতে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সত্যিকার কারণ জানতে পারে হোয়াইট হাউসের ঘোষণা থেকে। আণবিক বোমা নিক্ষেপের ১৬ ঘন্টা পর হোয়াইট হাউস এ সংক্রান্ত ঘোষণা দেয়। বিস্ফোরণের পর যারা জীবিত ছিলেন তাদের আনুমানিক ১ শতাংশ মানুষ বিস্ফোরণ-পরবর্তী তেজস্ক্রিয়তায় মারা যায়। ১৯৪৫ সালের শেষ নাগাদ এক হিসাবে বলা হয়, বিষাক্ত তেজস্ক্রিয়তায় আরো ৬০ হাজার লোক মারা গেছে। হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ৪০ হাজারে। এরপর তেজস্ক্রিয় সংক্রান্ত কারণে হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২০০৪ সালের ৬ আগস্ট পর্যন্ত হিরোশিমায় আণবিক বোমাবর্ষণে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ৩৭ হাজার ৬২ জন। তবে তাদের মধ্যে বোমার প্রতিক্রিয়ায় কত জন মারা গেছে তা ছিল অস্পষ্ট। ২০০৪ সালের শেষ নাগাদ জাপানে বোমায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৭০ হাজার।

ভূমিকম্পের আশংকায় হিরোশিমায় কংক্রীটের তৈরি কয়েকটি ভবন অত্যন্ত মজবুত করে গড়ে তোলা হয়েছিল। শহরের কেন্দ্রস্থলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার খুব কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও এসব ভবনের কাঠামো ভেঙ্গে পড়েনি। বোমাটি আকাশে বিস্ফোরিত হওয়ায় বিস্ফোরণের তীব্রতা আশপাশে ছড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে নিম্নগামী হয়। এ কারণে গ্রাউন্ড জিরো থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে প্রিফেকচার্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন হল রক্ষা পায়। চেক স্থপতি জ্যান লেতজেল এ ভবন নির্মাণ করেছিলেন। হিরোশিমার ধ্বংসযজ্ঞকে হিরোশিমা পীস মেমোরিয়াল বা হিরোশিমা শান্তি স্মারক বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইউনেস্কো ১৯৯৬ সালে এটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে গ্রহণ করে।

কর্নেল পল টিবেটস হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ করায় কখনো দুঃখ প্রকাশ করেননি। ২০০৫ সালের মার্চে তিনি সদম্ভে বলেছেন,' অনুমতি পেলে আমি আবার একই কাজ করবো।' অন্য একবার তিনি বলেছিলেন, মাছি মারলে গণনা করার প্রয়োজন হয় না।

বোমাবর্ষণকালে পল টিবেটস ছিলেন কর্নেল। ১৯৫৯ সালে তিনি ব্রিগেডিয়ার হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৬৬ সালের ৩১ জুলাই তিনি মার্কিন বিমান বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ষাটের দশকে তাকে ভারতে সামরিক এ্যাটাশে হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু ভারতের সকল রাজনৈতিক দল টিবেটসের উপস্থিতির বিরোধিতা করায় তার নিয়োগ বাতিল করা হয়। পল টিবেটস বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন এ নির্দেশের সঙ্গে একমত। এজন্য মানবজাতি তাকে ক্ষমা করতে পারে না।

নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় আণবিক বোমাবর্ষণ

হিরোশিয়ার তিনদিন পর ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নাগাসাকিতে ১৯-২৩ কিলোটন শক্তিসম্পন্ন আণবিক বোমাবর্ষণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হয়। আণবিক বোমা নিক্ষেপে তৎক্ষণাৎ ৭০ হাজার লোক নিহত এবং পরে বোমার প্রতিক্রিয়ায় তার চেয়ে বেশি লোকের মৃত্যু হয়। নাগাসাকি ছিল দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপানের অন্যতম বৃহৎ সমুদ্র বন্দর। যুদ্ধকালে অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ, সামরিক সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য রণ সম্ভার তৈরি হওয়ায় শহরটির সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। হুঁশিয়ারি ছাড়াই নাগাসাকিতে মানব বিধ্বংসী মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। ৮ আগস্ট লীফলেট ফেলা হলেও সেগুলো ১০ আগস্টের আগে পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তবর্তীকালীন কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল যে, আমরা জাপানীদের কোনো হুঁশিয়ারি দিতে পারি না। এ সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও রেডিও সাইপেনের মাধ্যমে জাপানকে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছিল।

নাগাসাকি তখন আজকের মতো সুরম্য অট্টালিকা সজ্জিত শহর ছিল না। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এ শহরের অধিকাংশ বসত ঘর ছিল জাপানের পুরনো রীতিতে তৈরি। ভবনগুলো ছিল কাঠের তৈরি। ভবনের দেয়ালগুলোও ছিল কাঠের। ছাদ ছিল টাইলসের। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল কাঠ অথবা এ জাতীয় দাহ্য সামগ্রীতে তৈরি। বোমা বিস্ফোরণের হাত থেকে রক্ষার জন্য এগুলো কোনোক্রমেই যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। একটি অপরিকল্পিত শহর হিসেবে নাগাসাকি গড়ে উঠেছিল। লোকজনের বসত ঘর ছিল কলকারখানার খুব কাছাকাছি।

আণবিক বোমা হামলার আগে নাসাসাকিতে কখনো বড় ধরনের কোনো বোমা হামলা হয়নি। ১৯৪৫ সালের ১ আগস্ট এ শহরে বেশ ক'টি উচ্চ বিস্ফোরণ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এসব বোমার ক'টি পতিত হয় শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে শিপইয়ার্ড ও ডক এলাকায়। ক'টি বোমা আঘাত হানে মিৎসুবিশি স্টীল এন্ড আর্মস ওয়ার্কসে। ন্যাগাসাকি মেডিকেল স্কুল ও কলেজে পতিত হয় ৬ টি বোমা। সেখানকার ভবনগুলোর উপর তিনটি বোমা সরাসরি আঘাত হানে। এ স্বল্পসংখ্যক বোমা হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সামান্য হলেও নাগাসাকির অধিবাসী বিশেষ করে স্কুল ছাত্রদের জন্য তা বিরাট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিরাপত্তার জন্য স্কুল ছাত্রদের গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তর করা হয়। ফলে আণবিক বোমা হামলার সময় শহরের লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

সুভাষ বসুর রহস্যময় মৃত্যু

বিশ্বে যে ক'টি মৃত্যুর ঘটনা গভীর রহস্যের জন্ম দিয়েছে তার মধ্যে নেতাজী সুভাষ বসুর মৃত্যু একটি। ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় যে, তিনি ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বর্তমান তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। কিন্তু অনেকেই এ কথা বিশ্বাস করছেন না। স্বয়ং ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর মনেও যথেষ্ট খটকা ছিল। ১৯৬৪ সালে মৃত্যুর কয়েক মাস আগে সুভাষ বসুর বড় ভাই অশোক বসুর সঙ্গে আলাপে তিনি তার সন্দেহের কথা প্রকাশ করেন এবং এ রহস্য উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। তবে সুযোগ পেয়েও তিনি সে চেষ্টা করেননি। কেন করেননি তাও আরেক রহস্য। এ রকম ধারণাও প্রচলিত রয়েছে যে, সুভাষ বসু সোভিয়েত সৈন্যদের হাতে বন্দী হন এবং তখন তিনি বন্দী হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নেই অবস্থান করছিলেন। আরো বলা হচ্ছে যে, সোভিয়েত বন্দী হিসেবে সাইবেরিয়ায় তার মৃত্যু হয়। আরেকটি মত হচ্ছে যে, অক্ষশক্তির পরাজয়ের আভাস পেয়ে সুভাষ বসু সোভিয়েতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সোভিয়েত অধিকৃত মাঞ্চুরিয়ায় আশ্রয় নেন।

তবে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন অনুজ ধর নামে একজন ভারতীয় সাংবাদিক। এ সাংবাদিক এক অনুসন্ধানী মিশনে তাইওয়ানে গেলে সে দেশের সরকার তাকে জানায় যে, বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বসুর মৃত্যু হতে পারে না। কেননা, ১৯৪৫ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর নাগাদ সে দেশে কোনো বিমান দুর্ঘটনাই ঘটেনি। তাইওয়ান থেকে দুর্লভ তথ্য-প্রমাণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে সাংবাদিক অনুজ ধর বিমান দুর্ঘটনায় সুভাস বসুর মৃত্যুর দাবি নাকচ করে দিয়ে একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম হচ্ছে, 'ব্যাক ফ্রম ডেড ঃ ইনসাইড দ্য সুভাষ বোস মিস্ট্রি।'

সুভাষ বসু সত্যি সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থান করছিলেন কিনা তা তদন্ত করে নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ইউনিয়ন রেলওয়ে মন্ত্রী শাহ নেওয়াজ খানের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন। কিন্তু এ কমিশন সোভিয়েত ইউনিয়নে খোঁজ-খবর না নিয়ে তড়িঘড়ি করে তৈরি এক রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বসুর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের আগেই প্রধানমন্ত্রী নেহরু ঘোষণা করেন, তাইহোকু (জাপানী ভাষায় তাইপের নাম) বিমান দুর্ঘটনায় বসুর নিশ্চিত মৃত্যু হয়েছে। কমিশন জাপানের রেঙ্কোজি মন্দিরে রক্ষিত ছাই-ভস্ম দেশে ফিরিয়ে এনে সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এ সুপারিশ রক্ষা করেনি।

ভারতের প্রথম কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট গঠিত বলে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। কেননা, এ কমিটির প্রধান ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আইএনএ'র সাবেক মেজর জেনারেল শাহ নেওয়াজ খান ছিলেন নেহরু পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ। জনাব খান ১৯৪৭ সালে একবার পাকিস্তানে অভিবাসন করেছিলেন। পন্ডিত নেহরু তাকে সেখান থেকে বলতে গেলে একরকম জোর করে ভারতে ফিরিয়ে আনেন। ভারতে ফিরিয়ে এনে তাকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেন। সুভাষ বসুর নেতৃত্বাধীন সাবেক আইএনএ'র হাজার হাজার সদস্যের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা অনুসরণ করা হলে শাহ নেওয়াজ খানের পক্ষে মন্ত্রী হওয়া সম্ভব হতো না। আইএনএ সদস্যদের ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ও রাজনীতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও জেনারেল শাহ নেওয়াজ মন্ত্রী হয়েছিলেন। শাহ নেওয়াজ খানের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার অর্থ ছিল এটাই যে, নেহরু ও তার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কোনো একটি বিষয়ে বুঝাপড়া হয়েছিল। কী বিষয়ে বুঝাপড়া হয়েছিল তা প্রকাশ করা না হলেও বুঝা যায় যে, সুভাষ বসুর মৃত্যু রহস্য ধামাচাপা দিতে উভয়ে একটি মীমাংসায় পৌঁছেছিলেন। শাহ নেওয়াজ খান ১৯৫৬ সালে মাত্র ৪ মাস তদন্ত পরিচালনা করেই ইতি টানেন। এ ধরনের একটি জটিল মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে ৪ মাস কখনো যথেষ্ট সময় বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাছাড়া, শাহ নেওয়াজ খান নিজেও কোনো বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কমিটির অন্য দু'জন সদস্য তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে তিনি রিপোর্ট পেশ করেন। এতেই বুঝা যায় যে, রেলমন্ত্রী জনাব খান নেহরুকে সন্তুষ্ট করতে তদন্তের দ্রুত যবনিকাপাত ঘটিয়ে এ উপসংহারে পৌঁছান যে, সুভাষ বসু কোনো হত্যাকান্ডের শিকার নন, বরং বিমান দুর্ঘটনার শিকার।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারও নেতাজি সুভাষ বসুর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে খোসলা কমিশন গঠন করে। পাঞ্জাব হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জি, ডি, খোসলার নেতৃত্বে এ কমিশন ছিল এক সদস্যবিশিষ্ট। কমিশন সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক ও রেঙ্গুনসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন এবং বহুলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেও ঘটনাস্থল তাইপেতে যায়নি। তাই ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত খোসলা কমিশনের তদন্ত রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে শুরুতর সন্দেহ দেখা দেয়।

বিচারপতি খোসলার পেশকৃত রিপোর্টের ভিত্তি ছিল জাপানী ডাক্তার তমিউশির মেডিকেল রিপোর্ট। ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইসহ অনেকে তার রিপোর্ট প্রত্যাখান করেছিলেন। ধারণা করা হয় যে, খোসলা কমিশনের রিপোর্টে বিচারপতি খোসলার ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিফলন ঘটেছিল। সুভাষ বসুর সঙ্গে বিচারপতি খোসলার ছিল পুরনো শত্রুতা। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ডে উভয়ের দেখা হয়। সুভাষ বসু তখন আইসিএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। খোসলাও ছিলেন পরীক্ষার্থী। সুভাষ বসু পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সিভিল সার্ভিসে যোগদানে ভারতে ফিরে এলে উভয়ের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়। তাই সন্দেহ করা হয় যে, বিচারপতি খোসলার তৈরি রিপোর্টে তার বিদ্বিষ্ট মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে।

লক্ষ্য করলে দেখা দেখা যাবে যে, কংগ্রেস সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে সুভাষ বসুর মৃত্যু রহস্যের জট খুলতে চায়নি। এ থেকে সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠে। জাপানের রেঙ্কোজি মন্দিরে যে দেহাবশেষ সংরক্ষিত রয়েছে তা সুভাষ বসুর নাকি অন্য কারো তাও সন্দেহের উর্ধে নয়। বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে তাইওয়ান থেকে একটি লাশের সঙ্গে জাপানী ভাষায় পাঠানো ডেথ সার্টিফিকেটই ছিল একমাত্র প্রমাণ। পরে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে জানা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রণাঙ্গনে মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপে এক জাপানী সৈন্য হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং এটি হচ্ছে তার মৃত্যুর সার্টিফিকেট।

নেতাজী সুভাষ বসু

সুভাষ বসুর লাশ নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়ায় একেক সময় একেক কথা শোনা গেছে। একথাও শোনা গেছে যে, তিনি জীবিত রয়েছেন এবং গুমনামি বাবা সন্ন্যাসি হিসেবে উত্তরপ্রদেশের ফাইজাবাদ শহরে একটি মন্দিরে বসবাস করছেন। এ নিয়ে হৈ-চৈ শুরু হলে তদন্ত করা হয়। কিন্তু কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয়নি। সুভাষ বসুর চেহারার সঙ্গে গুমনামি বাবার চেহারার হুবহ মিল ছিল। অমিলের মধ্যে ছিল শুধু লম্বা দাঁড়ি।

সুভাষ বসুর রহস্যময় অন্তর্দ্ধানের উপ্যাখ্যান আগাগোড়া খতিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার এবং পরবর্তীতে ভারত সরকার ধামাচাপা দিতে চেয়েছে। বৃটিশ সরকারকে প্রথম শ্রেণীর একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদের হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য বিমান

দুর্ঘটনার কল্প-কাহিনী তৈরি করা হয়। সুভাষ বসুর ভাগ্যে সত্যি কি ঘটেছিল তা বৃটিশ সরকার ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম থেকে জানা সম্ভব হয়নি। বৃটিশরা ছিল তার প্রতিপক্ষ। তাই তাদের কাছ থেকে নিরপেক্ষ বর্ণনা আশা করা যায় না। ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই যে, বিজয়ী পক্ষ বিজিতের প্রতি সুবিচার করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশরা ছিল বিজয়ী। অন্যদিকে, সুভাষ বসু ও তার পৃষ্ঠপোষক জাপান ও জার্মানী ছিল পরাজিত। এ বাস্তবতার আলোকে এটাই মনে করা স্বাভাবিক যে, সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে বিশ্ব যা জানতে পেরেছে তা হচ্ছে বিজয়ী পক্ষের মর্জিমাফিক তৈরি করা আষাঢ়ে গল্প।

কংগ্রেস সরকারের মতো বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সরকারও সুভাষ বসুর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে ২০০০ সালে বিচারপতি জে, সি, মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। কিন্তু সময় বহুদূর গড়িয়ে যাওয়ায় এ কমিশনের তদন্ত কাজ দুরূহ হয়ে উঠে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করায় এবং অধিকাংশ নথিপত্র গায়েব হয়ে যাওয়ায় ২০০৫ সালের শেষ নাগাদও মুখার্জী কমিশন সুভাষ বসুর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে কোনো কূল-কিনারা করতে পারেনি। আর কোনোদিন এ রহস্য উদ্ঘাটিত হবে তাও আশা করা যায় না। বিচারপতি মুখার্জী ইন্দো-এশিয়ান নিউজ সার্ভিসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, রিপোর্টের উপসংহারে পৌছতে তার দীর্ঘ ৬ বছর লেগেছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন নেতাজিকে আটক করেছিল বলে যে কথা প্রচারিত হয় তার সত্যতা যাচাইয়ে তিনি ২০০৫ সালের গোড়ার দিকে রাশিয়া সফর করেন। রাশিয়া সফরের ফলাফল কি অথবা সুভাষ বসুর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কি সে ব্যাপারে তিনি মুখ খুলেননি। অন্যদিকে, মুখার্জী কমিশনের একটি সূত্র জানায় যে, ফরমোজায় বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর সরাসরি কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বৃটিশ ডঃ গর্ডনের ভাষ্য অনুযায়ী সুভাষ বসু ১৬ আগস্ট বিমান যোগে ব্যাংককে আসেন এবং পরদিন তিনি সায়গনে পৌছান। তার সঙ্গে ছিলেন কর্নেল হাবিবুর রহমান, কর্নেল প্রিতম সিং, মেজর আবিদ হাসান, এস, এ, আয়ার ও দেবনাথ দাস। সায়গনে এসে অন্য একটি বিমানে তাইপেতে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। সুভাষ বসুকে জানানো হয় যে, তাইপেতে যাবার জন্য মাত্র একটি ফ্লাইট রয়েছে এবং পরে সেটি দাইরেনে (মাঞ্চুরিয়া) যাবে। বিমানে দু'টি সীট রাখা হয়। একটি সুভাষ বসুর জন্য এবং অন্যটি কর্নেল হাবিবুর রহমানের। দাইরেনগামী বিমানে তার জাপানী সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ জাপানী রাজকীয় বাহিনীর লেঃ জেনারেল শিদাই। মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থানরত কুওমিনটাং আর্মির কমান্ড গ্রহণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পণের বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশে তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন। ছোট আকৃতির একটি '৯৭-২' নং ফ্লাইটে সুভাষ বসু ও কর্নেল হাবিবুর রহমান আরোহন করেন। তার কাছে ছিল স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার বোঝাই দু'টি ভারি সুটকেস। তাদের সঙ্গে আরো ১০ জন জাপানীও ছিলেন। ১৮ আগস্ট ভোর ৫টা থেকে সোয়া ৫টার মধ্যে তুরেইন থেকে

বিমানটি উড্ডয়ন করে জাপান অধিকৃত তাইহোকুর পথে এগিয়ে যেতে থাকে। তাইওয়ানে এসে বিমানটি আবার উড্ডয়ন করে এবং ৩০ ফুট উঁচুতে উঠেই বিস্ফোরিত হয়ে বিধ্বস্ত হয়। তখন সময় ছিল ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বিকেল ৫টা। বিমান দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর ট্রাকে করে একটি সামরিক হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জাপানী রাজকীয় বাহিনীর ক্যাপ্টেন ডাঃ ইউশিমি তামিউশি তার চিকিৎসা করেন। কিন্তু চিকিৎসা করেও তিনি তাকে বাঁচাতে পারেননি। হাসপাতালে নেয়ার ৪ ঘণ্টা পর তিনি মারা যান। ডাক্তার তামিউশি নাকি সুভাষ বসুকে তার অন্তিম সময়ে ভারতবাসীর জন্য একটি বিবৃতি দেয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সুভাষ বসু বিবৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। সুভাষ বসু তার মৃত্যুর আগে ভারতবাসীর জন্য কোনো বিবৃতি দিতে চাননি বলে ডাক্তার তামিউশির উদ্ধৃতি দিয়ে যে ভাষ্য প্রচার করা হচ্ছে তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। যিনি ভারতবাসীর মুক্তির জন্য সবর্স্ব ত্যাগ করেছেন তিনি তার মৃত্যুর আগে দেশবাসীর কাছে তার শেষ কথা বলে যাবেন না- এ হতে পারে না। এ যুক্তিতে ডাক্তার তামিউশির ভাষ্য গুরুতর সন্দেহের জন্ম দিয়েছে।

ডাক্তার তামিউশির এ ভাষ্য ছাড়া সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে আর কারো উক্তি বা অন্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। খ্যাতনামা মোহাফিজবিদ ও ঐতিহাসিক ডঃ টি আর সারীণ সরকারী নথিপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে এতটুকু তথ্য প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালে ডঃ গর্ডন এ তথ্যই প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বসুর মৃত্যু সম্পর্কে ডাঃ তামিউশির ভাষ্য হচ্ছে ফরমোজা বা তাইওয়ানে যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত বৃটিশ লিয়াজোঁ ব্রাঞ্চের ইন-চার্জ ক্যাপ্টেন এ, আর, টার্নারের কাছে পেশকৃত রিপোর্টের একটি অংশ। ধারণা করা হয় যে, সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে বড় ধরনের একটি বিতর্ক এড়িয়ে যেতে বৃটিশদের চাপের মুখে ডাক্তার তামিউশি এ বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সুভাষ বসুর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে প্রথম তদন্ত কমিটি গঠন করেন ভারতের বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল। শোনা যায় যে, ব্যাপক তদন্তের পর কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বসুর মৃত্যু হয়েছে। তবে কমিটি এ রিপোর্ট দিলেও বৃটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। বৃটিশ সরকারের পক্ষে সে ধরনের কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভবও ছিল না। তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার হাত ছিল কিনা তা জানা না গেলেও একথা জানা গেছে যে, বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থা তাকে হত্যা করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছিল।

১৯৪১ সালে বৃটিশ সরকার অক্ষশক্তির সঙ্গে সুভাষ বসুর যোগাযোগের ঘটনা জানতে পেরে ঘাবড়ে যায়। তখন বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টদের তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়। আইরিশ ঐতিহাসিক ও ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক ডঃ ইউনান ও'হালপিন এ দাবি করেছেন। তিনি বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের কার্যকলাপের উপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। এসব বইয়ে তিনি বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার প্রকাশিত দলিলপত্র ব্যবহার করেছেন। সুভাষ বসুকে হত্যায় বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার স্পেশাল অপারেশন্স এক্সিকিউটিভ (এসওই)-কে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা প্রকাশ

করা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক ও'হালপিন অতি গোপনীয় এ দলিলপত্রের ভিত্তিতে এ দাবি করেছেন। বৃটিশরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করেছিল যে, সুভাষ বসু সম্ভবতো অবস্থান করছেন। কিন্তু একটি ইতালীয় কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে, তিনি কাবুলে অবস্থান করছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভেতর দিয়ে জার্মানী পৌছানোর পরিকল্পনা করছেন। এ পরিস্থিতিতে তুরস্কে অবস্থানরত এসওই'র দু'জন এজেন্টকে তাদের লন্ডনস্থ সদর দপ্তর জার্মানী পৌছানোর আগেই বসুকে গ্রেফতার ও তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তবে তিনি মধ্যএশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে জার্মানী পৌছায় বৃটিশদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সুভাষ বসুকে হত্যা করার নির্দেশ বহাল রয়েছে কিনা জানতে চেয়ে যতবার এ দু'এজেন্ট লন্ডনে বার্তা পাঠিয়েছে ততবারই তাদের জানানো হয় যে, তাকে হত্যার নির্দেশ বলবৎ রয়েছে এবং পেলেই তাকে হত্যা করতে হবে। মিঃ ও'হালপিনের মতে, সুভাষ বসুকে হত্যা করার এ নির্দেশ দান ছিল খুবই অস্বাভাবিক, বিরল ও অভাবিত। সুভাষ বসুকে হত্যার নির্দেশ দান থেকে এটাও স্পষ্ট হচ্ছে যে, বৃটিশরা তাকে কতটুকু গুরুত্ব দিতো। তারা ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সুভাষ বসুকে একটি মারাত্মক হুমকি হিসেবে গ্রহণ করে এবং আতংকিত হয়ে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়।

বৃটিশের প্রতিপক্ষ জাপান ও জার্মানীর সশস্ত্র সহায়তায় ভারতকে মুক্ত করার সংগ্রামে যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর ঝুঁকি সম্পর্কে সুভাষ বসু ছিলেন পুরো মাত্রায় সচেতন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়ে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলেও তিনি জানতেন যে, যুদ্ধ শেষ হওয়া নাগাদ যে কোনো ওছিলায় বৃটিশ সরকার তাকে আবার কারাগারে পাঠাতে পারে। এ আশংকা থেকে তিনি পলায়নের সিদ্ধান্ত নেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা মিয়া আকবর শাহের সহায়তায় তিনি পলায়ন করেন। সুভাষ বসু পশতু ভাষা জানতেন না। তাই আকবর শাহ তাকে বোবা ও কালা সেজে দাড়ি রেখে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাড়ি দেয়ার পরামর্শ দেন। ১৯৪১ সালের ১৯ জানুয়ারী তিনি পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে আকবর শাহ, মোহাম্মদ শাহ ও ভগৎ রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুভাষ বসুকে আকবর শাহের বিশ্বস্ত বন্ধু আবাদ খানের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৬ জানুয়ারী তিনি ইউরোপের উদ্দেশে রওনা হন। পাঠান বীমা এজেন্ট 'জিয়াউদ্দিন' ছদ্মনামে তিনি আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে ইতালীয় অভিজাত 'কাউন্ট অরল্যান্ডো মাজোটা' ছদ্মনামের পাসপোর্টে তিনি মস্কো যান। মস্কো থেকে রোম এবং রোম থেকে ২৮ মে জার্মানীতে। জার্মানীতে তার আগমনের সংবাদ কিছুদিন চেপে রাখা হয়। সুভাষ বসুর সঙ্গে যোগাযোগ এবং তার সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় জার্মান ফরেন অফিসের উপর। কলকাতায় যুদ্ধ-পূর্ব জার্মান কন্স্যুলেট জেনারেল অফিস এবং কাবুল প্রতিনিধির মাধ্যমে জার্মান ফরেন অফিস এ ভারতীয় নেতার রাজনৈতিক মর্যাদা এবং পটভূমি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। তিনি ইচ্ছানুযায়ী বার্লিনে আজাদ হিন্দ রেডিও স্থাপন করা হয়। তাছাড়া, তিনি জার্মানীর হাতে বন্দী সাড়ে ৪ হাজার ভারতীয় সৈনা

নিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজের নিউক্লিয়াসও গঠন করেন। ওয়াফেন-এসএস'র সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজকে সংযুক্ত করা হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ হিটলারের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে।

১৯৪১ সালে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বাত্মক হামলা শুরু করলে সুভাষ বসু মর্মাহত হন এবং জার্মানী ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। জার্মান ইউ-বোট 'ইউ-১৮০' তাকে উত্তমাশা অন্তরীপের কোথাও নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে তিনি আরেকটি জাপানী ডুবোজাহাজ '১-২৯'-এ আরোহন করে টোকিওতে গিয়ে পৌছান। বিশ্বে কোনো বেসামরিক ব্যক্তিকে এক দেশের নৌ- বাহিনীর সাবমেরিন থেকে আরেক দেশের নৌ-বাহিনীর সাবমেরিনে স্থানান্তর করার এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। এক সময় জাপান থেকে সিঙ্গাপুর এসে সুভাষ বসু ৮৫,০০০ সৈন্যের পূর্ণাঙ্গ আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। তার বাহিনীতে মহিলা ইউনিটও ছিল। মহিলা ইউনিটের নামকরণ করা হয় ঝাঁসির রাণী লক্ষী বাইয়ের নামে। অতুলনীয় দেশপ্রেমে উজ্জীবিত আজাদ হিন্দ ফৌজের অকুতোভয় সৈন্যরা লড়াই করতে করতে ভারতের মনিপুর পর্যন্ত এসে পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমাবর্ষণ সবকিছু পাল্টে দেয়। জাপান আত্মসমর্পণ করে। জাপানের আত্মসমর্পণের কয়েক দিন আগে ভারতের এ মহান বীর সন্তান সুভাষ বসু রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এ রহস্যের জট পরে আর কোনোদিন খুলেনি।